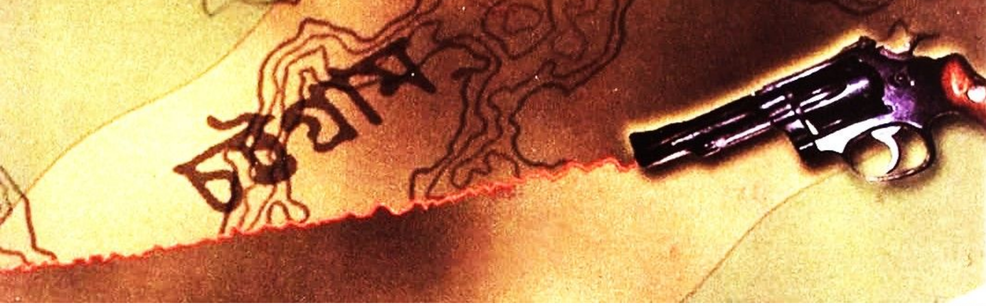


মুক্তির সোপান জালালাবাদ



শ্রী সুরেশ দে

প্রকাশক
শ্রী সুরেশ দে
২২/৪ পেটেল নগর
জামশেদপুর-৯
বিহার

১ম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৯৫
১৪ এপ্রিল ১৯৮৮

প্রচ্ছদ শ্রী স্বপন মুখার্জী

মুদ্রক
শ্রীদুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রন্থক সেনচুরি বাইন্ডিং কোং
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

যাদের সহযোগিতায় এই বই লেখা হল সেই সব
জালালাবাদের যোদ্ধাদের স্বাক্ষর

গ্রন্থসত্ত্ব
সূর্য সেন ভবন
৭৩২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, (যোধপুর পার্ক
কলিকাতা-৪৫

VISVA BHARATI

PUBLISHING DEPARTMENT

Founded by
RABINDRANATH TAGORE
Acharya
RAJIV GANDHI

Telephone 44-9868/69 43-6273
Telegram VISVAVANI, Calcutta
6 ACHARYA JAGADISH BOSE ROAD
CALCUTTA 700 017

অনু।

৬.১.৮৮

শ্রীসুরেশচন্দ্র দে,
২২/৪ প্যাটেননগর,
ডাকঘর . এগ্রিকো,
জামশেদপুর - ৯
বিহার।

সবিনয় নিবেদন,

উপাচার্য মহাশয়কে লেখা আপনার ১৩.১১.৮৭ তারিখের পত্রের উত্তরে লিখি, 'মুক্তির সোপান জালালাবাদ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮টি রচনার (কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ, আগুনের পরশমণি, বাজাব হস্ত করে, আমরা দুখের বক্রমুখের, এনেছিলে সাথে করে, যে নদী মরুপথে, যখনি জাগিবে তুমি, চাব না পশ্চাতে মোরা) অংশ সমূহ প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হল।

আপনার গ্রন্থে বিশ্বভারতী প্রদত্ত অনুমতির স্বীকৃতি মুদ্রিত হলে, এবং বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের জন্য দুইখানি বই পাঠালে সুখী হব।

নিবেদক

জগদিন্দ্র ভৌমিক
(জগদিন্দ্র ভৌমিক)

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়া মাতৃদেবী
৺কাদাম্বিনী দে

শ্রীচরণ কমলেষু,

মাগো,

যে দস্যি ছেলে তোমার সুখের সংসারে আগুণ লাগিয়ে ছিল, তোমার চোখের মণিই তোমাকে অশ্রুজলে ভাসিয়েছিল, সেই পাগল-পোলা আজ তোমার স্মৃতি চারণ করছে।

নক্ষত্র লোকে বসে এই দীনহীন সেবকের ভক্তিপূর্ণ প্রণতি গ্রহণ করো মা। তোমার মত পূতাত্মা দেবীর চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারার সঙ্গে নক্ষত্রলোকে বাস করাই সম্ভব।

জননী গো, তুমি ছিলে রাজপুত জননীর মতো বীরাঙ্গনা। তোমার এক স্তনে ছিল স্নেহ, মমতা, প্রেম-প্রীতির অমৃত ধারা, অন্য স্তন ছিল সাহস, শক্তি, বিক্রম, বীরত্ব, মহত্ব আর দেশাত্ববোধের ক্ষীর রসে ভরা। রাজপুতানীর ন্যায় স্বহস্তে অস্ত্রে, শস্ত্রে সজ্জিত করে তুমি তোমার পুত্রকে রণক্ষেত্রে পাঠাও নাই বটে, কিন্তু তোমার মনে অ-সহযোগ আন্দোলনের যে ঢেউ লেগেছিল সেই ঢেউয়ের প্লাবনে তোমার সন্তানকে ভাসিয়ে দিতে দ্বিধাবোধও কর নাই।

আবার রণক্ষেত্রে গুলীবিদ্ধ তোমাব স্নেহের দুলাল জেলের সেলে বসে ফাঁসীর অপেক্ষায় দিন গুণছে যখন, তখন মায়া মোহের ফাঁদে পড়ে দুঃখে দুঃখে তোমার জীবন ছিল কালা। সেই দুঃখের দিনে পাগলিনী প্রায় মঠে, মন্দিরে, দেবালয়ে পাষাণ দেবতার পায়ে মাথা খুটেছ। সাধু সন্ত, ফকির আউলিয়ার পায়ে পড়ে আকুল কান্নায় গড়াগড়ি দিয়েছ। আহার নিদ্রা ভুলে গৃহদেবতার চরণে অন্তরের কাতর আকুতি ভক্তি গদগদ হৃদয়ে জানিয়েছ। লক্ষ লক্ষ বার নাম জপ করেছ। তোমার দেহ-লয়-কারী তন্ময় তপস্যার প্রভাবে দেবতার সিংহাসন নড়ে উঠল।

ফাঁসীর আসামী বে-কসুর খালাস পেল।
ফুলের গন্ধে, সূর্য কিরণের সঙ্গে মিশে আমার অঙ্গনে আছ মা,
তুমি বিশ্ব স্রষ্টার ছায়ারূপে।

তোমার নামে, তোমার ধ্যানে তোমার জ্ঞানে কত মাধুরী!
তুমি না বাসিলে ভালো কে বাসিবে ভালো!

মা, তোমার রাঙ্গা চরণ পূজার একমাত্র উপচার নন্দন কাননের পারিজাত ফুল। তোমার দীনহীণ এই অন্তজ কোথায় পাবে সে স্বর্গীয় উপহার? তাই অধম এই বনফুল দিয়েই মাতৃ আরাধনার অর্ঘ রচনা করিল।

তুমি অগতির গতি, তোমাতেই চিরদিন থাকে যেন আমার মতি।

তোমার সাধু

গ্রন্থস্বত্ত্ব

'মুক্তির সোপান জালালাবাদ' গ্রন্থের লেখক আমি শ্রীসুরেশ দে আমার নিজ লিখিত এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব আজীবনের জন্য 'বিপ্লব তীর্থ' চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার শাখা সূর্যসেন ভবন" কমিটি কে দান করিলাম। এই গ্রন্থের বিক্রয় লব্ধ সমস্ত রয়্যালটি সূর্য সেন ভবনের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইবে। সূর্যসেন ভবন কমিটি যদি কখনও ট্রাসটির (Trustee) তে রূপান্তরিত হয় তবে ওয়ারিশ হিসাবে এই স্বত্ব ট্রাসটির উপর বর্ত্তাবে। তবে এই গ্রন্থের যে কোন রূপ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্ধন ভবন কমিটি আমার লিখিত অনুমতি ছাড়া করিতে পারিবেন না।

ইতি
শ্রীসুরেশ দে

শ্রীসুরেশ দে
২২/৪, প্যাটেল নগর
জামসেদপুর-৯
বিহার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীঅশোক কুমার বসু চৌধুরী মহাশয় এই বইটির আদ্যপ্রান্ত সংশোধন করে দিয়ে এবং বহু মূল্যবান উপদেশ দ্বারা বইটি সর্বাঙ্গসুন্দর করতে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। শ্রী বসুচৌধুরীর সহযোগিতা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করছি। তাঁর ঋণ অপরিশোধনীয়।

অনুরূপ ভাবে ভুলবার নয় বন্ধুবর অর্ধেন্দু গুহের সহায়তা। তিনি বার বার অনুপ্রেরণা দিয়ে উৎসাহিত করেছেন, সমালোচনা করে সাহায্য করেছেন। তাঁরই সৌজন্যে নেতাদের ও শহিদদের ফটোগুলি পেয়েছি। পেয়েছি বহু দুর্লভ প্রামাণ্য দলিল।

যিনি আমার বন্ধদুয়ারে বার বার আঘাত করে আমার বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলেন এবং হারানো যুগের ইতিকথা বর্তমান যুগের মানুষকে জানাতে উৎসাহিত করেন, তিনি প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী, এবং বর্তমানে কলিকাতা নাগরিক আন্দোলনের নেতা ও কলিকাতা জিলা নাগরিক সম্মেলনের সম্পাদক সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে আলমোড়ায় আমার পরিচয় ঘটে। তিনি আমার পরিচয় জানতে পেরে 'মুক্তির সোপান জালালাবাদ' বইটি লেখার অনুপ্রেরণা দেন। কয়েকবার বইটির পান্ডুলিপির অংশ বিশেষ তিনি দেখেছেন এবং নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর সহায়তা ভুলবার নয়। এই ইতিহাসের জন্য তাঁর আগ্রহ কত গভীর ও ইচ্ছা কত প্রবল ছিল তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ অন্যত্র তাঁর একটি চিঠি ছাপানো হল।

অতঃপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাসের 'গুরু নানক অধ্যাপক', ডঃ অমলেন্দু দে মহাশয় লেখাটির বানান সংশোধন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রী দে মহাশয়ের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ ভবিষ্যতে আরও লেখার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

কবি গুরুর রচনাবলী থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করার অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতী বইটিকে উৎকৃষ্টতর করতে সাহায্য করেছে, সেজন্য বিশ্বভারতীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই শ্রীমিহির বসুকে। তিনি বইটির প্রুফ দেখেছেন। এবং তাঁর পরামর্শ প্রশংসনীয়। বহু চেষ্টা

করেও যা আমি সংগ্রহ করতে পারি নাই সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতিস্তম্ভ ও নোটিশ বোর্ডের ফটো সরবরাহ করেন শ্রীস্ফটিক উপাধ্যায়। শ্রীউপাধ্যায় ১৯৮৭ সালের জুন মাসে, অমৃতশহর যখন অশান্ত, সেই ডামাডোলের সময়ে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' স্মৃতি কমিটির সেক্রেটারী শ্রী ইউ এন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ সৌজন্যে, এই দুইখানা ফটো তুলেছেন। উপাধ্যায় মহাশয়কে যে কি ভাষায় আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব সে ভাষা আমার জানা নাই।

ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কসের শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় মুদ্রণ শিল্পে তাঁর বহুদিনের অভিজ্ঞতা দ্বারা সাহায্য করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর ঋণ ও স্মরণীয়।

ভুল তো মানব জীবনের চিরসাথী। বহু প্রকার যত্ন সত্ত্বেও অসাবধনতা-বশতঃ কোথাও কোনও ভুল থাকতে পারে। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ ভুলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার বাসনা রইল।

শ্রীসুরেশ দে

অধ্যাপক অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

৮২/বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলিকাতা-৬

শ্রীসুরেশচন্দ্র দে মহাশয়কে ।

শ্রদ্ধেয় সুরেশদা !

সর্ব-প্রথমে জানবেন আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার ।

আপনার বই প্রেসে গেলো কিনা জানতে চাই । ভুলবেন না, আপনি এক গৌরবজনক ইতিহাসের একটি মূল্যবান অধ্যায় । ঐ অধ্যায় কাগজের বুকে কালির আঁচড়ে ধরে রাখুন । ভবিষ্যৎ ওকে চায় । আপনার কাছে আপনার জীবনের ঐ অধ্যায়ের যা মূল্য দেশের কাছে তার দাম ওর চেয়ে লক্ষগুণ বেশী ।

আজ আর নয় । আপনি আমাদের আর একবার সশ্রদ্ধ নমস্কার নিন ।

ইতি—আপনার ভাই,

অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
২৩শে জানুয়ারী ১৯৮৮

শ্রীসুরেশচন্দ্র দে
২২/৪, প্যাটেলনগর
জামসেদপুর-৯
বিহার

মুখবন্ধ

উপনিবেশবাদী ও মহা ধুরন্ধর ব্রিটিশ কুটনীতিবিদের অপ-শাসনের ও শোষণের অক্টোপাশের বন্ধন হতে দেশকে মুক্ত করতে ভারতে যে অপ্রতিরোধ্য দেশ প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল তা প্রবাহিত হয়েছিল প্রধানতঃ দুইটি ধারায়।

একটি গান্ধীবাদ, অপরটি সশস্ত্র বিপ্লববাদ। জাতির জনক মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী অ-সহযোগ আন্দোলনের জনক ছিলেন। অহিংসা ছিল তাঁর সংগ্রামের অস্ত্র। তাই গান্ধীবাদ যথার্থ নাম।

অপর পক্ষে সশস্ত্র স্বাধীনতার উদ্যোগকে সুষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু অর্জন করলেন 'নেতাজী' উপাধি, আর রক্তেরাঙ্গা বিপ্লবের ধারা পেল সুভাষবাদ শিরোনাম। কিন্তু বিপ্লববাদের ইতিহাস, গান্ধীবাদের চেয়ে ছিল ব্যাপক এবং কালের বিচারে পুরাতন। তার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে ছিল সমস্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, চীন, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকার নানা দেশে, রাশিয়া পর্যন্ত। বলতে গেলে—১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের 'ফকির-সন্ন্যাসীর বিদ্রোহ' হতেই তার জন্ম।

১৭৫৭র পলাশী যুদ্ধের পর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও ডামাডোলের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর কেটে যায় কয়েক বৎসর। সেই নৈরাজ্যের সময়েই ধূর্ত ইংরেজ শাষকের কুটিল চক্রান্ত বুঝতে ভারতের কৃষককুল অস্কে কিন্তু ভুল করেন নি। দেশের প্রশাসনে শ্বেত-ইন্দুর ঢুকে দেশের ধনভাণ্ডারকে তছনছ করে দিচ্ছে, এই অতি সত্য, অত্যন্ত নির্ভুল সত্য নিঃসংশয়রূপে সর্বপ্রথম চাষীভাইরা অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ সৃষ্ট ও প্রাদেশিক শাসকগোষ্ঠীর মদতে পুষ্ট 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'এর ফলে পরগাছা, ভুইফোর জমিদারদের জন্ম, ও তাদের প্রত্যক্ষ আর ধূর্ত ব্রিটিশ সরকারেব পরোক্ষ কুশাসনে লাঞ্ছিত ও শোষণে বঞ্চিত ভাগ্যহীন কৃষকগণ তিক্ত, বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। কারণ জমিদারী প্রথার ফলে ভারতের চিরাচারিত গ্রাম-সমাজ-ভিত্তিক প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধস্ত হয়ে যায়। ফলে বৃদ্ধি পায় শোষণ, বৃদ্ধি পায় নির্যাতন। লণ্ডনের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে বোম্বাই প্রদেশের খাজনা ছিল আশি লক্ষ টাকা। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে সেই রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে হ'ল

দুই কোটি উনচল্লিশ লক্ষ টাকা। তবুও তাঁকে দয়ার-সাগর-ভারত-সম্রাজ্ঞী বলেই অভিহিত করতে হল। হায়রে ভারতের ভাগ্য!

নির্দয় সরকারের আগ্রাসী নীতির ক্রমবর্ধমান লালসা মিটাতে দরিদ্র কৃষকদের গাঁটের কড়ি মাঠের ফসল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদারগণ খাজনা, তহুরী, পথকর, জলকর, বিবাহকর, পার্বণী, পুণ্যাহ, স্কুল খরচ, ডাক খরচ, তীর্থ খরচ, ভোজ খরচ, সেস্ প্রভৃতি বহু হাস্যকর অছিলায় আদায় করতেন। হতভাগ্য চাষীগণ জমিদারের দাবী মেটাতেই ফতুর। তাই তারা ক্ষুধার অসহ্য জ্বালায় দিশেহারা। ক্ষুধিতদের কাছে আইন শৃংখলার কোন মূল্যই রইল না। অনাহারে ক্লিষ্ট দলিত হৃদয়ের সঞ্চিত বিক্ষোভ নানা প্রদেশে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ল। নির্যাতিত হৃদয়ের সর্বস্বহারাদের হা-হা-কার ধনুকের শাণিত তীরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। উদাহরণ রূপে উল্লেখ্য ১৭৮৩ সনের রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ, ১৮৪৪ সালের ভীল বিদ্রোহ, ১৮'২ সনের শোন বিদ্রোহ, ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ভগবান বিরসা বিদ্রোহ, আসামের রঙ্গিয়া বিদ্রোহ, ১৮৭৮ সনের নীলচাষীদের বিদ্রোহ, এই সবই ছিল স্বৈরাচারী শাষকদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত প্রজার সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধ।

পরাধীন ভারতবাসীর এই স্বাধীনতার স্পৃহাকে দাম্ভিক ইংরেজ সরকার অনধিকার চর্চা ভাবল। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বেচে থাকার অধিকারের দাবীকে ভেঙ্গে চুরে, গুঁড়িয়ে দিতে হৈ, হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল জমিদারের লাঠীয়াল। লাঠিয়ালের সাহাযো এল সরকারের পুলিশ, রাইফেলধারী জোয়ান। সবার পেছনে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়াল লালমুখো ফৌজ। তবে, হাঁ,—এই সবই ছিল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থান।

বঙ্গদেশে যিনি ভারতের স্বাধীনতার প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই দেশ-বৎসলের নাম ছিল ঋষি রাজনারায়ণ বসু। নিম্নের দলিলটি তারই সাক্ষ্য বহণ করে।

জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর সঞ্জীবনী সভা নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি নামক পুস্তকে নিম্নোক্ত পরিচয়টি পাওয়া যায়। "জ্যোতিদাদা একটি পোড়ো বাড়ীতে এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন। একটা পোড়ো বাড়ীতে তার অধিবেশন। ঋগ্বেদ পুথি, মড়ার খুলি আর খোলা তলোয়ার ছিল তার অনুষ্ঠান। রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।"

পরবর্তীকালে ১৮৭৪ সালে বিলেতে ব্যারিষ্টারী পাশ করার প্রাক্কালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যারিষ্টার পি, মিত্রের আলাপ। তারপর ভারতে বন্দেমাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে মিত্র মহাশয়ের মধ্যে স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা জেগে উঠে। তিনি ১৯০২ সনে মদন মিত্র লেনে অনুশীলন সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির সভ্যগণ সশস্ত্র বিদ্রোহে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন। সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি হলেন বাঙ্গলার বাঘ বাঘা-যতীন। এই বুদ্ধিদীপ্ত দেশ প্রেমিকের সঙ্গে স্বামী অখন্ডানন্দের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের আলাপ হয়। স্বামীজী যতীন্দ্রনাথকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেশের সর্বপ্রকার কল্যাণের জন্য সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা না এলে বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক ব্রত অসমাপ্ত থাকবে।

তারপর ১৯০৩ সনে স্বাধীনতার আর এক স্বপ্নদ্রষ্টা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বরদা হ'তে বঙ্গে এলেন। সাথে নিয়ে এলেন মহারাষ্ট্রের ঠাকুর সাহেবের বিপ্লব মন্ত্র। উঠলেন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়ী। পরাধীনতার বেদনা বিদ্যাভূষণকেও বিচলিত করেছিল। তিনি নিভৃত এক বৈঠকে শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীযতীন মুখার্জী (বাঘা যতীন) ও শ্রীযতীন ব্যানার্জীকে (পরে নিরালম্ব স্বামী) মিলিত করলেন। তিন জনেরই জীবনের প্রধান লক্ষ্য—সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।

বাঙ্গলায় পা দিয়েই শ্রীঅরবিন্দ দেশের যুব শক্তিকে ক্ষাত্র ধর্মে দীক্ষা দিতে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মাধ্যমে জ্বালাময়ী ভাষায় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর তেজোদীপ্ত উপদেশ বাঙ্গালার তরুণ মন ও মস্তিষ্ককে দেশপ্রেমে বহ্নিময় করে তুলেন। সৃষ্টি হল এক দল রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর।

জন্ম নিল কানাই, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, প্রমোদের মত বঙ্গমাতার বীরসন্তান গণ। রাসবিহারী বসু, যতীন মুখার্জী, যাদুগোপাল মুখার্জী, এম, এন, রায়, অরবিন্দ ঘোষের মত নব নব তত্ত্ব সৃষ্টিকারী চিন্তাশীল রাজনীতিজ্ঞ। মাতৃমন্ত্রের সেই ঢেউ চট্টগ্রামকেও উদ্বেলিত করল। ভারতের পূর্বদিগন্তে এই চট্টগ্রামে, মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, দেশ মাতার একনিষ্ঠ সেবক, সূর্য কুমার সেনের ওরফে মাষ্টারদার আবির্ভাব হল। যেন আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ।

স্বাধীনতার সাধক মাষ্টারদা দেশপ্রেমিকদের স্তিমিত চেতনাকে সচকিত করে তুললেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্র ও গ্লানিতে অভিভূত হয়ে, তিনি চট্টলের ঘরে ঘরে জাগরণের বাণী পেঁছে দিলেন। চট্টগ্রামবাসীর মনে স্বদেশ প্রেমের আগুন জেলে চট্টগ্রামকে করে তুললেন অগ্নিগর্ভা। সেই দেশ প্রেমেরই পরিণতি—চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ—জালালাবাদের যুদ্ধ।

জালালাবাদ তার অর্জিত গৌরবের প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। পায়নি ইতিহাসে তার যথাযোগ্য স্থান। কারণ দেশ ছিল তখন বিদেশী শাসনের অধীন। সত্য প্রকাশে দেশবাসীর ছিল সরকারী দমন, পেষন ও পীড়নের ভয়। সত্য কথা বলে সরকারও দেশের সর্বত্র নিদ্রিত বিপ্লব সিংহকে জাগাতে চায়নি। জালালাবাদ সম্বন্ধে এপর্যন্ত যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা নিছক জালালাবাদ যুদ্ধের বিবরণ হ'তে পারে, কিন্তু তা জালালাবাদের ইতিহাস নয়। সেখানে অনেক কথা বলা হয়েছে তবুও সব কথা বলা হয়নি।

তাছাড়া ভারতের কুবের ভান্ডারকে নিংড়ে নিযে ব্রিটেনকে সমৃদ্ধশালী করার দুর্ণীতির বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িযে ছিলেন তাদের মধ্যে কত শত মহাত্মা যে ফাঁসীর মঞ্চে, গুলীর আঘাতে, পুলিশের ডান্ডার বাড়িতে মৃত্যু বরণ করেছেন, তাদের সকলের কাহিনী ইতিহাস ধরে রাখতে পারেনি। একদিন জালালাবাদ শহিদদেরও গৌরবগাথা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে সেই আশংকায় ভীত হয়ে কাঠবেড়ালী হয়েও সেতু বন্ধনের মত দুরূহ কাজে আমি ব্রতী হয়েছি। সেই জন্যই লিপি ও চিত্রে মুক্তির তীর্থ জালালাবাদের অবতারণা। সর্ব্বোপরি যাঁরা ইতিমধ্যেই ইতিহাসের নায়কে পরিণত হয়েছেন, সেই দধিচীদের বীরত্ব, বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধি, ত্যাগ ও দেশ প্রেমের চেহারা দেশবাসীর মননের জীবনী-শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। এখানেই পরিত্রানের রাস্তা হয়ে গেল, সেই তথ্য যথাসাধ্য ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। বইটি পাঠান্তে যদি একজন দেশ-সেবকও বিরলে বসিয়া একবারের জন্যও এই স্বদেশ পাগলদের মাতৃযজ্ঞে আত্মবলীর মহানুভবতা উপলব্ধি করেন ও ত্যাগের উজ্জ্বল মহিমা স্বীয় জীবনে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন তবেই আমার বহু দিনের যত্ন শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করব।

শ্রীসুরেশ দে

ভূমিকা

ধরিবাজ ব্রিটিশ কূটনৈতিকগণ সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামকে সন্ত্রাসবাদ ও সংগ্রামীদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে বিদেশী সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জনসাধারণের ঘৃণার উদ্রেক করে এই আন্দোলনকে দমন করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তা কবতে পারেন নাই। তাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সরকারের দমন, পীড়ণ, নির্যাতনকে উপেক্ষা কবে এই আন্দোলন দিন দিন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে।

এই আন্দোলনের উদ্গাতা, নেতা ও কর্মীদের অসংখ্য বিবৃতি, বক্তৃতা, লেখা ও বক্তব্য হতে একথা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে যে এই আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল চূর্ণ করা ও পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য দেশব্যাপী সংগ্রাম সংঘঠন করা। জালালাবাদব কর্মী ও নেতাদের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনাতেও এই সত্যই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

তাছাড়া মুক্তি পিয়াসী পরাধীন জাতির তরুণরা কখনও কখনও অত্যাচারী বিদেশী সরকারেব নিষ্ঠুর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ জানায়, তবে তাতে অস্বাভাবিকতা কিছু আছে কি? না, কেবল সেজন্যই জাতীয় আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদ পর্যায়ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে প্রধান বিচার্য বিষয় হল, সেই যুগে, সেই বিপ্লব প্রচেষ্টা জাতির অগ্রগতিকে ব্যাহত করছিল, না, মুক্তিপথে জাতিকে উৎসাহিত করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কেবল মাত্র সাম্রাজ্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদের অনুচর, সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদে যারা সৌভাগ্যের সুযোগ পেয়েছিল কেবল তাদেরই বক্তব্য ছিল এই আন্দোলন প্রগতির পরিপন্থী। অথচ এই আন্দোলনের ফলে জনসাধারণ উৎসাহিত বোধ করেছিল, নানাভাবে আন্দোলনকে সাহায্য করেছিল ও সহানুভূতি দেখিয়েছিল। নতুবা মাষ্টারদা'র পক্ষে চার বৎসরকাল (১৯৩০-১৯৩৩) আত্মগোপন করে এই আন্দোলন পরিচালনা করা তাঁর পক্ষ সম্ভব হত না। একথা অতি সঠিক ও সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে আন্দোলনের এই ধরনের বিকাশই ইতিহাসের অমোঘ গতি।

বাংলাদেশে ১৯০৮, ১৯০৯ এবং ১৯১০ সনে যে বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা হয়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ের এই বিপ্লব বহুদূর অগ্রসর হতে না পারলেও ক্ষুদিরাম, কানাইলাল প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় শহীদদের অতুলনীয় দেশপ্রেম ও আত্মদানের আদর্শ দেশবাসীকে বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যুবকদের বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

তারপর রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে দেশীয় সিপাইদের সহযোগিতায় সারা ভারতে বিপ্লব অভ্যুত্থানের যে আয়োজন হয়েছিল, শেষ মুহূর্তে ১৭৫৭র মত এক মিরজাফর দ্বারা সেই পরিকল্পনা ফাঁস না হলে এই অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা যে কি পরিণতি লাভ করত তা আজ কল্পনা করাও কঠিন।

অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে যতীন মুখাজীর্র নেতৃত্বে, মহেন্দ্র-প্রতাপ, হরদয়াল, এম, এন, রায় প্রভৃতির সহযোগিতায় জার্মান সাম্রাজ্যের সাহায্যে বিদেশ হতে অস্ত্র আমদানি করে ভারতে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের চেষ্টা করা হয়। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্তর্জাতিক বিরাট বিপ্লবী পারকল্পনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

যা ঘটে যায় তার নিরপেক্ষ বিবৃতিই সাধারণত ইতিহাস। কিন্তু আত্ম-বিবরণ মূলক কাহিনী তা নয়। যিনি কাহিনীকার তিনি যদি ঘটনার অংশ-গ্রহণকারী হন তবে অনেকগুলি তাঁর নিজের উদ্যোগে ঘটে। তাই তার লেখায় থাকে আবেগ, বিদ্বেষ, ক্ষোভ, আনন্দ, হতাশা, আশা প্রভৃতি মানসিক পরি-বর্তনের প্রকাশ। তাই সুরেশ দে বাস্তব ঘটনার জীবন্ত রূপ বিবৃত করেছে মাত্র। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও দেশপ্রেমিকের জন্য অসীম দরদ সুস্পষ্ট রূপেই ফুটে উঠেছে তার লেখার ছত্রে ছত্রে।

কাহিনীটি হল—ইংরেজের কুশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অংশ। সুরেশ ছিল ব্রিটিশ ও বিপ্লবী যুদ্ধের মুখোমুখী লড়াইয়ে এক-জন সংগ্রামী সৈনিক। ইতিহাস স্রষ্টার হাতেই এই ইতিহাস লেখা। তাই কাহিনী এত বাস্তব, প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে। আমার বিশ্বাস, এই বই সহজেই সকলের মন স্পর্শ করতে পারবে। এখানে বলে রাখা ভাল এই বিপ্লব আন্দোলনে যারাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তারা সকলেই ছিলেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের তরুণ তরুণীগণ, অল্প সংখ্যক ইংরেজ ভক্ত পরিবার ছাড়া, আপামর জনসাধারণ ছিলেন বিপ্লবের প্রতি অনুরক্ত ও সহানুভূতিশীল।

বিদেশী সরকার পশুশক্তির উপর নির্ভর করে ভারতবর্ষে তাদের শাসন ও

শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন ও পরিচালিত করছিলেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করতে, অপশাসন হতে দেশকে মুক্ত করতে, সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করতে হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার পথকেই বিপ্লবীরা যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করেছিলেন। অহিংসায় বিশ্বাসীদের মধ্যে অহিংসাই ছিল মুখ্য, স্বাধীনতা গৌণ। একথাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে তাঁরা বলতেন হিংসার স্বাধীনতা কাম্য নয় কাম্য নয়। আবার ইতিহাসকে বিকৃত করে তাঁরাই বলছেন স্বাধীনতা অহিংসার পথে এসেছে।

কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত, কুৎসার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সনের সংগ্রামের ইতিহাস চিরস্মরণীয় হ'যে আছে। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব, নৌ-বিদ্রোহ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। একথা আজ প্রমানের অপেক্ষা রাখে না যে এই সমস্ত দুর্নিবার আন্দোলন ১৯৪৭ সনের আপোষ মীমাংসাকে ত্বরান্বিত করেছে।

বিপ্লব আন্দোলনে আতঙ্কিত, সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতম দমননীতি এই আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করেছে। বিপ্লবের এই ব্যর্থতার ইতিহাসও দেশের মানুষকে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল করেছিল এবং বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে সময় সময় অতুলনীয় বীরত্বের প্রকাশও দেখা গিয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ, পুলিন দাশ. পি, মিত্র, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ মনীষীরা যে প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন ও উদ্যোগ নিয়েছিলেন পরবর্তীকালে ১৯৩০ সনে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ তারই পরিণতি স্বরূপ।

১৯২৯ সালে ৩১ ডিসেম্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে ভারতের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য কোনও উদ্যোগ আয়োজন ছিল না। ১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটিয়ে মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা সম্ভব হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লব বাহিনীর শক্তি, বল, বীর্য ও সাহসের দ্বারা। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রাথমিক সাফল্য যুবশক্তির একাংশকে বিপ্লবী কর্ম-পন্থার দিকে দুর্নিবার ভাবে আকর্ষণ করে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে নানাভাবে বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৩০ সনের ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের

ও বিপ্লবী সেনাবাহিনীর যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের মর্যাদায় আঘাত হানা সম্ভব হয়েছিল। তার ফলে সমগ্র দেশ, বিশেষ করে বাঙ্গলাদেশের যুবশক্তি প্রগাঢ় বিপ্লবী প্রেরণা অনুভব করেছিল।

জালালাবাদ বৃক্ষবিহীন নাতিউচ্চ ঝোপ-ঝাড় বিশিষ্ট ছোট একটি পাহাড়ের নাম। ২১শে এপ্রিল রাত্রি ভোর হওয়ার প্রাক্কালে একদল মৃত্যুভয়হীন স্বদেশ পাগল বিপ্লবীরা এই পাহাড়ে এসে আশ্রয় নিলেন। উদ্দেশ্য এখান হতে পাঁচ মাইল দূরে চট্টগ্রাম সহরে প্রবেশ করে আরও একবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে বিপ্লব-আদর্শকে উজ্জ্বলতর করা।

বিপ্লবীদের দেশপ্রেম যে কত গভীর, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে কত তীব্র ছিল তারই নিদর্শন পাওয়া যায় জালালাবাদ সংগ্রামে। এই সংগ্রামে কে বাঁচবে আর কে মরবে তা চিন্তার বিষয় ছিল না, চিন্তার বিষয় ছিল এই মুক্তি-সংগ্রামকে কি করে পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করা যাবে।

কিন্তু সেদিন সহর আক্রমণ করা বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ ২২শে এপ্রিল বেলা তিনটার সময় ইষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ (Eastern Frontier Rifles) ও সুরমা ভ্যালী লাইট হর্স (Surma Valley Light Horse) নামে দুই কোম্পানী (Company) সৈন্য নিয়ে ক্যাপ্টেন টেইট (Capt. Taitt) কর্ণেল ডালাস স্মিথ (Col. Dallas Smith) এবং পুলিসের ডি, আই, জি ফারমার (D.I.G. Farmer) বিপ্লবীদের বন্দী করার মতলবে জালালাবাদ আক্রমণ করলেন।

বিপ্লবী নেতা লোকনাথ বল জালালাবাদের বক্ষে এমন একটি ব্যূহ রচনা করলেন ও ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য মরণফাঁদ ফাঁদলেন যে রণকৌশলের বিন্দু বিসর্গও রণদক্ষ ইংরেজ সেনা-নায়কেরা বুঝতে পারেন নি। ব্রিটিশ ফৌজ আক্রমণ করতে এসেও বাস্তবপক্ষে তারাই আক্রান্ত হলেন। বিপ্লবী বাহিনী অতর্কিতে, আচম্বিতে ঝড়ের বেগে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঘটনার আকস্মিকতায় ভাল করে শত্রুপক্ষ কিছু আন্দাজ করার পূর্বেই বহু জওয়ান হত ও আহত হলেন। বাকীরা ভীত মেষপালের ন্যায় যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। বেতনভোগী ব্রিটিশ ফৌজীদের স্বদেশপ্রেমীদের দ্বারা প্রথম পিটুনীর টাটানী উপশম হ'তে না হ'তেই দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন ও পরাজয় বরণ করেন। প্রথম পরাজয়ে শত্রুর মন ভেঙ্গে পড়েছিল, দ্বিতীয় পরাজয়ে আর্মির মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে পড়ল। তৃতীয় আক্রমণে

মেশিন গানের বিরুদ্ধে স্বল্প পাল্লার শুধু রাইফেল ও মাস্কেট্রি হাতে নিয়ে বিপ্লবীরা প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধের মত সমান পারদর্শিতা দেখাতে পারেননি বটে, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় তারাই লাভ করেন। শত্রু প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে বিপ্লবীদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেননি। তৃতীয় যুদ্ধে ১২ জন বিপ্লবী শহীদ হন ও তিনজন আহত হন। আর সরকারের ঘোষণা অনুসারে জালালাবাদ যুদ্ধে সরকারের ৮০ জন সৈনিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। বে-সরকারী মতে বহু। আহত অনেক।

অগ্নিযুগের সেই বীরত্বের কাহিনীই "মুক্তির সোপান জালালাবাদ" বইতে জালালাবাদের বীর যোদ্ধা শ্রীমান সুরেশ তার প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞান সুন্দর রূপে বর্ণনা করে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, আমার মতে তা তিনি পেরেছেন। যা এক কথায় বলা যায় তা দশ কথায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে সত্যকে মূর্ত করেছেন। আমি আশা করি বীরত্বের এই বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস পাঠকদের দ্বারাও সমাদৃত হবে।

জয় ভারত

২, যদু ভট্টাচার্য্য লেন,
কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

গণেশ ঘোষ —

ঐতিহাসিক জালালাবাদ সংগ্রামের শহীদবৃন্দ



নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন ও বিধু ভট্টাচার্য



টেগরা ও মতি কানুনগো



প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত ও নির্মল লালা



জিতেন দাস, মধু দত্ত ও পুলিন বিকাশ ঘোষ





অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার

জালালাবাদ

"বাঙ্‌গল ভয়, আঙ্‌গল জয় সার্থক হলো কাজ !"

২২শে এপ্রিল শ্রদ্ধায় স্মরণীয় একটি দিন, ভারতবাসীর গর্ব করার মত একটি তারিখ। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক কারণে তার অমরত্ব। সে ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লেখা দেশপ্রেমীদের বীরত্বের ইতিহাস। সে ইতিহাস বীর চট্টগ্রামের ইতিহাস।

চট্টগ্রাম অবিভক্ত ভারতের পূর্বদিগন্তের এক ছোট্ট প্রান্তীয় জেলা সহর, প্রকৃতির রম্য ক্রীড়া-নিকেতন। পূর্বে সুউচ্চ পাহাড় গারো আর লুসাই। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। তার বুকের উপর দিয়ে শুভ্র উপবীতের ন্যায় প্রবাহিত তিন নদী—হালদা, কর্ণফুলী, আর দক্ষিণে শঙ্খ। প্রভাত সূর্যের অরুণ কিরণ সবার আগে চট্টলবাসীদেরই অভিবাদন জানায়। সমুদ্র যেমন উত্তাল, উদ্দাম, অপ্রতিরোধ্য চট্টগ্রামবাসীরাও তেমনি সংকল্পে কঠোর, সাহসে দুর্জয়, ব্রত সাধনায় দুর্মদ। তাদের আদর্শ আকাশের মত উচ্চ, আর বুদ্ধি তরবারির মত শাণিত।

এই চট্টগ্রাম ছিল সর্বভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবের বিরাট সংগঠনমালার মধ্যে একটি কোরক। কিন্তু এই কুঁড়িটি ছিল অগ্নিগর্ভ।

যখন অরবিন্দ ঘোষের উদাত্ত আহ্বান, রাসবিহারী বসুর ঐন্দ্রজালিক সংগঠন শক্তি, যতীন্দ্র মুখার্জীর দক্ষ ও গঠনশীল অধ্যবসায়ের অভাবে অসহায় বিপ্লবীদলগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন, তখন নৈরাশ্যের জড়তা ঝেড়ে ফেলতে চট্টগ্রাম নিজের প্রচেষ্টায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল। তারই একটি স্ফুলিঙ্গ ২২শে এপ্রিলের ঘটনা, যা ঘটেছিল জালালাবাদ পাহাড়ে। চট্টগ্রাম শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল এই জালালাবাদ পাহাড়ের পাষাণ বেদীমূলে বারোজন শহীদ তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শৃঙ্খলিত দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে অর্ঘ রচনা করেছিলেন—জীবনাহুতি দিয়ে, বারোজন দধীচি আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে, স্বাধীনতার জয়যাত্রার পথকে আলোকিত করেছিলেন। জালালাবাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা ভয়কে জয় করেছিলেন। মৃত্যুর গর্জনের মধ্যে শুনেছিলেন দেশবন্দনার সঙ্গীতের সুর। দাসত্বের শিকল বিকল করতে জনগণমনে তুলেছিলেন বিপ্লবের ঝড়।

জগৎ জোড়া সাম্রাজ্য শক্তির গর্বে স্ফীত ব্রিটিশ সিংহ সেদিন মাত্র একান্ন-জনের এক মৃত্যু পাগল কিশোর বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে, ত্রস্ত কুকুরের মত পালাতে পথ পায়নি। যে ব্রিটিশ Rules Britania Rules the Waves বলে অহংকার করতো তাদের সেই অতি গর্বকে বিপ্লবীরা খর্ব করেছিলেন। ব্রিটিশের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছিলেন। ইংরেজের লাল মুখে কলঙ্ক লেপন করেছিলেন, সিংহকে পরিণত করেছিলেন শেয়ালে। আত্মবিশ্বাসে অবিচল মাত্র ৫১ জন দামাল বাঙ্গালী তরুণ বিদ্রোহী আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সমর কুশলীদের নাস্তানাবুদ করেছিলেন, পালাতে বাধ্য করেছিলেন শুধু আত্ম-শক্তি দিয়ে—অতি সাধারণ ও পুরাতন মাস্কেট্রি রাইফেল হাতে ধরে। স্মরণীয় সেইজন্য, সেইজন্যই বরণীয়।

গল্প কথা নয়, এটা প্রত্যক্ষ সত্য যে—মহাজাতির তন্ত্রীতে তারা দীপক রাগিনীর সুর ধ্বনিত করেছিলেন।

"দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে"

২২শে এপ্রিলকে জানতে হলে একটু পিছনে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন রয়েছে। দাম্ভিক ইংরেজের প্রায় দু'শ বছরের কুশাসন আর যথেচ্ছাচারের জাঁতাকলে পিষ্ট আর ক্লিষ্ট হয়ে উত্যক্ত ভারতবাসী প্রতিকারের জন্য যখনই সরব হয়েছে, তখনই ক্রুর কুচক্রী ইংরেজ রাজপুরুষেরা কুটকর্মীর সহায়তায় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে, দানবীয় দলনে সেই আন্দোলনের মেরুদন্ডটাই ভেঙ্গে দিয়েছে—গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিলের (Good Friday) রাত্রিতে চট্টগ্রামের যুব অভ্যুত্থান ছিল এই চিরাচরিত ধারার এক ব্যতিক্রম।

ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির (I.R.A) চট্টগ্রাম শাখার সদস্যবৃন্দ রাজ-শক্তির সমস্ত ফাঁদ বানচাল করে তাদের সমস্ত কৌশলকে ব্যর্থ করে। চক্রান্তের চর-কে চরম দুর্ভোগে ফেলে রাজবিধিকে বিপথগামী করে ব্রিটিশ শক্তির অস্ত্রা-গারগুলি দখল করে নেন। বিপ্লবীগণ ব্রিটিশকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করেন এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম সাময়িক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বসম্মতিক্রমে বিপ্লবী নেতা মাষ্টারদা সূর্য সেন ক্রান্তিকারী সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশে ভারতের জাতীয়

পতাকা—তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, পূর্ণ স্বাধীন জাতির মর্যাদায় আকাশে উড্ডিন করেন। বিপ্লবীগণ উড্ডীয়মান জাতীয় ঝাণ্ডাকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করেন। 'বন্দেমাতরম্' ও 'ভারতমাতা কি জয়' ধ্বনি দ্বারা স্বাধীন দেশের প্রথম জাতীয় পতাকাকে অভিনন্দন জানান।

রাষ্ট্রপতি মাস্টারদা নূতন সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করেন, নবজাত রাষ্ট্রের আচরণ বিধির সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করেন। বিপ্লবীগণ বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়লেন। আনন্দে, গৌরবে ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিয়ে দশদিক কাঁপিয়ে তুললেন। ৬০টি কণ্ঠের ঐক্যনাদ মেঘ গর্জনের ন্যায় আকাশ বাতাস মথিত করলো। সেই উল্লাস ধ্বনি ব্রিটিশ চিত্তকে নিতান্ত বিচলিত করেছিল। ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ব্রিটিশের পাঁচ শতাধিক সংরক্ষিত সৈন্য (Reserve force) সেদিন প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়েছিল।

এই অভাবনীয় আকস্মিক বিপর্যয়ে চট্টগ্রামে বসবাসকারী ব্রিটিশ সন্তানদের মন ভেঙ্গে পড়েছিল। দুশ্চিন্তা আর আতঙ্কে তারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। মান গেছে, এখন প্রাণ যায় যায়।

অগ্নিকল্প বিপ্লবীগণ শহরের শক্তিকেন্দ্র—পুলিশ অস্ত্রাগার ও অক্সিলিয়ারী (auxiliary) ফোর্স অস্ত্রাগার, দুইটিই দখল করেছিলেন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ভবনটি ভস্মীভূত হয়েছিল।

শহর থেকে আশি মাইল দূরে লাঙ্গলকোট আর পঞ্চান্ন মাইল দূরে ধুম অবস্থিত। জেলার প্রান্তসীমায় এই দুই জায়গাতেই রেলের লাইন উৎপাটিত এবং টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়েছিল। বহির্বিশ্ব থেকে চট্টগ্রাম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বহির্র চট্টগ্রামের সাহায্যের সমস্ত পথই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই বিপদের বেড়াজালে আবদ্ধ হতবুদ্ধি বিদেশীরা আত্মগোপনের নিরাপদ স্থান খুঁজছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন আর বিধু ভট্টাচার্য সহ ৬ জন সশস্ত্র বিপ্লবী কেন তাদের ক্লাবে গিয়েছিল।

রাজশক্তির অঙ্গহিসাবে যারা নিজেদের কল্পনা করতেন, যারা রাজশক্তির নানা অমানুষিক নৃশংসতার শরিক ছিলেন তাঁরা সেদিন অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে অস্তিত্ব বিলুপ্তির শেষ সীমায় এসে তারা দাঁড়িয়েছে। ভয়, সংশয়, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার শিকারে পরিণত হয়ে আজ অতীত দুষ্কর্মের সমীক্ষা চলেছে তাদের মনের গহনে।

অতি স্বল্প রক্তক্ষয়ে, শুধু শৌর্য দেখিয়ে যাদুকরের মত ব্রিটিশের সমস্ত সংরক্ষিত সামরিক শক্তিকে বিপ্লবীরা যেভাবে পঙ্গু করেছিলেন তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতীব বিরল। রণপটু, অতি দুঃসাহসী দু'চারজন ইংরেজ মেজর জীবনের সব আশা ত্যাগ করে বিপ্লবীদের মোকাবিলা করতে গিয়েছিল কিন্তু বিপ্লবীদের নৈপুণ্যের মুখে, প্রাণের ভয়ে হাতের অস্ত্র ও গাড়ি ফেলে পালিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল সকলকেই। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তিতে সকলেই হয়েছিল সম্পূর্ণ অবসন্ন। অতি সাহসী ছয়জন রাজভক্ত, রাজকর্মচারীদের রাজছত্র রক্ষা করতে গিয়ে বিপ্লবীদের হাতে চরম পুরস্কার পেয়ে শেষ শয্যায় শয়ন করতে হয়েছিল।

জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের গন্ধ পেয়েই কালভার্টের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে প্রাণে বাঁচলেন। তাঁকে বাঁচাতে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিলেন তাঁরই বডিগার্ড আর ড্রাইভার।

কিছু ভারতীয়ের মৃত্যুতে বিপ্লবীরা মর্মাহত হলেন। তদুপরি রাত্রি দশটায় এক ইস্তাহার বিলি করা হল। তাতে চট্টগ্রামের সর্বত্র বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। পরের দিন সকলকে ভারতীয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাহিনীতে দলে দলে যোগদান করতে আহ্বান করা হল। নবশক্তির যোগদানে যে উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হবে, বর্ধিত বলে যে প্লাবন জন্ম নেবে তার দুর্জয় তরঙ্গাঘাতে তারা কোথায় ভেসে যাবে সেই চিন্তায় ব্রিটিশদের রাত্রির ঘুম ছুটে গেল। সর্বাধিনায়কের আদেশে সামরিক সরকারের সমর পরিষদের মন্ত্রণা সভা বসল।

অন্য সকলের মধ্যে মাস্টারদার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না। অপার রহস্যের অতলে অপরূপ রতনের সন্ধানে ফিরছে তাঁর চোখ। সস্নেহে প্রত্যয়ীকণ্ঠে বললেন—উপলব্ধি সারবস্তু। বৃহৎ করে মহৎ করে বিপ্লবী স্বপ্ন রচনা করতে হবে। বড় একটা স্বপ্নের মধ্যে ছোট্ট একটা সাধনা সার্থক হয়েছে। উজ্জ্বলকে আরও উজ্জ্বল করতে হবে। মহামানবের আশীর্বাদে ভারতের মানসলোকে ছড়িয়ে আছে মহারত্ন সম্ভার। সারা ভারতের মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

পরাধীন জাতির মানসিক শক্তি অতি দুর্বল, জ্ঞানও নিতান্ত সামান্য। অবিরাম চেষ্টার সাহায্যে অলস জনশক্তির প্রতিভা স্ফুরণে সহায়তা করতে হবে। এদেশে কত অসাধারণ মানুষ আছেন, তাঁদের খুঁজে বার করা হবে আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ।

তাঁর বক্তব্যে দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই, ধোঁয়াটে ভাবের মধ্যে তা শেষ হয় না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে শক্তিময়ী বাণী। তারপর যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা প্রণালী দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, বিপ্লব প্রবাহকে দীর্ঘ-স্থায়ী করতে ও দুর্গত জনজীবনকে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে তুলে জন-মানসে বিপ্লবের ভিত গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য এখানে আক্রান্ত হয়ে জীবন দান না করে, স্থান ত্যাগ করে, বার বার আক্রমণের দ্বারা কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ যারা, তাদের মুখোশ খুলে দিয়ে বিপ্লবের সম্ভাবনাময় দিগন্তকে উজ্জ্বল করাই সর্বসম্মতিক্রমে যুক্তিযুক্ত ও তত্ত্বসিদ্ধ বলে গ্রাহ্য হল। বুকভরা আশা নিয়ে, বিজয়দীপ্ত বিপ্লবীগণ বিজিত ভূমি ত্যাগ করলেন।

"বীরদল, চল সমরে"

দুর্বার গতির প্রেরণায় মাষ্টারদার নির্দেশে, অম্বিকাদার পরিচালনায় বিপ্লবীরা এগিয়ে চলেছেন। বহনযোগ্য অস্ত্র-শস্ত্র কার্তুজ আর সংকল্প দৃঢ় মন নিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছেন। একদিকে গুলী ভর্তি ঝোলা, গুলীর ভারে টানটান। আরেকদিকে রাইফেল মাস্কেট্রির নল কাঁধে, হাতে হাতল। কোমরবন্ধে ঝুলন্ত রিভলভার, গায়ে রিপাবলিক আর্মির পোশাক—খাঁকি হাফপ্যান্ট ও খাঁকি হাফসার্ট। পায়ে খাঁকি মোজার উপর সাদা কেড্‌স্ শু। তার সঙ্গে রয়েছে ফার্স্টএডের সরঞ্জাম ও জলপাত্র।

তাঁরা চলেছেন দুঃসাহসিক অভিযানে, চলেছেন পায়ে পা ফেলে দ্রুত-গতিতে। "সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" তাই চলেছেন মাঠের মাঝ দিয়ে ক্ষেতের আল ধরে। চলতে চলতে তারা একটি তরমুজ ক্ষেত পেলেন। বড় ছোট, মাঝারি নানা প্রকার আকর্ষণীয় তরমুজে ক্ষেতটি ভরা। দেখামাত্র, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত বিপ্লবীদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা একসঙ্গে জেগে উঠলো। তারা তরমুজ ক্ষেতে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কাছে কৃষকগণ চৌকি দিচ্ছিলেন, চাষী ভাইরা এগিয়ে এলেন। বেছে বেছে বড় বড় পাকা পাকা কয়েকটা তরমুজ সংগ্রামীদের হাতে তুলে দিলেন। দিয়ে গর্ববোধ করলেন।

আবার যাত্রা শুরু হল। অবিরাম সেই যাত্রা। সে চলার যেন শেষ নেই, ক্লান্তিহীন পদযাত্রার গতির ছন্দে এগিয়ে চলেছেন রাত্রির অন্ধকারে। এইভাবে চলতে চলতে ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে সকলেই ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে পড়তে

লাগলেন, পদক্ষেপ ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দলের প্রতিটি সদস্যের এই অবসন্নতা অম্বিকাদার চোখ এড়ায়নি। অম্বিকাদার আদেশে দলের সকলেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। অম্বিকাদা সবাইকে সেখানে দাঁড় করিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। এক দোকানের বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত করলেন। কোনও সাড়া নেই। গভীর রাতে সকলেই ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। অম্বিকাদা দমবার পাত্র নন, ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাতে দরজা প্রায় ভাঙ্গার যোগাড় শুরু করে দিলেন। অনেক ডাকাডাকি, হাঁকা-হাঁকি, দরজা ধাক্কা-ধাক্কির পর ঘুম জড়ানো চোখে এক বৃদ্ধ মুসলমান দোকানী দরজা ফাঁক করে উঁকি মারলেন। মুখে দাঁড়ি, পরনে লুঙ্গি।

অম্বিকাদার সেই সৈনিক বেশ। সামনে ঝুলন্ত দুইটি রিভলভার, কাঁধের পেছনে রাইফেল, চশমার ভিতরে জ্বলজ্বলে দুইটি চোখ। এই গভীর অন্ধকারে এই চেহারা দেখে বৃদ্ধ হতবুদ্ধি, ভীত। বৃদ্ধের মনে সন্দেহ। একি সত্য, না অলীক।

অম্বিকাদার আবেদনে বৃদ্ধের সম্বিৎ ফিরে এল। সহাস্যে অম্বিকাদাকে 'সালাম আলেকুম' বলে আন্তরিক স্বাগত জানালেন।

বৃদ্ধের বিস্কুটের দোকান। বিপ্লবীরা ক্ষুধার্ত জেনে ভাণ্ডার উজাড় করে, যত তার বিস্কুট ছিল সব দিয়ে দিলেন। এই বৃদ্ধের দেওয়া বিস্কুট বিপ্লবীদের পেট ভরাবার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এই সামান্য খাদ্য তাদের ক্ষুধার তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিল। অবশেষে প্রচুর পরিমাণে জল পান করে পাকস্থলীর শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন। অম্বিকাদা ফ্যাসাদে পড়লেন বিস্কুটের দাম দিতে গিয়ে। সেই বৃদ্ধ বিস্কুটের দাম কিছুতিই গ্রহণ করবেন না। এই না-পাক কাজ তিনি কিছুতেই করবেন না, করতে পারবেন না।

তার বক্তব্য—আপনারা যে দেশের জন্য প্রাণ দান করতে প্রস্তুত আমিও সেই দেশের মানুষ হয়ে, সে দেশের মাটির শস্যে শরীর পুষ্ট করে যদি এই সামান্য ত্যাগটুকু না করতে পারি তবে এন্তেকালের সময়ে যে "দোজখেও জায়গা হবে না, বাবু।"

এ যেন রামচন্দ্রের চরণ স্পর্শে অহল্যা উদ্ধার। গ্রামীণ বাজারের গরীব গ্রাম্য দোকানীর সুপ্ত স্বদেশপ্রেম বিপ্লবীদের সংস্পর্শে উত্তাল হয়ে তার সমগ্র সত্তাকে প্লাবিত করেছে। সেই মুহূর্তে সে ভুলে গেছে সে দরিদ্র, ভুলে গেছে, জীবনধারণের একমাত্র উৎস দোকানের পুঁজিটুকু চলে গেলে

কাল দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। সে ভুলে গেছে দোকান বন্ধ হয়ে গেলে, স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ কাল উপবাস করতে হবে। পাগল করা দেশপ্রেমে সেও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। শেষে অম্বিকাদা অনেক যুক্তি দেখিয়ে সেই বৃদ্ধকে তুষ্ট করে তার পাওনা মিটিয়ে দিলেন।

ক্ষণিক বিরতির পর আবার চলার আদেশ হল। এবার চলবার গতি আরও দ্রুত। কোথায় চলেছি অম্বিকাদা ভিন্ন কেউ জানেন না। কতদূর চলতে হবে তাও কেউ জানে না। শুধু জানে, চলবার আদেশ হয়েছে, চলতে হবে। আর জানে মৃত্যুর সঙ্গে কোলাকুলির জন্যই এই বিরামবিহীন চলা, তাই বিপ্লবীরা ছুটে চলেছেন এক অজানার সন্ধানে। তাদের বুকের বল, মুখের মন্ত্র—"রিক্ত যারা, সর্বহারা, সর্বজয়ী বিশ্বে তারা।"

চলতে চলতে যখন রাতের আঁধার পাতলা হতে শুরু করেছে, যখন পূর্ব দিগন্তে ভোরের সংকেত দেখা দিয়েছে তখন বিপ্লবীরা নাগড়খানা পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিলেন। পাহাড়টি বৃক্ষবহুল। ঘন পল্লবের শীতল ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। এখানে সেখানে সবুজ লতাগুল্মে ঝোপ ঝাড়ে সমাবৃত। মধু-গন্ধী নব পুষ্পকলি পুঞ্জে পুঞ্জে মধুকরদের প্রলুব্ধ করছে, মৃদু মলয় বাতাসে বন বনান্ত শিহরিত হয়ে আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে। সেই মনোরম শোভা আর স্থান মাহাত্ম্যে সকলেই প্রভাবিত হলেন। ভোরের সুশীতল সমীরণে সারা রাত্রির চলার ক্লান্তি দূরীভূত হল। চার পাঁচজনে এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে মণ্ডলাকারে সমস্ত পাহাড়ের বুক জুড়ে ছড়িয়ে বসলেন, পাহাড়টিকে একটি দুর্গে পরিণত করলেন, হাতের রাইফেল, কাঁধের ঝোলা আর জলপাত্র নিজের নিজের পাশে রেখে, ভারবহনের কষ্ট লাঘব করলেন।

চন্দ্রের মধ্যে যেমন কলঙ্ক আছে, এই বিজয়ের মধ্যেও হতাশা ছিল। অগ্নিদগ্ধ হিমাংশু সেন, আনন্দ গুপ্ত, মাখন ঘোষাল, অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের অভাবে এই বিজয়ে হর্ষ ও উচ্ছলতার মধ্যে বিষাদও মিশেছিল। তাঁদের অভাবে দলের সকলের মনেই অস্বস্তির একটা কাঁটা বিঁধেছিল।

দলের প্রাণ পুরুষ ছিলেন মাস্টারদা। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ ছিলেন হৃদয়। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষকে তৈরী করেছিলেন মাস্টারদা। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ তৈরী করেছিলেন ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিক আর্মি। বিপ্লবীরা পাহাড়ে এসে আত্মগোপন করেছিলেন। গোপনীয়তার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা নয়, ভয় ও

নয়। আত্মগুপ্তির আসল প্রয়োজন ছিল, অভিনব উপায়ে, আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লড়বার জন্য, নব নব পদ্ধতিতে রণকৌশল রচনার জন্য, আঘাতের পর আঘাত হেনে প্রলয়ংকর আক্রমণে আক্রমণে ভারতের বসবাসকারী ব্রিটিশ মনকে ভয়ার্ত করার জন্য। পৌরুষ ও সাহসিকতার সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলকে নড়বড় করে তুলবার জন্য। সর্বোপরি প্রয়োজন ছিল—বিচ্ছিন্ন বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ করা।

সাবধানতার মার নেই। সর্বৈব সফলতা সত্বেও ছোট একটি ত্রুটির জন্য বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। শত্রু পরাজিত, কিন্তু শত্রুর চর এখনও সক্রিয়। মুহূর্তের ভুলে সব লন্ড ভন্ড হয়ে যেতে পারে। প্রতিকারের জন্য অভিজ্ঞ ও দায়িত্ববান বিপ্লবী ছাড়া অন্য কাউকে ভাবা যায় না, তাই মাস্টারদা সেনা নায়ক লোকনাথ বলকে বিপত্তির আশংকা ও গুরুত্ব সব বুঝিয়ে বললেন। মাস্টারদা কোনও আদেশ দিলেন না। শুধু তাঁর কর্তব্য বুদ্ধিকে সজাগ করে দিলেন।

জেনারেল বল চার-পাঁচ জনের একটি বিভাগ তৈরি করলেন। ঝোপের আড়ালে আড়ালে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বিপ্লবীদের বসিয়ে দিলেন। তাঁরা সারা পাহাড়ের দেহ জুড়ে অতন্দ্র অপেক্ষায় মন্ডলাকারে বসলেন। এমন একটি রণকৌশল গ্রহণ করলেন যেন যে কোন দিক থেকে শত্রুর আগমন দৃষ্টিগোচর হয়। আর দুটি সেন্ট্রি দল তৈরি করলেন। প্রত্যেক দলে তিন জন করে সৈনিক প্রহরী—একদল পূর্ব হতে পশ্চিমে, অন্যটি পশ্চিম হ'তে পূর্বে পাহাড়টি প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। প্রহরীগণ ধীর পদক্ষেপে গাছের আড় লে, নিজেদের লোক চক্ষুর অন্তরালে রেখে ঘুরে ঘুরে সব দিকেই লক্ষ্য রাখছিলেন। তাদের কাঁধে রাইফেল, গর্বে স্ফীত বক্ষ, দৃষ্টিতে আত্মবিশ্বাসের দ্যুতি। তারা দৃঢ়তায় লৌহদন্ড, সতর্কতায় উৎকর্ণ, আগ্রহে উন্মুখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিকটে ও দূরে নিক্ষেপ করে প্রতিটি দ্রষ্টব্যকে নিরীক্ষণ করছিলেন অতি মনোযোগের সংগে। মাঝে মাঝে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে বহু দূরের বস্তুকে প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাদের দৃষ্টিতে ফাঁক ছিল না।

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে"

অদূরে, ছোট ছোট চারাগাছ বেষ্টিত, ছায়াচ্ছন্ন এক বিরাট বিটপীর নিচে মাষ্টারদা অনাবিল প্রশান্তিতে মগ্ন। প্রাণবন্ত মাষ্টারদার মনটি ছিল স্বচ্ছ

সলিলের মতো শুভ্র আর স্নেহ মমতা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। শুধু বৈপ্লবিক কারণে তা কঠিন বরফে পরিণত হতো। হিমাংশু সেন পুলিশ লাইনে অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগের কালে দগ্ধ হয়ে কাতরোক্তি করছিলেন "আমায় গুলি করুন, আমাকে মেরে ফেলুন, শেষ করে দিন, বিপ্লবীর প্রত্যাশা—বীরের সদ্‌গতি হতে দিন"। সেই বাক্য যন্ত্রণার তীব্র কশাঘাত মাষ্টারদার চিত্তকে বিচলিত করতে পারেনি, পারেনি তাঁর ভাবান্তর ঘটাতে।

তখন তাঁর তরঙ্গায়িত মানস সরোবরে স্নেহের পদ্মটি একবার ভাসছিল আবার ডুবছিল। ভালবাসার মোহ তাঁর বিপ্লবী বিচারকে পরাস্ত করেছিল। হিমাংশু সেনের সুব্যবস্থার জন্য অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল একটি গাড়ি করে চলে গিয়েছিলেন।

এই ভুলের জরিমানা দিতে হয়েছিল প্রচুর। দন্ড হিসাবে হারাতে হয়েছিল চারজন সঙ্গীকে। তার মধ্যে অনন্ত সিং আর গণেশ ঘোষ ছিলেন সংগঠনের মেরুদন্ড। এরই প্রতিক্রিয়াতে দলের শুধু অঙ্গচ্ছেদ ও শক্তি ক্ষয়ই হয়নি, দলের মানদন্ডও দুর্বল হয়েছিল। বিশেষ করে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষের জন্য মাষ্টারদাও একটু বেশী স্নেহ পোষণ করতেন।

বিপ্লবীরা যেমন মাষ্টারদার কথায় প্রাণ দিতে পারতেন, মাষ্টারদার প্রাণও বিপ্লবীদের জন্য সমান মমতায় অনুরঞ্জিত হতো।

"মরণ কর্মসূচী" (Death Programme) ছিল এক মহান বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানসূচী। সেখানে ছিল মাতৃপূজার অর্ঘ্যরূপে প্রাণ বিসর্জনের মন্ত্রনা। সেই কর্মসূচী রূপায়িত হলে ইতিহাসে রচিত হতো এক বিপ্লবাত্মক ঐতিহ্য। যে শক্তি অতি সতর্কতার সঙ্গে অর্জন করা হয়েছিল, যে কঠিন পরিস্থিতি, ত্রুটিহীন অক্লান্ত চেষ্টায়, নির্ভুল উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে অতিক্রম করা হয়েছিল, সেই শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে শত্রুবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় দুশমন ধ্বংস করতে করতে নিঃশেষে প্রাণ আহুতি দেওয়াই ছিল তাদের লক্ষ্য। সেই আত্মাহুতির অগ্নিপ্রভা দেশকে দেখাতো চলার পথ। শত্রুর রক্ত আর আত্ম-বলির রুধির স্রোতে ভঙ্গ হতো মাতৃভূমির নিদ্রা।

"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"—এই মহামন্ত্র আর অমর মরণের এই সঞ্জিবনী দৃষ্টান্ত—পঙ্গু, জরাগ্রস্ত, নিস্তেজ নিশ্চেষ্ট দেশটাকে করত—সতেজ। করত অমিত তেজে বীর্যবান। জয় করত ভীরুতা, দুর্বলতা, নিবীর্যতা আর নিরাশা।

সবাই যখন আপন আপন দায়িত্বে রত, মাষ্টারদা বিরাট এক বিটপীর নিচে মগ্নচিত্ত। আমরা সকলেই কাজ করি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, মাষ্টারদার ছিল ছয়টি ইন্দ্রিয়। যে বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সহায়ে বৈজ্ঞানিক তার গবেষণায় নূতন সত্য আবিষ্কার করেন, কবি তার কল্পনাকে নিয়ে যান কল্পলোকে, সেই বিশেষ শক্তি দ্বারাই তিনি লোকের মনের ভাষা পড়তে পারতেন। এই বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে কাঁচা লোহাকে ঘষে-মেজে শান দিয়ে অস্ত্রে পরিণত করতেন। সাধারণকে করে তুলতেন অসাধারণ। লোকে যা আগামীকাল জানতে পারবেন তা তিনি অনেক আগেই বুঝতে পারতেন।

প্রথমেই তাঁর মনে ভেসে উঠলো স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করার মধ্যে যে খুঁত ছিল সে বিষয়টা। চট্টগ্রামের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ভবনটি পুরোপুরি বিনষ্ট করে চট্টগ্রামের বাইরে খবর চলাচল ব্যবস্থা বিকল করা হলেও ডবলমুড়িং বন্দরে অপেক্ষমান জাহাজটি ছিল অক্ষত। জাহাজের বেতার যন্ত্রটি ছিল কার্যক্ষম। বিপন্ন চট্টগ্রামের বিপত্তির বার্তা বাঙ্গলার গভর্ণর স্টানলি জ্যাকসনের কাছে পেঁৗছেছিল যথাসময়ে বিনা বাধায়—এটাই মাষ্টারদার ক্ষোভ।

তাঁর চিন্তার স্রোত আবার বাধা পেল লাঙ্গলকোটে রেললাইনের ধারে। এখানে ট্রেন যাতায়াত বন্ধ, রেললাইন উৎপাটিত বহুদূর পর্যন্ত। একটা মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়ে বিনা প্রাণ সংহারে স্থানটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই সবই ঘটেছে উপেন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে। পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ সুচারুরূপেই সমাপন হয়েছে। কিন্তু উৎপাটিত রেললাইনটির মেরামতিতে বাধা দেওয়ার ছিল না কোনও ব্যবস্থা। ফৌজী ট্রেনগুলি উড়িয়ে দেওয়ার জন্য ছিল না ডিনামাইট পোঁতা। যদিও এই ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত বিচ্যুতিগুলো বিরাট সাফল্যের তুলনায় সমুদ্রে শিশির বিন্দুর সমতুল্য, তবুও মাষ্টারদার বিবেচনায় এই সমস্ত ভুলের মূলে রয়েছে অজ্ঞতা, তাই তাঁর হৃদয় আক্ষেপের আঘাতে বিচলিত। তিনি ভাবছেন মনন শক্তিকে একমুখী করতে না পারলে নির্ভুল চিন্তা আসে না। চিত্তকে একাগ্র করতে পারলে তবেই তুচ্ছতার মধ্যে পাওয়া যায় অসাধারণকে।

কিন্তু এই তিনজন, এরা কারা? কোন্ গোপন রহস্যের সূত্র ধরে এদের সলাপরামর্শ, তাদের কিসের অভিযোগ? কার কাছে অভিযোগ? তাদের চোখে মুখে কিসের উৎকণ্ঠা? মন কোন্ চিন্তায় ঠাসা?

একালের সমাজের ভয়ংকর নিষ্ঠুর দর্পণে প্রতিবিম্বিত তাদের মন। আজ সমাজে যে পাপ আর অন্যায়ের কালো ছায়া পড়েছে, লোভ, ক্ষমতা আর বঞ্চনার দ্বন্দ্বে দেশের সর্বাঙ্গে যে পচন ধরেছে, মানুষ হারাচ্ছে তার শুভবুদ্ধি। সেই পচা সমাজদেহে আজকের অস্ত্রোপচার দেশকে কি সুস্থ করে তুলবে? তারই অনুভব অনুরণিত হচ্ছে তাদের অন্তরে বাহিরে। আর এই ধর্মযুদ্ধ চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে দেওয়ার কাজে আনুষঙ্গিক উপাদান-গুলিকে কাজে লাগাচ্ছে নিরলসভাবে।

এই পটভূমিকায় মাষ্টারদা, নির্মলদা ও লোকাদা পরামর্শের জন্য একত্রিত হয়েছেন একান্তে। মাস্টারদার নামের মধ্যেই যেন একটা যাদু আছে। এই নাম শুনলেই শিরায় শিরায় নেচে ওঠে রক্ত কণিকা। মনের মধ্যে যে ছবি ভেসে ওঠে, তা হলো জ্ঞান ও বুদ্ধির জীবন্ত বিগ্রহ।

মাষ্টারদা এই মন্ত্রণা সভা আহ্বান করলেন, কারণ এই ব্যবস্থাপক সভায় সমস্ত ঘটনার চুলচেরা বিচার হচ্ছে। ভুল ও সন্দেহ সংশোধিত হচ্ছে, সত্যাসত্য নির্ণীত হচ্ছে। বিদগ্ধ বিপ্লবীদের সৃষ্টিশীল পরামর্শ অনুমোদন করছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাপক পরিষদে বিন্দুমাত্রও দুর্বলতা বা নৈরাশ্যের তিনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। তাঁর পরামর্শ—চিত্ত, বিত্ত, জীবন, যৌবন সবই চঞ্চল। সংস্কার নয়, মনুষ্যত্ব বোধই আসল কথা। দেশের জন্যই আমাদের জন্ম, দেশের স্বাধীনতার জন্যই আমাদের মৃত্যু। আমাদের স্বপ্ন, আমাদের সাধনা —স্বনির্ভর দেশের দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব। তাই আমরা নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেছি দেশের জন্য। বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র গৃহকোণে অমৃতের সন্তান আমরা। আত্মবিশ্বাস আমাদের শক্তির উৎস। অন্তরের জ্যোতিস্পর্শে বন্ধন শৃংখল ছিন্ন করে আমরাই দেবো মুক্তির আস্বাদ। আমরাই তো আমাদের দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা।

মাষ্টারদা দৃঢ় কণ্ঠে প্রেরণাময় ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন—"ইংরেজ এখন হীনবল, চট্টগ্রামে তাদের হুকুমত তো এখন বিপর্যস্ত। তাদের হৃৎকম্পন উঠেছে। হিসাব নিকাশের এইতো সময়। আরও কঠিন আঘাত হানার এইত মহেন্দ্রক্ষণ। মাষ্টারদা বলে চললেন—দেশমাতৃকার সেবা মহামানবের কর্ম। দেশের জন্য প্রাণদান শ্রেষ্ঠ কীর্তির চেয়েও সুমহান। স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের মিলন ঘটিয়ে তোমাদের অস্থির জীবনের প্রতিফলন ভারত আত্মার সিংহ দুয়ারে পৌঁছে দাও। দলের আর দশের মিশ্রণে যে নতুন প্রেরণার উদ্ভব হবে তাতে দেশে

জাগ্রত জীবনের পুনরুজ্জীবন হবে। তোমরা দুঃখের পাবকে অন্তরের মলিনতা দূর কর।

আমাদের একমন, একপ্রাণ, একধ্যান, একজ্ঞান একতার ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভারতমাতার পূজামন্দিরের প্রদীপ করো। ঝড়বাদলের আঁধার রাতে নিশিদিন আলোর শিখা হয়ে থাকবে, দিকভ্রান্তদের দিশারী হবে।

মাষ্টারদার একটা বাণীর কত দীপ্তি। আলো করে দেয় সারা দেহমন। চিত্ত জাগিয়ে তোলে রুদ্র ভৈরবের তান্ডব।

"অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চলরে চলরে চল"

মাষ্টারদার চৌম্বক শক্তিময়ী প্রেরণায় সেদিনের আলোচনা সভার পরামর্শ চলেছিল আরও উন্নত বিপ্লবাদর্শ ও তার ভূমিকা নিয়ে। সলা পরামর্শ চলছিল সাঁড়াশি অভিযান সম্বন্ধে। বিপ্লবীরা পরিকল্পনা করছিলেন পরবর্তী আক্রমনের রণ-কৌশল নিয়ে। কিন্তু সেদিন কোনও আক্রমণ করা হল না। আক্রমণ করবে কাকে ? দেশের শত্রু ব্রিটিশ। সেই ব্রিটিশ শাসনের কোনও অস্তিত্ব সেদিন চট্টগ্রামে ছিল না। ছিল না সাম্রাজ্যবাদের কোন প্রতিভূ। তিন দিন তিন রাত চট্টগ্রাম ছিল পূর্ণ মুক্তাঞ্চল। সেদিন চট্টগ্রামে বসবাসকারী ব্রিটিশগণ স্বজন আশ্রিত অ্যাংলো ইন্ডিয়ানগণকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে চড়ে বঙ্গোপসাগরে আত্মগোপন করে ছিলেন এবং শেষ বিচারের দিনের কথা মনে করে শিউরে উঠছিলেন।

সেদিন ব্রিটিশের পুলিশ বাহিনী ভয়ে বাড়ির ভিতর বসে হরির নাম জপছিলেন আর ভয়ে কাঁপছিলেন। গুপ্তচরেরা ছিল ভীত। এরাই ইতিহাসের পঞ্চম বাহিনী, এরাই রামায়ণে মন্থরা, মহাভারতের শকুনী, ওথেলোতে ইয়াগো।

আর এদিকে বিপ্লবীরা জঠরে জ্বালা জুড়াতে জলপাত্র থেকে ঘন ঘন জল পান করছিলেন। তাতে ক্ষুধার জ্বালা আরও বৃদ্ধি পেয়ে সর্ব শরীরে পীড়া সৃষ্টি করছিল।

ক্ষুধাকাতর বিপ্লবীগণ ফলমূলের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করছিলেন, কিন্তু খাবার উপযুক্ত কোন ফল সে পাহাড়ে ছিল না। দু'চারটি যাও ছিল তা রুদ্র বৈশাখের প্রখর তাপে রৌদ্রদগ্ধ হয়ে পূর্বেই ঝড়ে পড়ে গেছিল।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে ত্রিপুরা সেন একটি আম গাছের মগডালে একটি কাঁচা আম দেখতে পেলেন। এই দুরারোহ বৃক্ষ বিপ্লবী ত্রিপুরা সেনের কাছে কোন সমস্যাই ছিল না। অনেক যত্নে ও শ্রমে আমটি সংগ্রহ করে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে তিনি সেটি মাণ্টারদার হাতে তুলে দিলেন। টেগরা আরও কতকগুলি কাঁচা আম নিয়ে মাণ্টারদাকে দিলেন। মাণ্টারদা আদেশ দিলেন "সবাই ভাগ করে খাও।" সমব্যথী সতীর্থরা সকলে মিলে পরমানন্দে সেই অম্ল অমৃত আস্বাদন করেছিলেন। কেউ বঞ্চিত হন নি, আর এটুকু আস্বাদনই ছিল সেদিনের গোটা দিনের ভোজন। তবে ক্ষুধার আগুনের চেয়ে তাঁদের মনের আগুন ছিল দ্বিগুণ। ব্রিটিশ বিদ্বেষ আগুনে গায়ের রক্ত টগবগ্ করে ফুটছিল।

শনিবারের দিন-শেষে অস্তাচলগামী দিবাকর ফতেয়াবাদের পাহাড়ের উপর আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। লোহিতাভ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বিপ্লবীরা ভাবছিলেন কবে এমনি করে ব্রিটিশের রক্তে লাল হয়ে যাবে দেশের মাটি। দিনের আলো নিবে গেল। কাজল কালো আঁধার রাত চারিদিক ঘিরে দাঁড়াল। আঁধারের পরশ পেয়ে বিপ্লবীদের মনময়ূর নেচে উঠলো, এগিয়ে যাবার জন্য পা দু'টো ছটফট করতে লাগলো। আজ তাদের জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

জগৎজোড়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যে চিরন্তন যুদ্ধ তারই ক্ষুদ্র সংস্করণ, যুগচেতনায় সমৃদ্ধ চট্টগ্রামের যুব জাগরণ।

স্বদেশ সাধকগণ অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে দুরূহ পর্বত হতে অবতরণ করলেন। তাদের লক্ষ্য শহরে প্রবেশ করা, ইংরেজ শক্তির মোকাবিলা করে দক্ষযজ্ঞের সৃষ্টি করা। তাদের আশা, শহরের পাশে, আক্রমণের সুযোগে ভরা সুরক্ষিত একটি বাসা। এই সবই ছিল অনিশ্চিতের গর্ভে, কারণ নির্ভুল অঙ্কের কৌশল তাদের জানা ছিল না। বাধাকে দলিত মথিত করে বনবাদাড়ের মধ্য দিয়ে ঝোপঝাড়ে ও কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে ক্ষতবিক্ষত হয়ে প্রতি পদে হোঁচট খেয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন, চলেছেন অতি সন্তর্পণে অকুতোভয়ে, দুর্গম পথ দুস্তর বন জঙ্গল অতিক্রম করতে করতে, পিচ্ছল পথে পা ফস্‌কাতে ফস্‌কাতে। পাহাড় থেকে নেমে এসে এবার বিপ্লবীরা সমতলে পা ফেলে দল বেঁধে ছুটে চললেন—বক্ষ তাদের আবেগ স্পন্দিত, কর্ণ তাদের সজাগ, দৃষ্টি তাদের তমসা ভেদী। শিরে সংক্রান্ত হলেও বিপদে তাদের মধুসূদন ছিল

না, ছিল আপদে আত্মপ্রত্যয়। বজ্রকঠিন মনে ছিল ধনুর্ভঙ্গ পণ—দুর্জয় অভিযানে ব্রিটিশের শক্তিকে খান খান করে দিতে হবে, ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে।

তাই সারারাত নিরবচ্ছিন্ন চলার পর প্রভাত আসার পূর্বেই মুক্তিফৌজরা শ্যামলীমার শাড়ি পরা এক সুউচ্চ পাহাড়ের বুকে আশ্রয় নিলেন। সারারাত বিরামহীন পথ অতিক্রমে তাঁরা ছিলেন ক্লান্ত ও অবসন্ন, পা ফুলে উঠেছিল। কিন্তু নিসর্গ শোভার নয়ন ভুলানো রূপে তাদের চিত্ত ভরে গেল। শরীরের গ্লানি তাঁরা ভুলে গেলেন। পাখীর কূজন, অলির গুঞ্জন, ফুলের বাহার, মঞ্জরীর নব সাজ আর পত্রপল্লবে বাতাসের মর্মর ধ্বনি এই অরণ্যচারী বিপ্লবী-দের মন প্রাণ হরণ করলো। ঘন পল্লবের ছায়াচ্ছন্ন আশ্রয়ে, আলো ছায়ার লুকোচুরি দেখতে দেখতে বনানীর অপরিমেয় আতিথেয়তার কোলে ঢলে পড়লেন। লতাগুল্মে, মুকুলে-মঞ্জরীতে ভরা গাছের নিচে বসে মাস্টারদা আর অম্বিকাদা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করছিলেন।

কয়েকজন যথারীতি ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিলেন। তাদের চক্ষু কর্ণ দুই-ই ছিল সচেতন। অম্বিকাচরণ চক্রবর্তী আর সূর্যকুমার সেন ছিলেন বহুদিনের বিপ্লবী বন্ধু। সর্বক্ষণের হরিহর আত্মা। তাদের স্নেহাতুর মন প্রাণপ্রিয় বিপ্লবীদের অনাহারক্লিষ্ট মুখগুলি দেখে ব্যথায় ভরে উঠেছে। খাদ্য আর নিরাপত্তার সমস্যা বিপ্লবীদের অস্তিত্বের মূল ধরে নাড়া দিয়েছে। সেই চিন্তাতে দু'জন বিব্রত। কিন্তু একটা উপযুক্ত উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। নানা বিপত্তি আর বিপর্যয়েও মাস্টারদা ছিলেন নিষ্কম্প দীপ শিখা। তাঁর অন্তরের আগ্নেয় গহ্বরে লুকিয়ে ছিল ভালবাসার প্রস্রবণ। ভগবান এই আগ্নেয় পর্বতের মধ্যেও ভালবাসা ঢেলে দিয়ে এই হৃদয় গড়েছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় সাধনায় ব্রতী বিপ্লবীরা অনশনে তিল তিল করে তাদের জীবনীশক্তি ক্ষয় করে চলেছেন। দুর্দমনীয় বুভুক্ষায় দু-একদিনের মধ্যেই তাদের স্বপ্নভরা চোখগুলি চিরকালের মত নিমীলিত হয়ে যাবে। কি করে এই সমস্যার সমাধান করবেন মাস্টারদা, কার উপর নির্ভর করবেন?

"কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো"

মাস্টারদার সঙ্গে এত গভীর, নিবিড় আর নিরালা আলোচনায় নিমগ্ন? কি তার পরিচয়? কি তার অবদান? কে এই অম্বিকা চক্রবর্তী? অতি

সাধারণ চেহারা অথচ অতি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কে এই নরসিংহ পুরুষ যার চোখ, মুখ সর্ব শরীর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে বুদ্ধি আর অসীম সাহসের দ্যুতি ? ইনি, সেই অম্বিকা চক্রবর্তী, যিনি চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা ও স্বনামধন্য বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর মন্ত্রশিষ্য। অম্বিকাদা চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিপ্লবের দীপশিখা জেলেছেন চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে। তার নেতৃত্বে আর নৈপুণ্যে ধ্বংস হয়েছিল টেলিগ্রাফ আর টেলিফোন ভবন। সে ছিল এক অভূতপূর্ব সাফল্যের নিদর্শন। এত বড় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করা হয়েছিল বিনা রক্তপাতে, একটিও গুলি খরচ না করে, একটিও বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে—শুধু শাণিত বুদ্ধি আর প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের সমন্বয়ে। আচমকা আক্রমণে প্রতিপক্ষ ভাল করে কিছু বুঝে উঠবার আগেই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন অতি নিপুণ হাতে। তার ভয়াবহ অঙ্গ সঞ্চালন আর ক্রুদ্ধ কঠোর নির্দেশে ভীত আতঙ্কিত হয়ে প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিল টেলিফোন ভবনের রক্ষীরা আর কর্মীরা। সেই মূর্তিমান কালভৈরবের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেনি।

তিনি সে যুগের বহু লোককে শোষণ ও শৃংখল ভাঙ্গবার ব্রত নিতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, চট্টগ্রামে প্রথমাবস্থায় তিনিই বিপ্লবের বীজ বুনেছিলেন। আর বাঙ্গলার বিপ্লবী দলের সঙ্গে বিশেষ করে যুগান্তর দলের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা ছিলেন। সেই সুবাদে সুখেন্দু দত্তের মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসে শব সাধনা করেছিলেন। সুখেন্দু দত্ত ছিলেন চট্টগ্রামের এক বিশ্বস্ত বিপ্লবী বন্ধু। দলাদলির রাজনীতির সংঘর্ষে আহত হয়ে চিকিৎসার্থে প্রেরিত হয়েছিলেন কলিকাতায়। চিকিৎসিত হচ্ছিলেন বেল-গাছিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ছিলেন হাসপাতালের কেবিনে। মৃত্যুপথযাত্রী সুখেন্দুকে দেখতে আসতেন অনেকে। আসতেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, আসতেন অনুকূলচন্দ্র মুখার্জী, ভূপেনচন্দ্র দত্ত, ভূপতি মজুমদার, জ্যোতিষ ঘোষ, পূর্ণ দাশ। আর দুবেলাই আসতেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু (তখন তিনি নেতাজী হন নি)। অম্বিকা চক্রবর্তীর মাথা খুলে গেল। তিনি দেখলেন একেবারে ফাঁকা মাঠ। এ-যে সোনায় সোহাগা। বাংলার বাঘা বাঘা মাথা সব এখানে আসছেন, অথচ এ নিয়ে পুলিশের একটুও মাথাব্যথা নেই। সরকারের চোখে ধুলো দেওয়ার এই তো সুবর্ণ সুযোগ। সুযোগ বার বার

আসে না, সুযোগ হেলায় হারানো মূর্খতা। সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই সাফল্যের চাবিকাঠি। তখন ১৯২৯ সাল।

অম্বিকাদা দফায় দফায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ব্রতী হলেন। অতীতের ভুলত্রুটি হতে শিক্ষা গ্রহণ বিপ্লবের ধর্ম। তিনি ক্ষুরধার বুদ্ধির সাহায্যে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সংগঠিতভাবে সম্মিলিত প্রয়াস চালাবার প্রস্তাব করলেন। বর্তমানের দোষ ত্রুটির কারণগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন চট্টগ্রামের আগ্রহশীল মনোভাবের কথা। কিন্তু বর্ষীয়ান নেতাগণ তরুণ নেতার আবেদনে হয়ত পূর্ণ মনোযোগ দেন নি, হয়ত সঠিকভাবে তাকে বুঝতে পারেন নি। স্রোতের বিরুদ্ধে তাঁর একক সংগ্রাম ছিল অচিন্তনীয়। ভারতের দুর্ভাগ্য—তাই নেতারা একমত হতে পারেন নি। তবে তিনি সংকটে সংকল্পচ্যুত হবার বা আদর্শ হতে দূরে সরে দাঁড়াবার মত লোক ছিলেন না। তাঁর মতো বিপ্লবী বাংলায় খুব বেশী জন্মায় নি।

আরেক দিনের ঘটনা—১৯২৩ সনে নাগড়খানা পাহাড়ে পুলিশের সংগে সংঘর্ষ বাধল। গোলাগুলি চললো দু'দিক থেকেই রক্তপাতও হলো। গুলির আঘাতে আহত হলো অনেকেই। সেই সংগ্রাম মুখোমুখি চলা কালেই হাতেনাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন অম্বিকা চক্রবর্তী। বন্দী অম্বিকা চক্রবর্তী আইনের ফাঁকে পুলিশের সমস্ত জারিজুরি নস্যাৎ করে নির্দোষ প্রমাণিত হলেন।

সরকারের এ ধরনের বজ্রআঁটুনি ফস্কাগেরোতে পরিণত করে পুলিশের ভরাডুবি করে তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন, একবার নয়, অনেকবার।

নানা আঘাতে জর্জরিত নানা দুঃখের দহনে পোড় খাওয়া এই রহস্যময় পুরুষটি ছিলেন উদ্যত খড়্গের মত দুর্বার। তীক্ষ্ন বুদ্ধি আর জাগ্রত বিচার শক্তি অম্বিকাদাকে সর্বজনমান্য নেতৃত্বে ভূষিত করেছিল। এই নেতৃত্ব-সত্তা, তার দায়িত্ব সচেতন মনকে কর্তব্যের আহ্বানে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল। প্রতিদিনের প্রতিকূল পরিস্থিতি তার বিরাগী মনের গভীর পর্যন্ত আলোড়িত করেছিল। এক দুর্জয় সাহসে সকলের দুঃখের বোঝা একা বইতে তিনি এগিয়ে এলেন। দুই দুরতিক্রমণীয় সংকট—নিরাপত্তার অভাব আর বুভুক্ষা দমন-করার উপায় বার করার প্রয়াসে ব্রতী হলেন।

অপরে যেখানে ছিলেন অপারগ অকৃতকার্য ও অসম্পূর্ণ, তিনি ছিলেন সেখানে সার্থক, সাবলীল আর স্বয়ংসিদ্ধ। তাঁর পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই ছিল অপরের চেয়ে বেশী সচেতন, বেশী সতর্ক। সদা জাগ্রত দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ন। শ্রুতি ছিল প্রখর। জীবনে কখনও বিফলতাকে তিনি চিনতেন না, যে পণ করতেন প্রাণপণে তা রক্ষা করতেন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে আজকের ঘটনা ছিল পূর্ব অনুষ্ঠিত কর্মের পুনরাবৃত্তি।

আজ হতে ঠিক সাত বৎসর আগে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই অম্বিকা চক্রবর্তী এই নাগরখানা পাহাড়ে ব্রিটিশ পুলিশের তাড়া খেয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। আবার আজ সাত বৎসর পরে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সেই নাগরখানা পাহাড়ে অম্বিকা চক্রবর্তী আশ্রয় নিয়েছেন ব্রিটিশ শোষণ থেকে ভারতকে মুক্ত করতে।

ইতিহাসের বিচিত্র পুনরাবৃত্তি। সেদিনও তাদের খাদ্য ছিল না, আজও নেই। নিরাপদ আশ্রয় আর খাদ্যের সমস্যা সমাধানের জন্য এই অভিজ্ঞ রাজনৈতিক সন্ন্যাসী আজ আকাশ-পাতাল চিন্তা করে চলেছেন।

উপোস করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না, আবার এত লোকের খাদ্য বয়ে আনতে লোক জানাজানির আশঙ্কা ও সংশয়। উভয় সমস্যা।

তবে তাঁর মনে দৃঢ় সংকল্প—মাথা উঁচু করে বাঁচতে হলে, শক্ত যা তাই সাধতে হবে। দুরূহ কাজেই নিজের কঠিন পরিচয় দিতে হবে। হঠাৎ সমাধানের ক্ষীণ আলো তাঁর মনের দিগন্তে উঁকি দিল। চট্টগ্রাম এখন বিপ্লব প্রেরণায় জ্বলছে। বিপ্লবীদের সাফল্যে জনমানসে জেগেছে অভূতপূর্ব সাড়া। স্বদেশ প্রেমের এই উচ্ছ্বসিত আবেগকে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু নির্বিচারে নয়। মানুষ নামধারী অগণিত জনসমুদ্র থেকে প্রকৃত মানুষকে চিনে নিতে হবে। বেরিয়ে পড়লেন অম্বিকা চক্রবর্তী। অভুক্ত বিপ্লবীদের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন খাদ্য। ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত বিপ্লবীদের নিকট এই ক্ষুধার জ্বালা আর শারীরিক কষ্ট আকস্মিক নয়, অভাবনীয়ও ছিল না। জেনেশুনেই তাঁরা এ পথে পা ফেলেছেন। সমুদ্রে যাদের শয্যা, শিশিরে তাদের কিসের ভয়?

বুভুক্ষা-বেদনার চিহ্ন তাদের চোখে মুখে, সর্ব শরীরে ফুটে উঠেছে। দৈন্য জীর্ণ শীর্ণ, মলিন শরীর। কিন্তু তা বলে তাদের মনে শূন্যতার, ব্যর্থতার আর হতাশার লেশমাত্রও ছিল না। মানসিক শক্তির প্রাচুর্যে মন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মণ্ডলাকারে বসে গল্প আর আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন। তাদের আলোচনার বিষয় ছিল

রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন সভ্যতা। শুধু প্রহরীরা ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিলেন। সেদিন ছিল ২০ এপ্রিল।

"চলো সমরে দিব জীবন ঢালি"

বিপ্লবী তরুণদের মনের গহনে যে ভাবনা নিদ্রিত ছিল, বালকসুলভ কল্পনাকে আশ্রয় করে রঙ্গীন হয়ে তাই প্রকাশ পেল। প্রথমে মুখ খুললো মুখচোরা অর্ধেন্দু দস্তিদার। অর্ধেন্দু ছিল স্থানীয় কলেজের বিজ্ঞানের ছাত্র। বিনয়-নম্র, কঠোর পরিশ্রমী ও কঠিন শৃংখলাপরায়ণ। দলে নেতাদের ঠিক নিচেই ছিল তার স্থান। দলের জন্য কোন দুঃখই তার কাছে দুঃখ ছিল না। কোন বাধাই ছিল না বাধা। যত বড় বিপদই হোক ঝাঁপিয়ে পড়তে ইতস্ততঃ করত না। দুঃখ কষ্টকে সইতে এবং দুর্যোগ বইতে যেমন তাঁর জুড়ি ছিল না, ভয় ও শঙ্কাকে পরিহাস করতেও সাহসের অভাব ছিল না। তাঁর চিত্তের প্রসার ও নিরহংকারিতা অন্যের মনকে সহজেই প্রভাবিত করতো।

অর্ধেন্দুর এটা ছিল মৃত্যুপথের দ্বিতীয় যাত্রা। এর আগে বোমা তৈরি করার সময় বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলেন। পটাসিয়াম ক্লোরেট্‌সের সঙ্গে পিউরিক মিশাতে গিয়ে এক ভয়ানক বিধ্বংসী বিস্ফোরণে তার সর্ব শরীর অবিশ্বাস্যভাবে জ্বলে যায়। শরীরের মাংস খণ্ড খণ্ড হয়ে ঝরে পড়েছিল। স্থানে স্থানে শরীরের হাড় দেখা যাচ্ছিল। ভয়ংকর, ভয়াবহ তার দর্শন। সেই ঝলসে যাওয়া চেহারার বীভৎসতা ছিল বিভীষিকাময়। কিন্তু অর্ধেন্দু দুর্ঘট-নার রটনা গোপন রাখতে এই দুঃসহ যন্ত্রণাকে শুধু ছোট্ট দু'চারটা 'আহা' 'উহুর' মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সমস্ত কষ্টকে হজম করেছিলেন।

কত বড় আত্মচিত্ত-জয়ীর পক্ষে তা সম্ভব তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। তারপর অতি সাধারণ চিকিৎসায় আর অসাধারণ মনোবলের সাহায্যে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন অতি অল্পদিনের মধ্যে।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসতে না আসতেই আবার অর্ধেন্দু মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তখনও ক্ষতচিহ্ন সর্ব শরীরে পরিস্ফুট। স্থানে স্থানে শরীরের চামড়া কুঞ্চিত। নাভির ঘা এখনও শুকায়নি। বিকৃত দর্শন; কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে ছিল ভরপুর। জন্মক্ষণ থেকেই যেন তার জীবন ছিল জাতির জন্য উৎসর্গীকৃত।

অর্ধেন্দুর মা ছিলেন রাজপুত রমণীর মতো— একদিকে অফুরন্ত মাতৃস্নেহ, অপরদিকে শাসনের দন্ড। এমন মহিয়সী মায়ের পক্ষেই এমন ছেলের জন্ম দেওয়া সম্ভব। অর্ধেন্দুর কাছে তার গর্ভধারিণী মাতা, স্বদেশ মাতা আর জগম্মাতা একাকার হয়ে গিয়েছিলেন।

অম্বিকাদার সংগৃহীত সংবাদে সকলেই জেনে গিয়েছিলেন যে চট্টগ্রাম এখন ব্রিটিশ কবলমুক্ত। মুক্ত চট্টগ্রামের কোর্ট-কাচারী বন্ধ। অফিস আদালতের দরজায় তালা। ব্রিটিশ হুকুমনামা চট্টগ্রামে আর জারি হয় না। শাসনযন্ত্র স্তব্ধ। কিন্তু সাপ মরলেও তার লেজ নড়ছিল। তখনও ইম্পিরিয়েল ব্যাংক ও জেলখানাতে ব্রিটিশ শাসনের স্তিমিত শিখা টিম টিম করছিল।

অর্ধেন্দুর যুক্তি—"যতক্ষণ জীবন আছে লড়ে যাও"। তার প্রস্তাব—"আর একটুও অপেক্ষা নয়, এক্ষুণি আক্রমণ চালাও।" মুখচোরা অর্ধেন্দু মুখর হয়ে উঠলেন। আবেগময় কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন—"অপেক্ষা করে শুধু শুধু শক্তির ও সময়ের অপচয় হচ্ছে, আর শত্রুকে সুযোগ দেওয়া ছাড়া কোনও লাভ হচ্ছে না।" তার মতে কারাগারগুলি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের একটা পেষণ যন্ত্র।

এই কারাগারের অন্তরালে কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রমোদের মত বীরেরা ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণদান করেছেন। এই বন্দীশালায় লক্ষ মায়ের বক্ষ রিক্ত করে দেশভক্ত সন্তানদের আটকে রাখা হয়েছে। নৃশংস বুটের লাথিতে কত বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

তাই তার পরামর্শ হল—সুযোগের অপেক্ষায় কাল ক্ষয় না করে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সেই জন্যই স্বাধীন চট্টগ্রামের বক্ষ থেকে সংশয় ও শঙ্কার প্রতীক জেলা-জেলখানার কালো চিহ্নটি মুছে দিতে হবে। পদে পদে নিষেধের শৃংখলে নিয়ন্ত্রিত বন্দীদের মুক্ত করে তাদের হতাশায় পীড়িত ব্যর্থ জীবনে আশার আলো জেবলে দিতে চাই।

অর্ধেন্দু বললেন, তিনি এই প্রস্তাব মাষ্টারদার কাছে পেশ করবেন। অর্ধেন্দুর ভাবোদ্দীপক বক্তৃতায় সকলেরই মন চনমন করে উঠলো।

"আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরী"

পুলিন ঘোষ এক বিরাট গাছের নিচে বসে অর্ধেন্দুর মন্তব্য শুনে শুনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। পুলিন ঘোষ কাজ-পাগল ব্যস্ত সমস্ত মানুষ।

কাজ না পেলে তিনি নির্জীব হয়ে যান। ছোট্ট একটি সাইকেল নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ান। গুরুত্বপূর্ণ খবর আদান প্রদান করেন। সূর্য সেনের সংবাদ অনন্ত সিংহকে পেশীছান। অনন্ত সিংহের নির্দেশ লোকনাথ বলের কানে তোলেন। চট্টগ্রামের বিরাট পুলিশবাহিনী ছোট্ট পুলিনকে চোখে চোখে রাখতে হিমশিম খায়। পুলিশ ওর জন্য পথে ওৎ পেতে ব্যর্থ হয়। পুলিন বাতাসে টিকটিকির গন্ধ পান।

প্রবাদ পুরুষ পুলিন ঘোষকে এই দেখা গেল—তিনি সাম্পান চড়ে চলেছেন। (সাম্পান নৌকা বিশেষ) উদ্দেশ্য রহস্যাবৃত। বিট্রিশ গুপ্তচর পেছনে পেছনে চলেছে পুলিনকে অনুসরণ করে। নৌকা এসে যখন পাড়ে ভিড়লো তখন দেখা গেল পাখী উড়ে গেছে। ছদ্মবেশী গোয়েন্দা বিস্ময়ে হতভম্ভ ; চোখে ধুলো দিয়ে পুলিন কখন পালাল সেই রহস্যের আর কিনারা হলো না। গোয়েন্দার গন্ধ পেয়েই দক্ষ সাঁতারু পুলিন সকলের অজ্ঞান্তে টুক করে ডুব দিয়ে খানিক পরে ওপারে পেশীছে নিজের কাজে চলে যায়।

ভগবান তার শিরায় শিরায় বুদ্ধি ঢেলে দিয়েছিলেন, বন্দুক পিস্তলে তাঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য। রাজদ্বারে গুপ্ত ফাইলে তাঁর পরিচয় রাজদ্রোহী। রাজদ্রোহী পুলিন ঘোষ তাঁর বক্তব্য সকলের সামনে পেশ করলেন—তিনি অন্যায়কে অন্যায় আর অত্যাচারকে অত্যাচার বলেই প্রতিবাদ করতে অনুরোধ করলেন। তাঁর সুমিষ্ট কন্ঠ সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

ইম্পিরিয়েল ব্যাংকের শোষণ তার মনোকষ্টের কারণ। তার অভিযোগ—বঞ্চিতের ঘামের বিনিময়ে অর্জিত যে সম্পদ তাই সঞ্চিত হয় এই ইম্পিরিয়েল ব্যাংকে। ইংরেজ সরকার চালিত এই ব্যাংক। অবৈধ উপায়ে সংগৃহীত এই অর্থ আমরা অধিকার করে এই যখের ধন বিলিয়ে দেবো আর্ত, আহত, নিরন্ন, ক্ষুধিত, পীড়িত, অনাথ আতুরের মধ্যে। সশস্ত্র বিপ্লবের হাত ধরে চলবে দুর্গত মানুষের সেবা।

তার মনঃপীড়া ঃ ভারতের ছয় লক্ষ গ্রামের ত্রিশ কোটি গ্রামবাসীর তিন চতুর্থাংশ অনশনে বা অর্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে। দেশবাসীর রক্ত শোষণ করে যে টাকার পাহাড় ইম্পিরিয়েল ব্যাংকে জমা হচ্ছে তার এক কানা কড়িও দুর্গত দেশবাসীর সেবায় লাগছে না। দেশের সম্পদ লুটে নিয়ে সস্তা বিলাতি জিনিসে বাজার ভরে দিয়ে বিট্রিশরা আমাদের দেশের কুটীরশিল্পগুলিকে চুরমার করে দিচ্ছে। চর্মকার, কর্মকার, কাঁসারী, তাঁতী—এরা যারা পূর্বে

স্বাচ্ছন্দের মধ্যে জীবনযাপন করতেন, তারা আজ দারিদ্র্যের চরম সীমায় এসে পেঁছেছেন। একের পর এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে দেশের মানুষগুলি আজ রোগজর্জর অস্থিসার কংকালে পরিণত হয়েছে। দুর্ভিক্ষে ভারতের বুক থেকে ৫০ বা ৬০ লক্ষ মানুষ অনাহারে প্রাণ হারায়। দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে।

৭৬ সালের মন্বন্তরে মানুষের মাংসে শেয়াল কুকুরেরও অরুচি ধরেছিল। ১৮৭৬ সনের মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে মানুষ বনের ঘাস, কচু, গাছের লতাপাতা খেয়েও বাঁচতে পারেনি।

তাই তাঁর ইচ্ছা, গঙ্গাজল দিয়েই গঙ্গাপূজা হবে। ঘাম রক্ত ঝরা শ্রমে উপার্জিত অর্থ শ্রমের মালিক শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যেই বিলিয়ে দিতে হবে, জনসাধারণের অর্থে জনতার সেবা হবে। ত্রিশ কোটি গ্রামীণ গরীবের মুখে হাসি ফুটবে।

এপ্রিলের শেষ বেলা। বাতাসে আগুন ঝরছে। এমন সময় বিপ্লবীদের দাব-দাহ দূর করতে এগিয়ে এলেন নরেশ রায়। তিনি সাথীদের মনকে কথার প্রলেপে শীতল করতে প্রয়াসী হলেন।

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার রায়পাড়া গ্রামের গিরিশচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ ছেলে ছিলেন নরেশচন্দ্র রায়। নরেশ রায়ের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় নিজ গ্রামের মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ে মেধাবী বলে তার সুনাম ছিল। পরে ময়মনসিংহ শহরে এডওয়ার্ড উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি অধ্যয়নের সঙ্গে খেলাধুলায় পারদর্শিতা দেখান। স্কুলে অধ্যাপকের নিবট অধ্যয়ন করতেন সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল আর গেম শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করতেন মুষ্টিযুদ্ধ (Boxing)। অল্পদিনের মধ্যেই নরেশ রায় জেলার শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার সম্মান লাভ করেন। এডওয়ার্ড স্কুল হতে সসম্মানে ম্যাট্রিক পাশ করে চলে যান চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামে মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন। মেডিকেল স্কুলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিপ্লবী গণেশ ঘোষের ভ্রাতা কার্তিক ঘোষ তার সহপাঠী ছিলেন। কার্তিক ঘোষ নরেশ রায়কে অনন্ত সিংহের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

চট্টগ্রামে এসেই এইভাবে নরেশের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। অনন্ত সিংহের সঙ্গ পেলেন। অবরুদ্ধ গোমুখী থেকে তার জীবনগঙ্গা ছাড়া পেল।

বিবেক যন্ত্রণার মুক্তি হলো। অনন্ত সিংহ তখন চট্টগ্রামকে আলোড়িত করছেন। তার উৎসাহ বাণী চতুস্পার্শ্বকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য তাঁর ডাক যুবকদের অন্তরে সাড়া তুলেছে। তাঁর উদাত্ত আকুল আহ্বান ঃ "কে দিবি ধন, কে দিবি প্রাণ, তোরা আয়। দুর্গম পথের যাত্রী হতে চাও, চলে এসো, পেছন ফিরে তাকিও না।"

স্বাধীনতার জন্য অনন্ত সিংহের আকুলতা নরেশ রায়কেও ব্যাকুল করল। তিনিও বিপদসংকুল পথে পা বাড়ালেন। নিজের দেশকে, বাংলা তথা ভারতবর্ষকে ভালবাসলেন। সাত কোটি ভাইবোনদের হিতাহিতের বোঝা মাথায় নিলেন। তাদের দেশ-প্রেম, তাদের ভীরুতা, তাদের কাপুরুষতাকে আপন করলেন।

এখন অনন্ত সিংহ নরেশ রায়ের সবচেয়ে আপন লোক, সব চেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র। অনন্ত সিংহের কাছ থেকে নরেশ রায় এমন একটি কঠিন কাজের দায়িত্ব নিলেন, যা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি চাতুরি সাপেক্ষ।

সরকার বিপ্লবীদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে সর্বক্ষণের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন কিন্তু বিপ্লবীদের তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিল। তাদের গুপ্তধন, (বোমা পিস্তল) গুপ্ত স্থান আর সিক্রেট বাহিনীও প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিল। এই অস্বস্তি ত্রাণে এগিয়ে এলেন নরেশ রায়। গুপ্তচরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে নিয়োজিত হলেন তিনি। নরেশ রায় শত্রুর সঙ্গে কপট মিত্রতা করে পুলিশের নাড়ীর খবর টেনে বার করতে লাগলেন। সেই সূত্র ধরে পুলিশ-এক্‌শানের পূর্বেই যথাযথ ব্যবস্থা করে বিপ্লবীরা পুলিশকে ধাঁধায় ফেলতেন।

এরই ফলশ্রুতি—গোয়েন্দা কর্তা শচীন ভৌমিক বলেছিলেন—"আমরা চট্টগ্রামের আকাশে বাতাসে বোমার গন্ধ পাই, কিন্তু সন্ত্রাসবাদিগণ কোন অতলে তা রাখে সে হদিস আমরা পাই না"।

অনন্ত সিংহ সমস্ত ভারত রাষ্ট্রের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা দূর করতে চিন্তা করেন, ভারতের স্বাধীনতা ও প্রগতির আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তার আদেশ মাথা পেতে নিতে যত বিপত্তি আসুক, নরেশ পেছ-পা নয়। তাই নরেশ বিপ্লবীদলের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সেই বড়লোকের ছেলে নরেশ রায় আজ ধরণীর ধূলায় লুণ্ঠিত, ক্ষুৎ পিপাসায় ক্লিষ্ট, কিন্তু মনে তার দুঃখ নাই। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তার চোখে মুখে প্রকাশিত। এই তো গৌরব।

সহজ মানুষের সহজ হিসাবের সঙ্গে এখানেই তার গরমিল।

আশপাশ হতে দু'চার জনকে নরেশ ডেকে আনলেন। দৃঢ়তার সংগে বলতে লাগলেন—১৮ই এপ্রিলের প্রতিজ্ঞা আবার আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ১৮ই এপ্রিল আমরা আমাদের জাতীয় ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছিলাম। সেই উড্ডীন ঝাণ্ডাকে উঁচু রাখতে আমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। এখন সেই লক্ষ্যকে পূর্ণতা দিতে আমার প্রস্তাব—ব্রিটিশ রাজ প্রশাসন যে ফেয়ারী হিলের বিল্ডিং থেকে চট্টগ্রাম জেলাবাসীর দণ্ডমুণ্ডের আদেশ জারী করে থাকেন, সেই বিচার-শালার শীর্ষে আমরা আমাদের জাতীয় মর্যাদার প্রতীক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করব। আর তা সযত্নে রক্ষা করব। তাতে রক্ত গংগা বয়ে যায়, যাবে। মৃত্যুর পাহাড় জমে উঠে তো উঠবে। আদর্শের সংগে কিছুতেই রফা হবে না। নির্মম আঘাতে অপশাসনকে অপসারণ করব।

এই সমস্তই ছিল ব্যক্তি বিশেষের ভাবাবেগ। যেহেতু এতে মাষ্টারদার সমর্থন ছিল না, এর গুরুত্ব কিছুই ছিল না। তবে ঐগুলি এই ইংগিত বহন করে যে, বিভিন্ন বক্তার ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য থাকলেও অন্তর্গূঢ় উদ্দেশ্য সকলের এক ও অভিন্ন—"বীরের সংগতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই"। বাঘা যতীনের মতো লড়তে লড়তে যেন মরতে পারি।

"বুটেন স্বভাবে শেষে কালী দিল বঙ্গে এসে"

নির্মলদা একটি ভূপতিত বৃক্ষের কাণ্ডের ওপর বসে এবং আকাশে শির তুলে এক পায়ে দণ্ডায়মান। আর এক বৃক্ষের গোড়ায় পিঠ হেলান দিয়ে নিকটস্থ সকলকে ডেকে তার চার পাশে বসিয়েছেন। যেন তিনি বিশেষ রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে, বিশেষ রহস্য ভেদে নিযুক্ত। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর সারা বনভূমিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই মিঠে সুরের আকর্ষণে দূরে যাঁরা ছিলেন, কাছে এসে বসলেন, কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও ঘনিষ্ঠ হলেন।

উৎকণ্ঠায় সকলে সারারাত পথ চলেছেন। এখন ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন, তবুও নির্মলদার বাণী শুনতে সকলেই ব্যগ্র। নির্মলদা শ্লেষ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—সকল মানুষ সমান, সকলের শরীরে লাল রক্ত প্রবাহিত। তবুও আমাদের দেশে শোষক আর শোষিতের মধ্যে কত বিচিত্র বৈষম্য। সাদার কালোর প্রতি কি অমানুষিক ঘৃণা। ভারতীয়রা যেন মানুষই নয়।

বর্তমান ইংরেজ জাতির পূর্বপুরুষেরা যখন গভীর জঙ্গলে অসভ্য বর্বর জীবন যাপন করতো সেই অন্ধকার যুগে তোমাদের এই ভারতের ছায়া সুশীতল তপোবনে, শান্ত ঋষি আবাসে ঋগ্বেদ গীত হয়েছিল, গীত হয়েছিল সাম গান। লিখিত হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম তত্ত্ব চিন্তা—কপিলের সাংখ্য দর্শন। গার্গী আর গায়ত্রীর মতো বিদুষী নারী, বেদব্যাস আর বশিষ্ঠের মতো ত্রিকালজ্ঞ মহা পণ্ডিত তোমাদের পূর্বজ। প্রজ্ঞাবান ঋষিরক্ত আমাদের শরীরের ধমনীতে প্রবাহিত। এই তোমাদের চিত্তোৎকর্ষ ভারতবর্ষ, জ্ঞানের ভারতবর্ষ, মানের ভারতবর্ষ, গৌরবে পৃথিবীর গুরু। এই বৃহৎ সভ্যতা, মহান কৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ ধর্মকে কোন অপশক্তি গলা টিপে মারতে পারে না। কুটিল ইংরেজের দৌরাত্ম্য আমাদের সহস্র বর্ষার্জিত শিক্ষা সংস্কৃতির গৌরবকে ধ্বংস করতে উদ্যত।

নির্মল সেনের বাক্য রুদ্ধ নিশ্বাসে সকলেই শুনছিলেন। কৃষ্ণ চৌধুরী সবার পেছনে এক কোণে বসেছিলেন। নির্মলদা নীরব হতে না হতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বিবেকানন্দের ভঙ্গীতে বুকের উপর আড়াআড়ি হাত আরোপ করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—"পরাধীন দেশের মূল দাবী স্বাধীনতা। আমরা বিপ্লবী, ব্রিটিশকে ভীত সন্ত্রস্ত করে আমাদের স্বদেশ জননীকে আবার আমরা সোনার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবো"।

এই নির্মল কুমার সেন ছিলেন বিপ্লবীদের প্রথম সারির নেতা। জীবনের বহুকাল কারার অন্তরালে, বন্দী শিবিরে অন্তরীণে ঝানু রাজবন্দীদের সঙ্গে রয়েছেন। বিভিন্ন দেশের বিপ্লব ইতিহাস তাঁর জানা—সমর বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ।

যে নির্মলদার মধুর স্বভাবের স্পর্শ পেয়েছে, সেই তাঁর স্নেহের আবেষ্টনীতে আটক হয়েছে। তাঁর ঐন্দ্রজালিক মধুর চরিত্র দূরকে নিকটে আনতো। পরকে আপন করতো, অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

এই নির্মলদা ২০শে এপ্রিল সকাল বেলা আবেগময় কণ্ঠে বললেন—"ভয় আমাদের আছে, তবে সে ভয় ব্রিটিশের ভয় নয়, তার সৈন্য বাহিনীরও নয়। সে ভয় আমার আপন ভাইদের ভয়, ঘর-শত্রু বিভীষণের ভয়। ঘরের ঢেঁকি কুমীর হওয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের এক অমার্জনীয় দুর্বলতা। এটা বাঙ্গালী চরিত্রের কলঙ্ক। বাঙ্গালীর এই গর্হিত চরিত্রের চোরাপথে চতুর ইংরেজ বাংলার তক্ত কেড়ে নেয়। এই কলঙ্কের বোঝাই আমরা এখনও মাথায়

বয়ে চলেছি। তা না হলে, দেশটা হয়তো পরের পদানত হত না। বিপ্লবের দরকারও হত না।

ইংরেজের এদেশে প্রবেশ—এক দুঃখের কাহিনী, বেদনাজনক ঘটনা। পলাশীর প্রান্তরে ১৮৫৭ সালে দেশী বিশ্বাসঘাতকদের যোগসাজসে পাঁচ হাজার ইংরেজ সেনার হাতে পর্যুদস্ত হলো পঞ্চাশ সহস্রাধিক বাঙ্গালী সেনা। সংগে সংগে বাঙ্গলার স্বাধীনতা সূর্য চিরতরে অস্ত গেল।

সারা ভারত বিস্ময়ে বিহ্বল হলো—এত বড় অতি গর্হিত কাজ ঘটল কি করে? এরকম ন্যক্কারজনক প্রমাদ ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় আর একটিও খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই বলছি, কূট বুদ্ধিতে ইংরেজের জুড়ি পাওয়া ভার। তারপর সেই কূট যূপকাষ্ঠে ভারতের নবাবগণ একের পর এক বলি হতে লাগলেন। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে সে যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হলো। তাঁর সিংহাসন ও রাজ্যপাট কেড়ে নিয়ে তাঁকে নির্বাসিত করা হলো কলিকাতার মেটিয়াবুরুজে। তখন লর্ড ডালহৌসীর শাসণ কাল। ওয়াজিদ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে বন্দীর বেদনায় জীবন্মৃত। কাগজ কলমে সম্ভাষণে তখনও তিনি নবাব। এতবড় বীভৎস কুৎসিত ব্যঙ্গ, চরিত্রহীন চরিত্র ইংরেজ চরিত্র ছাড়া কোথাও সম্ভব নয়।

শক্তির মদে স্ফীত ইংরেজ অভ্রংলিহ স্পর্ধায় শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ ও তার বংশধরদের সঙ্গে যে নিষ্ঠুরাচরণ করেছিল তাও পৈশাচিকতায় তুলনা হীন। সেই বর্বরতার ও হিংস্রতার স্মৃতি, সেই দুস্বপ্ন আজও ভারত-বাসীকে ব্যথিত করে, ক্ষুব্ধ করে।"

আবেগ কম্পিত কণ্ঠে নির্মলদা বলতে লাগলেন—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর হড্‌সন সাহেব বাহাদুর শাহকে বন্দী করেন। তারপর বিচার করে তাঁকে নির্বাসিত করা হলো বার্মায়। শুধু তাই নয়, সম্রাটের বংশধরদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে এসে হড্‌সন এবাস্তে দিল্লীর রাজপথে তাদের গুলি করে হত্যা করে।

বর্বরতার অবসান এখানেও হল না। মৃত্যুর পর কবর না দিয়ে তাদের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহগুলি দিল্লীর জনবহুল চাঁদনী চকের প্রকাশ্য উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী রূপে টাঙ্গিয়ে রাখা হলো, তিন দিন তিন রাত্রি। ভারতের শেষ মোগল সম্রাটের বংশধরদের সেই বিকৃত, মৃতদেহগুলো দেখে পথচারীরা

ভয়ে শিউরে উঠলো, বার বার মার্জনা করলো তাদের অশ্রুসিক্ত চোখ। বলতে বলতে নির্মলদার মুখে মর্মান্তিক বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠলো।

"ব্রিটিশের যেমন পীড়ন তেমনি তাদের শোষণ ছিল দেশবাসীর আর্থিক পতনের কারণ। লন্ডনের ফকির ভারতে ফিকিরে এদেশকে ফতুর করে যখন স্বদেশে ফিরতেন, সংগে থাকতো কুবের ভান্ডার। ১৭ বৎসর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণীর পদে বাহাল হয়ে রবার্ট ক্লাইভ ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেন। তখন তাঁর মাস মাহিনা ছিল মাত্র সাত টাকা। এই সাত টাকায় সাহেবের খানা পিনা খরচ, পোশাক পরিচ্ছদের ব্যয়, থাকার ব্যবস্থা ও সাহেবীপনা সব সারতে হতো। জীবনযাত্রা কত উচ্চ মানের ছিল তা সহজে অনুমেয়।

এই দুস্থ, দরিদ্র সাত টাকার কেরাণীটি যখন লর্ড ক্লাইভ নাম নিয়ে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে লন্ডনের পোর্টসমাউথ বন্দরে পদার্পণ করেন তখন তার সংগে জাহাজ ভর্তি অঢেল ধনরত্ন। তাঁর স্ত্রীর গায়ে লক্ষ লক্ষ টাকার জড়োয়া গহনা। তিনি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী রূপে সর্বজন স্বারা স্বীকৃত হয়েছিলেন।

ভারতে অবস্থান কালে তিনি শঠতার স্বারা নিজের জন্য সংগ্রহ করেন কোটি কোটি টাকা, স্ত্রীর জন্য দুষ্প্রাপ্য মহামূল্য হীরা-জহরৎ আর ব্রিটিশ জাতির জন্য জয় করেন কামধেনুরূপ ভারতবর্ষ। কার্ল মার্কস রবার্ট ক্লাইভকে তস্কর চূড়ামণি (Prince of Robbers) বলে মন্তব্য করেন। পুলিস সার্জেন্ট হতে রাজ প্রতিনিধি পর্যন্ত ভারতের সবাই আসতো এই দুগ্ধবতী ধেনুটিকে দোহন করার লালসায়, এই দোহন কাজে সবাইকে পিছনে ফেলে সর্বাগ্রে এগিয়ে যান গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস। হীনতায় তিনি ছিলেন সবার সেরা। নীচতায় লর্ড ক্লাইভকে হার মানায়। ক্রূরতায়, নৃশংসতায়, কূটচক্রান্তে তিনি ছিলেন মানব শরীরে দানবের প্রতিমূর্তি। তাঁর লোলুপ দৃষ্টির লকলকে জিহ্বা আর ষড়যন্ত্রের পাপ হাত প্রসারিত করেছেন অযোধ্যার বেগমদের প্রতি। তখন বেগমেরা হয়ে পড়েছেন ভাগ্যবিড়ম্বিতা ও অনাথিনী। যাঁদের রূপের আগুনে ভারত চমকিত, তাদেরই চোখে নেমে আসে অপমানের বঞ্চনার আর শোকের অনর্গল অশ্রুধারা।

ওয়ারেন হেষ্টিংস এই সব নিরীহ নিরুপায়, নিঃসহায় নির্দোষ বেগমদের

জান, মান, সম্মান, জীবন আর যৌবন ; পান্না, হীরা, মুক্তা জহরৎ, ধন সম্পদ নিয়ে খেলা করতে লাগলেন।

রাজ প্রতিনিধির বিষাক্ত ও করাল থাবার পরিচয় পেয়ে তারা ভয়ে থর্ থর্ কম্পমানা— কিংকর্তব্যবিমূঢ়া, তাদের দু'চোখ ভরা জল।

নির্যাতিত অন্তরের হৃদয়-ভাঙ্গা কান্না যেদিন থামল, সেদিন সীমাহীন প্রবঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতার পদতলে তাদের যা কিছু ছিল সব সমর্পণ করে শুধু তাদের প্রাণ আর নারীর সম্মানটুকু বাঁচাবার প্রার্থনা জানালেন।

ভারতের গভর্নর জেনারেল হেষ্টিংসের চোরের হস্ত এই বেগমদের ধন ন্যূনাধিক দেড় কোটি টাকার হীরা জহরত জড়োয়া অলঙ্কার হাতিয়ে নিলেন। একই উপায়ে, কাশীর নরেশ চৈৎসিংহের নিকট হতে হেষ্টিংস আদায় করেন ৮৫ লক্ষ টাকা।

এড্মন্ড বার্ক নামে এক সংবেদনশীল সদাশয় ইংরেজ দুরাশয় হেষ্টিংসের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য দুষ্কৃতির ধারাবাহিক ফিরিস্তি পেশ করেন বিলাতের বিচার সভায়।

লোভী ব্রিটিশ প্রতিনিধির আচরণের এই ভয়াবহ বিবরণ শুনে শ্রোতাগণ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েন। হেষ্টিংসের অমানুষিকতার গভীরতায় একাধিক ইংরেজ মহিলা পার্লামেণ্ট হলে মূর্চ্ছা যান।

বক্তব্য শেষ করে ব্যথিত নির্মলদা মাটির পুতুলের মতো নিশ্চল বসে রইলেন। একটা অব্যক্ত অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখল। তাঁর বিক্ষুব্ধ মন যেন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

তিনি অনুচ্চ স্বরে মন্তব্য করলেন, এই রকম কুশাসনের যাঁতাকলে ভারতবাসী আজও ক্লিষ্ট হচ্ছে।

"অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ, রণ রঙ্গে রসে হও উন্মাদ"

নির্মলদা যখন এই মর্মান্তিক মর্মস্পর্শী ইতিবৃত্ত বর্ণনা সমাপ্ত করলেন তখন দিবা শেষ প্রায়। প্রকৃতির দান—দিবাকরের শেষ রশ্মি বিশ্বভরে ছড়িয়ে পড়েছে। বিপ্লবীরা মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরব, নিশ্চল। তাদের অন্তর বিষাদে দুলে দুলে উঠছে। তারা ভারত প্রেমিক। ভারতীয় ললনার লাঞ্ছনার লজ্জায় তাদের মাথা নত।

নির্মলদা আবার বলেন—"রক্তের দাগ সহজে মুছে যায় না, বিশেষ করে

ইতিহাসের রক্তের দাগ। তাই বলছি, যদি জন্মেছিস, তবে পৃথিবীর বুকে একটা দাগ রেখে যা।”

ক্রমে ক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে রাত্রি এগিয়ে আসছে। বনভূমি নিঝুম, নিস্তব্ধ, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এই মসীকৃষ্ণ রাত্রিতে অতি সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে পা ফেলে অম্বিকাদা এলেন। তিনি এত সাবধান যে তাঁর পায়ের নিচের শুকনো পাতাটিও যেন শব্দ না করে। সঙ্গে তাঁর কয়েকটি তরমুজ। আজ আর বেশী কিছুই যোগাড় করতে পারেন নি।

অম্বিকাদার আদেশে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। শরীরে যত অবসাদ ছিল মুহূর্তে তার অবসান হল। “তৈরি হও,” বলতেই—বাঁ কাঁধে গুলিভর্তি ঝোলা, ডান হাতে গুলিভর্তি রাইফেল নিয়ে শিরদাঁড়া সটান করে, সৈনিকোচিত দক্ষতায় সকলেই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

নেতার হুকুম তামিল করতে সকলেই সারিবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন। দ্বিতীয় হুকুমে পিঁপড়ের সারির মতো একের পর এক পাহাড় থেকে অবতরণ করতে লাগলেন। আগে আগে চলেছেন অম্বিকাদা। তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন আর সবাই। এত সতর্কতার সঙ্গে যেন জঙ্গলের একটা কীট পতঙ্গও টের না পায়। চলতে চলতে অবশেষে এক সবুজ ঘাসের গালিচায় মোড়া একখন্ড তৃণভূমির উপর এসে সকলেই বসলেন। বসলেন বৃত্তাকারে। যেন চাঁদের হাট বসেছে। এই বৃত্তের আকারে বসতে বিপ্লবীরা পূর্ব থেকেই অভ্যস্ত—এ বিষয়ে ট্রেনিংপ্রাপ্ত। এই প্রক্রিয়ার নাম ছিল—চেয়ার অব নেপোলিয়ান। এই চেয়ারের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল—শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করা। শত্রু যেদিক থেকেই আসুক না কেন, কারও না কারও নজরে পড়বেই।

তবে কি তাঁরা শুধু এই জন্যই ছিলেন অকুতোভয়? না। তাঁরা অনুশীলন করতেন অনেক কলাকৌশল, চর্চা করতেন যুদ্ধ ও আত্মরক্ষার বিভিন্ন ধারা। তারা যেমন দুরারোহ বৃক্ষে আরোহণ করতে জানতেন, তেমনি পারতেন খরস্রোতা বিস্তীর্ণ কর্ণফুলিও সাঁতার দিয়ে পারাপার করতে। পারতেন বঙ্গোপসাগরের পর্বত প্রমাণ ঢেউকে তুচ্ছ করে, ঢেউয়ের চূড়ায় চড়ে সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে, শাম্পান (সমুদ্রগামী নৌকা) চালিয়ে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিতে। যেমন ছিলেন দক্ষ অশ্বারোহী, তেমনি সুদক্ষ সাইকেল চালক। তাঁরা জানতেন সাইকেল আরোহণ আর অবতরণ ভিন্ন পদ্ধতিতে. চালাবার নানা প্রকার প্রক্রিয়া। সূর্যাস্তের পর আর প্রভাতে ফেরারী ছিলের

পাকা রাস্তায় সাইকেল ও অশ্বারোহণ করে পর্বত চূড়ায় উঠবার অসাধারণ কৌশল ও অবরোহণের নিপুণতা সৃষ্টি করত নয়নাভিরাম প্রদর্শনীর।

এই অনন্যসাধারণ দক্ষতা যে কাছে থাকতো তারই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বিস্ফারিত নেত্রে এই ক্রিয়াকৌশলকে উপভোগ করত।

এই প্রতিযোগিতা গোয়েন্দাগুরু শচীন ভৌমিকও প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু নেতাদের পাকা পরিকল্পনাতে যে প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞা ছিল তার বিন্দুবিসর্গও তার মাথায় ঢোকে নি। গুপ্তচরেরা বোকার মতো একথা ভেবে প্রবোধ নিত যে—বোমা নেই, পিস্তল নেই, এখানে আবার বিপ্লব কোথায় ?

এই ক্রীড়ামোদীরা রপ্ত করতেন জাপানী যুযুৎসুর নানা ভঙ্গী ও জটিল প্যাঁচ। শত্রুকে জব্দ করার নানা কৌশল, বাঁশের লাঠি চালনার বিবিধ জ্ঞান। তাদের পাকা বাঁশের লাঠির আঘাতের ঠকাঠক শব্দে নিদ্রিত লোকের ঘুম ভাঙ্গত, দুষ্টের মাথা ফাটত। তারা অসি আর ছোরা চালনায় যেমন অভিজ্ঞ ছিলেন, মোটর ড্রাইভিং ও স্টীম বোট চালাতেও তেমনি ওস্তাদ ছিলেন। ড্রাইভার হেরম্ব বল তো আর বিপ্লবী নয়। তাঁর সংগে বিপ্লবীদের দহরম মহরমে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? তাদের বন্দুক, রিভলবার, পিস্তলের নিশানা ছিল অব্যর্থ। গুলি চালনার প্রাকটিস্ ছিল দিবারাত্রির খেলা। বোমা তৈরিতে, কি কার্তুজ নির্মাণে ছিলেন কুশলী কারিগর। সবার উপরে তাঁরা যে সম্মোহনী বিদ্যা জানতেন তা ছিল—শুধু বিদ্যুৎগতিতে হাত-পা চালনা আর কণ্ঠের সাউটিং দ্বারা শত্রুকে অবিশ্বাস্যভাবে ভয়ে বিহ্বল করা।

এই সমস্ত বিরল গুণের সমন্বয় ঘটেছিল এই সংগঠনের প্রতিটি বিপ্লবী চরিত্রে। তাঁদের শৃঙ্খলাবোধ, আনুগত্য, নীতিবোধ, হৃদয়বত্তার পরিচয় ও সামরিক কলাজ্ঞান জনসাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করেছিল। এই সমস্তই অনুষ্ঠিত হতো গুপ্তচরদের নাকের ডগার উপর তাদের বিভ্রান্ত করেই।

এখন যে ভূমিখণ্ডে তাঁরা সকলে বসেছেন তার প্রায় চারিদিকে খাড়া পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে এক ক্ষীণ জলস্রোত তর তর করে প্রবাহিত হচ্ছে। পাহাড়ের কালো ছায়া রাত্রিকে আরও গাঢ় কাজল কৃষ্ণ রূপ দিয়েছে। অতি নিকটের জিনিসও আবছা দেখাচ্ছে। স্নিগ্ধ বায়ুর স্পর্শে খরদাহে দগ্ধ বিপ্লবীদের শরীরে শান্তির হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

এই যে যুবকের দল, যারা জীবনের সব আশা, সব সুখ, সমস্ত স্বার্থ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে সাংসারিক কামনা-বাসনা ত্যাগ করে যত দুঃখ

পোহাতে হয় পোহাচ্ছে। সমস্ত দেহ জুড়ে তাদের উপবাস আর লাঞ্ছনার চিহ্ন আঁকা। পৃথিবীর মেয়াদ বোধ করি বেশী দিন নেই, সেদিকে এদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের মন বিচরণ করছে আগামী সংগ্রামের গভীরে। দ্রুত ছুটে চলেছেন 'সংকট আবর্ত মাঝে।'

"ডরি না রক্তে ঝরিতে ঝরাতে দৃপ্ত আমরা ভক্ত বীর"

নিয়ম শৃংখলার লৌহমানব মননশীল মানুষ অম্বিকা চক্রবর্তী ছিলেন মুক্তিফৌজের পরিচালক ও পথ-প্রদর্শক। সর্বক্ষণ সর্বদিক তাঁর সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেও স্বাধীন মত প্রকাশের সকলের অধিকার ছিল।

পরিচালক অম্বিকাদা, নির্মল লালাকে আদেশ দিলেন—'নির্মল, তরমুজ-গুলো খন্ড খন্ড কর, টুকরোগুলো ছোটবড় করবে না। যতজন লোক তত-গুলো টুকরো হবে, বেশী চাই না, কমও হবে না" নির্মল জানে অধিনায়কের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। এ যে সামরিক শৃংখলা। এই নিয়মতান্ত্রিক আচরণে ত্রুটি করা হবে না, বিচ্যুতি ঘটবে না, সব কাজ হবে নিয়মমাফিক, নির্ভুল নিঃসংশয়। সময় রক্ষা হবে সেকেন্ড ধরে, কাজ হবে হুবহু হুকুম মত। এই নিয়মের রাজ্যে মামুলী অনিয়মের জন্য লোমহর্ষক লংকাকান্ড বাধতে পারে যে কোন মুহূর্তে।

এই সমস্তই নির্মলের জানা। তিনি অম্বিকাদার আদেশ সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে সমাধান করলেন। তরমুজের খন্ডগুলো তদারক করলেন মধুসূদন দত্ত। সবগুলো গুনলেন; কোন ভুল নেই বলে রায় দিলেন।

নির্মল লালা প্রত্যেককে একটুকরো করে পরিবেশন করলেন। সবাই খেতে লাগলেন। তরমুজের রসে ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয় যন্ত্রণাই নিবৃত্ত হতে লাগলো। সবাই পেয়েও গেছেন, কিন্তু নির্মলের জন্য অবশিষ্ট কিছুই নাই।

নির্মল হতবুদ্ধি, তার মুখ বিবর্ণ। একে একে সকলেই সব শুনলেন, সকলেরই খাওয়া বন্ধ হলো। কি হয়। কি হয়। এই অঘটনের ফল কি দাঁড়াবে কে জানে। উচ্ছৃংখল আচরণে অম্বিকাদার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখার ন্যায় জ্বলে উঠলো। ক্রোধে উন্মত্ত। সিংহের ন্যায় হুংকার দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই দুষ্কর্ম কে করেছে? অসংকোচে স্বীকার কর। সেই গর্জনে মেদিনী কেঁপে উঠলো। ভয়ে সকলেই জড়সড়।

দলের মধ্যে হরিগোপাল বল (টেগরা) ছিলেন একটি প্রদীপ্ত পাবক শিখা। হোমাগ্নির মতোই পবিত্র। ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করার মত সৎসাহস তার ছিল। বৃত্তের মধ্য হতে মাথা উঁচু করে তিনি সটান বীরের ভঙ্গিমায় দাঁড়ালেন। স্পষ্ট উচ্চারণে বল্লেন—"তরমুজ আমি নিয়েছি।"

টেগরা ধীর স্থির। প্রখর দৃষ্টি সামনে বিস্তৃত। তার দু'চোখের দৃষ্টিতে কোন মালিন্য নেই।

বিরক্তি আর ঘৃণা অম্বিকাদার চোখে মুখে ফুটে উঠল। তাঁর ক্রোধ সহস্রধারে ফেটে পড়ল। কুপিত কণ্ঠে তিনি হুকুম দিলেন—"লোকনাথ, টেগরাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের শাস্তি দাও। গুলি কর।"

লোকনাথ বল মুহূর্তের মধ্যে কোমর হতে গুলিভর্তি রিভলবার বের করলেন। টেগরাকে নিশানা করে গুলি ছুড়তে উদ্যত হলেন। রিভলবারের ট্রিগারে আঙ্গুল লাগিয়েছেন। এমন উত্তপ্ত মুহূর্তে উদ্গিরণোন্মুখ রিভলবারের নল ও টেগরার মাঝে আচমকা মাষ্টারদা এসে দাঁড়ালেন। দৃঢ়তার সঙ্গে শান্ত কণ্ঠে বল্লেন—"শান্ত হও লোকনাথ, অস্ত্র সম্বরণ কর।" ভুলের যেমন শাস্তি আছে, তেমনি সত্যবাদিতার পুরস্কারকেও তো অস্বীকার করা যায় না লোকনাথ। যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, মৃত্যুকে অনিবার্য জেনেও মিথ্যার আশ্রয় নেয় না, স্বেচ্ছায় সত্যের ঘোষণা করে, সে শুধু বীর নয়, বীর শ্রেষ্ঠ, সে মহান। এই অসাধারণ সাহসিকতার মূল্যও কম নয় ভাই।"

মাষ্টারদার কণ্ঠস্বর হতে যেন পরম স্নেহ ঝরে পড়ছিল। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে মাষ্টারদার কথা সকলে শুনছিলেন। সংগে সংগে কে যেন অম্বিকাদার ক্রোধাগ্নিতে এক বালতি জল ঢেলে দিল।

লোকনাথ বল যথাস্থানে তার অস্ত্র পুনঃস্থাপন করলেন। মুহূর্তের হস্তক্ষেপে ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল।

আবার সবাই তরমুজ খেতে লাগলেন। অম্বিকাদা ডেকে টেগরাকে কাছে বসালেন। প্রবোধ বাক্যে আদর করলেন। পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

আবার রাত্রির তপস্যা শুরু হল। মালার মতো পর পর সারিবদ্ধ হ'য়ে পায়ে পায়ে একের পিছনে আর একজন এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা কখনও খাদে পড়ছেন, কখনও উঁচুতে উঠছেন। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অপথকে পথ করে সামনে এগোচ্ছেন। আকাশে অজস্র তারা ফুটেছে। জঙ্গলে শত শত জোনাকি জ্বলছে, আর সর্বত্র জগৎজোড়া কালো আঁধারের মধ্য দিয়ে বিপ্লবীরা-

জয়যাত্রার উদ্দেশ্যে দ্রুত ছুটে চলেছেন। তাঁদের মনে বইছে পরবর্তী আঘাতের চিন্তার ঝড়।

এখন কোন বাঁধাধরা ছক কাটা আক্রমণের পথ জানা নেই। এই অজানা পথে চলতে অস্পষ্টকে স্পষ্ট করতে হবে। সম্ভাব্য সব সূত্র থেকে সংবাদ আহরণ করতে হবে। তাই বাধা কাঁটা বিপদকে উপেক্ষা করে আদর্শকে লক্ষ্য করে তারা নানা দিক ভাবছেন আর উর্ধ্বশ্বাসে শহরের দিকে চলেছেন।

স্বাধীনতার স্বপ্ন এই সর্বহারাদের সকল দুঃখ কষ্টকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। সমস্ত ভারতবাসীর দারিদ্র্যের দুঃখ-লাঞ্ছনার বোঝা তাঁরা মাথায় বয়ে চলেছেন। মাতৃভূমির সমৃদ্ধির চিন্তা এই অভিযানকে প্রেরণা যোগাচ্ছে। আজ স্বাধীনতা যজ্ঞে তাদের নিমন্ত্রণ। তাই বন্য জন্তুর ভয় তুচ্ছ করে, বিপদকে দুপায়ে দলে, মৃত্যু-তরণ তীর্থে স্নান করে, জীবনকে অক্ষয় করবেন। তারা জানে স্বাধীনতার সেতু পরান দিয়েই বাঁধতে হবে এবং রক্ত রাঙ্গা পথে অজয়কে জয় করতে হবে।

যখন অরুণ বরণ তরুণ তপন তার রক্ত আভা ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে, কাজলকালো রাত্রির অন্ধকারে আলোর ছাপ লাগছে, সেই রাত্রি ও দিনের মিলন মুহূর্তে মুক্তি সাধকেরা একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামলেন। পাহাড়টি খুব উঁচু; পর্বতশৃঙ্গ আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। সামরিক দৃষ্টিতে স্থানটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তার নিম্নদেশ ঘন কণ্টকাকীর্ণ। তার বক্ষদেশে বিরাট বিরাট বয়স্ক বৃক্ষে আচ্ছন্ন। স্কন্ধ অনাবৃত কঙ্কাল, মস্তক মুণ্ডিত।

পাহাড়টির নৈসর্গিক সৌন্দর্যে দেশব্রতীগণ যেমন আকৃষ্ট হলেন, তার নিরাপদ ও সুরক্ষার সুযোগের জন্যও শক্তি বৃদ্ধি হবে বলে মনে করলেন। ফলে, তাঁরা সেদিনের আশ্রয় সেখানে নিতেই মনস্থ করলেন। অম্বিকা চক্রবর্তীর আদেশে সকলে একের পিছনে একজন করে পাহাড়ে আরোহণ করলেন।

সেদিন সোমবার ২১শে এপ্রিল। শেষ এপ্রিলের দিনগুলি হয় অত্যন্ত রৌদ্রদগ্ধ। বাতাস তপ্ত। কিন্তু আজকের প্রভাতটা ছিল এর ব্যতিক্রম। মাথার উপরে ঘন পল্লবের আচ্ছাদনের সুশীতল ছায়া আর স্নিগ্ধ সমীরণের মন্থর প্রবাহ স্থানটিকে করেছে মনোরম। এই মধুর প্রকৃতির কোলে বসে

সকলেই সুস্থ বোধ করছেন। সারা রাত্রি বিরামবিহীন চলার ক্লান্তি দূর করছেন।

কিন্তু ক্লান্তি আর জড়তাকে আমল দিলে তো আর বিপ্লবীদের চলে না। তাদের ভাবতে হচ্ছে নিরাপত্তার ভাবনা। চিন্তা করতে হচ্ছে বিপ্লবীকে মহা-বিপ্লবের ঢেউ-এ পরিণত করার কথা। এই নিঝুম বনভূমিতে আত্মরক্ষা ও প্রতি আক্রমণের সুযোগ খুঁজছেন তাঁরা।

তাঁরা দেখলেন এই পাহাড়ের বৃক্ষগুলো বয়সে বৃদ্ধ, কান্ডগুলো প্রকান্ড। এই সুপ্রাচীন মহীরুহের তন্তুগুলো অত্যন্ত পাকা। যে কোন ধারালো অস্ত্র বা শক্তিশালী আগ্নেয় অস্ত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে এগুলো অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য। বিরাট আয়তনের গাছের গোড়াগুলো যে পর্দার সৃষ্টি করেছে তার আড়ালে পাঁচ-ছ'জন করে আত্মগোপন করলেন। এরূপে সমস্ত যোদ্ধারা পাহাড়ের গায়ে গায়ে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন। ব্রিটিশ বাহিনী তাদের দেখতে পাবে না কিন্তু দুশমনের প্রতিটি পদক্ষেপ তাদের নজরে ভেসে উঠবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে পাহাড়টি আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য ব্যূহে পরিণত হবে আর প্রতি-আক্রমণের পক্ষে নিচের কাঁটা গাছ ও লতাগুল্মের বেড়া প্রথম অবরোধ সৃষ্টি করবে। এই অবরোধ ডিঙোবার সময় আক্রমণকারীরা কিছুটা অমনোযোগী হতে বাধ্য। শত্রুর এই শিথিল মানসিক অবস্থার সময় অদৃশ্য স্থান হতে বিপ্লবীদের গুলীবর্ষণ ইংরেজ ফৌজকে ধূলিস্যাৎ করে দেবে। আবার পাহাড়ের পদপ্রান্ত হতে মুক্তিকর্মীদের অবস্থানের দূরত্ব সামরিক দৃষ্টিতে আরও একটি সুযোগের সৃষ্টি করেছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মুক্তি ফৌজের এই অননুমেয় অবস্থান চূড়ান্ত বিজয়ের পক্ষে এক মণিকাঞ্চন যোগ।

এই ব্যূহ রচনা বস্তুতপক্ষে ছিল অত্যন্ত নৈপুণ্যপূর্ণ। কৌশলী রণ-বিজ্ঞানী নির্মল সেন সমস্ত দলটিকে তিনটি ডিভিশনে বিভক্ত করেন। সম্মুখ যোদ্ধা বা অগ্রবর্তী বাহিনী (Front Army) প্রতিরক্ষা বাহিনী (Defence Force) এবং সংরক্ষিত বাহিনী (Reserve Force)। একদল নিম্নে ঝোপ-ঝাড়গুলোর সীমানার মধ্যে রেখে, দ্বিতীয় দল একটু উপরে এবং রিজার্ভ ফোর্সকে সবার উপরে স্থাপন করে সুরক্ষিত ব্যূহকে অপরাজেয় দুর্গে পরিণত করলেন।

আকাশস্পর্শী গিরিশীর্ষ থেকে প্রহরীরা তাঁদের দৃষ্টি চতুর্দিকে মেলে

ধরলেন। দূরে,—বহুদূরে, তেপান্তরের মাঠ পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত বস্তু তাঁদের দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো। ফাঁকি দেওয়ার ফাঁক সেখানে ছিল না।

সুরক্ষার পরেই খাদ্যের চিন্তা অম্বিকাদাকে অস্থির করে তুললো। ফতেয়াবাদ এখান থেকে বেশী দূরে নয়। ফতেয়াবাদে ফকির সেনের বাড়ি। ভাবলেন বন্ধুদের জন্য খিচুড়ি আনতে ফকিরকে বাড়ি পাঠাবেন। ফকির বাড়ি গেলেন।

ফকিরকে পাঠিয়েও তিনি মনে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। খাদ্যের অন্বেষণে নিজেও বের হলেন।

"স্বদেশের রণে কে রবে পিছনে চল চল ছুটিয়া যাই"

আজ যুব-উত্থানের চতুর্থ দিবস। আজ একুশে এপ্রিল। এই চার দিনের অনাহারে, অনিদ্রায়, দুর্গম পার্বত্য বন্ধুর পথ চলার ক্লান্তিতে যুবকেরা শ্রান্ত। চলার পথে কণ্টকের আঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত। এলোমেলো চুল, চক্ষু কোটরাগত। সমস্ত দেহে ক্ষুধার চিহ্ন পরিস্ফুট।

আবার এই সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষীণ স্বাস্থ্যের অধিকারী মাষ্টারদা স্বয়ং। অনিয়মের অত্যাচারে তিনি ঝড়ের পাখীর মতো বিধ্বস্ত, ক্ষুধায় শরীর ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে, ভাল করে দাঁড়াতে পারছেন না, পা টলছে। সারা-দিন রোদে পুড়ে, সারারাত পথ চলে, চারদিনের অনাহারে শক্তিহীন হলেও তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন না। সুখ আর দুঃখ, দুই তাঁর কাছে সমান। তিনি স্থিতপ্রাজ্ঞ। দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি কম্পিত পদক্ষেপে সৈন্য সমাবেশ প্রদক্ষিণ করলেন। পরে ধীরে ধীরে নিজের আশ্রয়স্থানে বসলেন।

প্রকৃতি প্রেমিক মাষ্টারদা যে বৃক্ষের পেছনে আশ্রয় নিয়েছেন তা একটি বিরাট বটবৃক্ষ। তার প্রাচীনত্বের প্রমাণ স্বরূপ তার শরীর হতে সন্ন্যাসীর জটার মত শত শত ঝুরি ঝুলে পড়েছে। শাখা প্রশাখা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অশোক বটের মত যেন ত্রিকালের প্রহরী। বৃক্ষতল পাখীর চঞ্চুর আঘাতে শাখাচ্যুত অর্ধভুক্ত বট ফলে আকীর্ণ।

এরূপ নৈকষ্য নৈসর্গিক গাম্ভীর্যের মধ্যে মহাঋষি মাষ্টারদা স্বৈরশাসনের লৌহ নিষ্পেষণকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবার সাধনায় যেন ধ্যানস্থ হলেন। তিনি ভাবনার জগতে পৃথিবীর এক মেরু হতে অন্য মেরু পর্যন্ত বিচরণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লব ইতিহাস মনে মনে আলোচনা করছেন। অন্য একটি

বৃক্ষের পিছনে বিশ্রাম করছেন, হরিগোপাল বল, (টেগরা), প্রভাস বল, সুবোধ বল, ত্রিপুরা সেন আর পুলিন ঘোষ। তাদের এই আলোচনার বিষয়-বস্তু বিপ্লবের ধারা। বিপ্লবের চিন্তায় তাদের চোখে ঘুম নেই। ত্রিপুরা সেন বল্লেন—"১৮ই এপ্রিলের যে বিরাট বিজয়, বিজয়ের প্রতি অটল বিশ্বাসই তার ভিত্তিমূল। সেদিন হতে নূতন আশার আলো জ্বলে উঠেছে। দিগ্বিজয়ের দ্বার খুলে গেছে। সব রকম মতে ও পথের দেশ-হিতৈষীদের আই. আর. এ. (I. R. A.)র পতাকাতলে সমবেত হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেশে এক অপরাজেয় জাতীয় শক্তির জাগ্রত হওয়ার সময় দেশকে শক্তিশালী নেতৃত্ব দেওয়ার বদলে সে পথ থেকে সরে এসে আমরা বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দিন দিন হীনবল হচ্ছি। এই হলো আত্মহত্যার পথ, এ পথ ত্যাগ না করলে অচিরে আমরা বন্য পশুর খাদ্যে পরিণত হব।

ত্রিপুরা সেনের কথা অপর চারজনই একবাক্যে সমর্থন করলেন। টেগরার পেছনে পেছনে সকলেই মনের বিক্ষোভ জানাতে মাষ্টারদার নিকট গেলেন।

মাষ্টারদা তখন গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। তাঁর ধ্যানমগ্ন মূর্তি দেখেই বিক্ষুব্ধদের রাগ জল হয়ে গেল।

টেগরা বিনয়ে গলে গিয়ে বল্লেন, "মাষ্টারদা, আমরা বাড়ি হতে বের হয়েছি দেশোদ্ধার করবো বলে, ব্রিটিশকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে আপনার আদেশে প্রাণ দিতেও আমরা পিছ-পা নই। কিন্তু এখন আমরা কর্মহীন। প্রতিদিন শক্তিহীন হচ্ছি। আদর্শকে রূপদান করতে আদেশ দিন, নইলে এই রইল আপনার বোমা, বন্দুক, থাকল আপনার রাইফেল, রিভলবার। আমরা নেতা চাই না, চাই যুদ্ধের নায়ক। বিনা রণে একবিন্দু শক্তি (Energy) ক্ষয় করব না, জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেঘোরে মরব না।"

নানা সমস্যার কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হলেও ধৈর্যের প্রতিমূর্তি মাষ্টারদা স্মিতহাস্যে টেগরার অভিযোগকে খণ্ডন করলেন। তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের বিশ্বাসকে সকলের কাছে তুলে ধরলেন। তিনি বল্লেন—"তোমাদের ক্ষোভের কি কারণ তা আমি বুঝি। এও জানি তোমরা বীর। আমিও তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেশ তোমাদের সাহসের প্রশংসায় শতমুখ।

তবে সাহস হল—ভয় আর হঠকারীতার মধ্যবর্তী অবস্থা। মুহূর্তের উত্তেজনায় মৃত্যুর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়া শুধু নির্বুদ্ধিতা। আর বীরত্বের অপর

নাম বিজয়। তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের এই উদ্যমকেও প্রশংসা করি। তোমাদের এই জীবন সাধনাই একদিন ভারতের স্বাধীনতার দ্বার উদ্‌ঘাটন করবে। এদেশের মানুষ যেদিন বিপ্লবকে হাতিয়ার ভাববে, সেই দিনই শুরু হবে সমাজের আসল লড়াই বা পরিবর্তন। কারণ ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতা কখনও মানুষের কল্যাণ আনতে পারে না। মানুষের প্রতি মানুষের মঙ্গল বোধই ভারতবর্ষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। আর এই দেশাত্ম ভাবনা থেকেই এই যুব উত্থান—যা হলো নির্লজ্জ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতির ক্রোধের প্রকাশ"।

এটা হল ২১শে এপ্রিলের প্রথম আলোচনা সভা। সভায় মাষ্টারদা বিপ্লবের শক্তি সম্বন্ধে একটি সুন্দর চিত্র বর্ণনা করেন। বিপ্লবের ক্রমবর্ধমান রূপ চট্টগ্রাম থেকে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ার উপায় কি, তা ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন,—"স্বাধীনতায় জন্মগত অধিকার মানুষের নয়,—মনুষ্যত্বের।" এই মনুষ্যত্ব জাগ্রত করতে প্রয়োজন পরিবর্তন। নিরন্তর পরিবর্তন একটা বাস্তব সত্য। বিপ্লব সেই পরিবর্তন আনে। বিপ্লব একটা সৃষ্টিমুখী শিল্প। এই শিল্প (বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা) জন্ম দেয় শুদ্ধ পবিত্র মানুষের। বিপ্লব কঠোর, কিন্তু কল্যাণে পরিপূর্ণ। আর বিপ্লবী দেশের সমস্ত কণ্টকে কণ্ঠে ধারণ করে সে নীলকণ্ঠ—মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব।

"বিপ্লবে মোহ বা আসক্তির কোন স্থান নাই। আদর্শই তার আদি, মধ্য ও অন্ত। ত্যাগ তার আত্মা। বিপ্লব শোষিত অত্যাচারিত মানুষের বাঁচার একমাত্র পথ।"

আরও অনেকে তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হলেন। সকলেই গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর কথা শুনছেন। গাছের উপর পাখীর কিচির মিচির আর তাদের পাখার ঝাপ্টা-ঝাপ্টি ছাড়া কারও মুখে টুঁ শব্দটিও নেই। প্রকৃতিও নীরব, মন্থর।

চট্টগ্রামের সাফল্যের পুনরুল্লেখ করে মাষ্টারদা বল্লেন—"চট্টগ্রামের সংগঠন, ছাত্র-যুবক, ধনী, নির্ধন দেশপ্রেমিকের সম্বদ্ধ একটা নিরেট শক্তি। চট্টগ্রাম উন্মুখ হয়েছে, বাঙ্গলা জেগেছে। বাঙ্গলার জাগরণ ও শক্তির প্রেরণা ভারতের জাতীয় জীবনকে মহৎ চিন্তায় ও সাহসিকতায় ভরিয়ে তুলবে। চট্টগ্রাম শুধু সেই উত্তরণের বেদীটুকু তৈরি করে দিচ্ছে। এই হলো সংস্কারের প্রথম

পদক্ষেপ। স্বাধীনতার উৎস সন্ধানে প্রথম যাত্রা। এই যাত্রাই পেঁছে দেবে মুক্তির দরজায়। সার্থক হবে ভারতের স্বপ্ন। আমাদের এই জাতীয় উদ্যোগের শক্তি অপরিসীম।

তারপর মাষ্টারদা উদাহরণ সহ আলোচনা করলেন অহিংসা আন্দোলনের ফলাফল সম্বন্ধে। "দুর্ধর্ষ আসুরিক শক্তিকে সর্বদা ক্ষমা, প্রেম ও অহিংসা দ্বারা বশীভূত করা যায় না। রাজনীতিতে অহিংসা নীতির প্রথম প্রবর্তন করেন সম্রাট অশোক। প্রবর্তকের জীবিতকালেই এই দুর্বলতার ছিদ্রপথে স্বজনগনের বিদ্রোহে বিরাট অশোক-সাম্রাজ্য ধ্বংসের কবলে পতিত হয়। তাই বন্ধন মুক্তির একমাত্র পথ বিপ্লব। সাধুর পরিত্রাণে, পাপ আর পাপীর বিনাশে, ধর্মের স্থাপনে বিপ্লব বারে বারে আসে। আর বিপ্লবী কখনও সংকল্প ভ্রষ্ট হয় না। বিপ্লবী যেমন দার্শনিক, তেমনি কবি।"

এই মহান নেতার উদাত্ত বাণী সকলের চিত্ত হরণ করল। তাঁর মুখের কথার অমৃতধারা দূর করলো সকলের শরীরের ক্লান্তি, মনের গ্লানি।

"ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা যে গায় গাক আমরা গাবোনা"

সূর্যকুমার সেন ছিলেন বিপ্লবী দলের নেতা। নেতা তিনি হ'তে চান নি, নেতা তাঁকে কেউ তৈরিও করে নি। মৌমাছি ফুলের আমন্ত্রণের জন্য বসে থাকে না। মধুর লোভে, আর তার সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে মৌমাছি যেমন প্রস্ফুটিত পুষ্পের নিকট আসে, তেমনি দুঃখে কষ্টে জর্জরিত মানুষও বুদ্ধির জন্য, জ্ঞানের জন্য, নানা প্রয়োজনে পরামর্শের জন্য, তাঁর চারপার্শ্বে এসে ভিড় করতো। তিনি অন্তরের সরলতা দিয়ে সকল জটিলতার সমাধান করতেন। তাঁর চরিত্র মাধুর্যে, অন্তরঙ্গ ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হতেন। সকলেই তাঁর কাছে আসতেন প্রাণের আবেগে, হৃদয়ের টানে। সেই আকর্ষণেই মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করতেন, ভালবাসতেন। আর এভাবেই তাঁর নিজের অজান্তে অপরের অজ্ঞাতসারে নেতৃত্বের বোঝা তাঁর মাথায় চেপে বসলো।

সে লোক কি করে দেশের মানুষের মনে পূর্ণ স্বাধীনতার আলোক শিখাটি জেবলে দিলেন, সেই জ্ঞানভান্ডারের খবরটি কেউ জানে না। তিনি ছিলেন স্বতঃসিদ্ধ নেতা। তাঁর নেতৃত্বের রহস্য বোঝাতে গেলে হয়ত তাঁকে ছোট করে ফেলব।

নির্মলকুমার সেন আর সূর্যকুমার সেন বহুদিনের পুরাতন বন্ধু ছিলেন। দুজনে একই সময়ে জেলে গেছেন। ১৯২১ সালে একসঙ্গে পাহাড়তলীর এ. বি. রেলওয়ের শ্রমিকদের ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ইংরেজ পরিচালিত বুলক ব্রাদার্স (Bullock Brothers) জাহাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে একত্রে আন্দোলন চালিয়েছেন। নদী বন্দর চাঁদপুরে ধর্মঘটী চা-শ্রমিকদের উপর পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে দু'জনেই লড়েছেন, আবার আজ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে উভয়েই এই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

অনেক দুর্দিনে, বহু দুর্যোগে, নানা সমস্যার সময়ে নির্মলদা মাষ্টার-দাকে দেখেছেন কিন্তু তাঁর এমন মূর্তি কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। তাঁর চোখের তারায় নির্মলদা মাষ্টারদার মনের ভাষা পড়ে নিলেন।

মাষ্টারদা বিষাদ সিন্ধুতে মগ্ন। দুঃসহ দুঃখে পীড়িত। এ যেন তার দেহ নয়। করুণ-ঘন-প্রতিমা, তিনি স্বগতোক্তি করলেন—"হায়রে, দুর্ভাগা দেশের হতভাগ্য বিপ্লবীগণ! দেশের জন্য সর্বস্ব দান করেও আজ তোদের ক্ষুধায় খাদ্য নেই, তৃষ্ণায় জল নেই। তোরা হীনবল হ'য়ে পড়লি।"
মাষ্টারদা এরপর বললেন—"নির্মল বাবু, শক্তি আর সময়ের অপচয়ের মধ্য দিয়ে আজ চারদিন চলে গেল, কোনও নব উদ্যোগ নেওয়াই সম্ভব হলো না। পরিকল্পনায় কোথায় ত্রুটি ? বিচারে কোথায় ভুল যে মণিন্দ্র গুহ ফিরে এলো না। তবে পুরাতনের মোহ আমাদের জন্য নয়, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের দৃষ্টি সর্বদা সামনে।

চট্টগ্রামে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র অচল, তা দিনের আলোর মত উজ্জ্বল কিন্তু তারা পরাজিত, পদানত ত নয়। ইংরেজ শাসনের সর্বশেষ পরিণতি জানতে ও বিপ্লবকে শক্তিশালী করতে সংগঠনকে তিনটি কঠিন সংকল্প বাস্তবে পরিণত করতে হবে।

প্রথম—শহরের হালফিল খবর ও অনন্ত-গনেশের হদিশ জানতে একজন তীক্ষ্ন প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন করিত-কর্মা লোক চাই। দ্বিতীয় হ'ল—জন সাধারণ। সাধারণ মানুষের চামড়ার মধ্যে যে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত তাতে দেশ-প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিতে হ'বে। তৃতীয়—স্বশাসনের অভিপ্রায় প্রতি ঘরে ঘরে সকলের মনে মনে জাগিয়ে তোলা আর জনগণের বিভিন্ন অংশকে জাতীয় ঐক্যের সামিল করা।

২১ এপ্রিল বেলা দ্বিপ্রহর। প্রহরীগন ফিরে এলেন, নতুন দল পাহারায় গেলেন। ফিরতি প্রহরীদের শরীর ঘর্মে স্নাত, গাত্রচর্ম রৌদ্র-দগ্ধ। তাঁরা এসে মাষ্টারদার সামনে বসলেন। ক্ষুধার জ্বালা জুড়োতে ঢক্‌-ঢক্‌ করে কেনেস্তারার সব জল খেয়ে ফেললেন। তাঁদের সঙ্গে আরও অনেকে এসে মিলিত হলেন।

দলনেতা বিদেশী কুশাসনের কূটনীতির সমালোচনা করলেন। ধূর্ত ইংরেজ স্বার্থের কারণে কত হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তারই দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। সকলকে উদ্দেশ করে বল্লেন—

"ইংরেজ শুধু আমাদের স্বাধীনতাই হরণ করেনি, হনন করেছে ভারতবাসীর মানবতা বোধকে, কলুষিত করেছে মানুষের নৈতিকতাকে—আমাদের জাতীয়তা বোধকে। বড় খেতাব, লোভনীয় চাকরি, ফাঁপা উপাধির লোভ দেখিয়ে মানুষগুলোকে পরিণত করেছে চাটুকারে, নামিয়ে এনেছে পশুর স্তরে। শিখিয়েছে, যে এক টুকরো মাংস দেবে তারই পায়ের তলায় বসে লেজ নাড়বে। তার হাতে চাবুক খেয়ে আনন্দে নাচবে। অহংকারী ইংরেজ ভারতবাসীকে বন্য জন্তুর স্তরেই রেখে দিতে চায়, কেবল পুলিশ আর মিলিটারির ভয় দেখিয়ে। একটা জাতির প্রতি এ এক মারাত্মক হৃদয়হীনতা।

২১ এপ্রিলের এ হলো দ্বিতীয় আলোচনা সভা। মাষ্টারদা খেদোক্তি করে আরও বললেন, "হীনচেতা হায়নার দল, অভিশপ্ত ভারতবর্ষে মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারে এমন একটি লোককেও জীবিত রাখতে চায় না। কেবল ফাঁসী, আন্দামান, আর জেলের ভয় দেখিয়ে শাসন কায়েম রাখছে। সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিয়ে ধর্মান্ধতায় সমাজদেহ বিষাক্ত করে জাতির সংহতি নষ্ট করছে।

তবে তোমরা নিশ্চিত জানবে সত্যকে গলা টিপে মারা যাবে না। এই ত প্রত্যাশিত সময়। শত্রুর দুর্বল মুহূর্তই আমাদের মহেন্দ্র ক্ষণ"।

মহান নেতার মুখে অপদার্থ বিদেশী সরকারের ভ্রষ্টাচারের এই বর্ণনা শুধু ভাষণ হিসাবেই শ্রবণ-নন্দন ছিলনা, এর উৎকর্ষের জন্য বুদ্ধির কাছে আবেদন ছিল।

সবাই সর্বান্তঃকরণে তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলেন, নিলেন না শুধু জিতেন দাশগুপ্ত। তিনি প্রশ্ন করলেন—শত্রুর দুর্বল মুহূর্তে আক্রমণ করা কি বীর ধর্মের বিরুদ্ধ হবে না?

জিতেনের জিজ্ঞাসা জ্বলন্ত আগুনে যেন এক বাটি ঘি ঢেলে দিল।

জ্বলে উঠলেন সর্বাধিনায়ক, ক্রোধানলে তাঁর দুই চোখ জ্বলছে। মাষ্টারদা বল্লেন—',যে শয়তান শাসনের নামে শোষণ করে, শৃংখলার নামে শৃংখলে বন্ধ করে, অর্থের লালসায় অনর্থের সৃষ্টি করে, অচিন্তনীয় অমানুষিকতায় যারা ভ্রষ্ট চরিত্র, তারা মানব জাতির শত্রু। ভারতবাসীর দুঃস্বপ্ন। স্বার্থের লালসায় অত্যুদ্ভুদ জানোয়ারের মত উন্মত্ততাড়নায় নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপর উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা বনের পশুকে হার মানায়। সেই সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসাদারেরা সর্বনাশের পথে ঘৃণ্য জীবন যাপন করতে ভারতবাসীকে বাধ্য করে। আর মানবতার এই অবমাননা তারা করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।'

"এই শ্বেত দানবের থাবা হতে দুর্দশাগ্রস্ত, ভীত দেশকে উদ্ধার করতে নীতির বা দুর্নীতির প্রশ্ন আসে কি করে ?"

অতঃপর আই, আর, এর বীরত্বের নিন্দা হওয়ার আশংকা সম্পর্কে জিতেনের ধারনা যে কত ভিত্তিহীন যুক্তির দ্বারা তা প্রমাণ করে মাষ্টারদা বল্লেন—"আই, আর, এর অতি বড় শত্রুও আমাদের বিরুদ্ধে এরূপ অপবাদ দিতে পারে না। কারণ ব্রিটিশ সরকার এখন বহির্শত্রুর আক্রমণে বিব্রত নয়, কোন যুদ্ধেও লিপ্ত নয়। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা দ্বারাও বিপর্যস্ত নয়। দেশের শত্রু এখন ক্ষমতার শীর্ষে। ভারতে তার শক্ত ঘাঁটি। বিদেশী শাসক তার পূর্ণ দানবীয় শক্তির সহায়ে, অত্যাচারের বিষাক্ত অস্ত্রে ভারতের বিস্তৃত বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত করছে। ম্যানচেষ্টার আর ল্যাঙ্কেসায়ারের বণিকবৃন্দ ভারতের রক্ত মোক্ষণে নিযুক্ত। ব্রিটিশের ভয়াল মূর্তিতে দেশবাসী সন্ত্রস্ত ; তাদের বিধান এত বড় নিষ্ঠুর অনাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ভারতবাসীর স্বাধীনতা কামনাকারী স্বশাসনের বিষয় কল্পনা করাও বে-আইনী।"

ভারতের সেই ঘোর দুর্দিনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আর্জি এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী চট্টগ্রামের আই, আর, এ, সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট পেশ করেন সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। তারা আঘাত হানে ক্ষমতা মদ-মত্ত ঔদ্ধত্যকে। চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় দুর্ধর্ষ দস্যুর দম্ভকে।

মাষ্টারদার বাণী অণুগামীদের অবসন্ন মনে নবশক্তির সঞ্চার করল। ভিতরে ভিতরে একটা অলক্ষ্য শক্তির প্রভাব অনুভূত হলো। তিনি গণ-জাগরণের কারণ বিশ্লেষণ করে বল্লেন—এই রাজনৈতিক অভ্যুত্থান

হলো, অত্যাচারীতদের, আত্মিক বিস্ফোরণ, নিগৃহীত মানুষের ইজ্জতের সাথে বাঁচবার প্রাণান্ত প্রয়াস।

বুভুক্ষা, দুর্দশা, নির্যাতন লাঞ্ছনার দীর্ঘশ্বাসের অন্তরালে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে অসন্তুষ্টি সঞ্চিত হ'য়েছে সেই পুঞ্জীভূত বিক্ষোভই এই সাফল্যের কারণ। এই জয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির জয়। এই বিজয় ভারতের শাশ্বত পরাক্রমের পুনরুদ্ধার।

তারপর যে সত্যকে সত্য বলে আজীবন, যে দর্শনকে মনে প্রাণে লালন করছেন, সেই রাজনৈতিক মতবাদকে সকলের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে খুলে ধরলেন।

"এই যুব অভ্যুত্থান একটি মৌল সত্য প্রমাণ করলো যে, যারা বিদেশী কালসাপকে দুধকলা দিয়ে পূজা দিয়ে তুষ্ট করে, আর অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তাদের দয়ায়, ভারতবাসীর স্বাধীনতার দুয়ার খুলে যাবে বলে আশা করেন, তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করেন। প্রমাণিত সত্য হলো—স্পর্ধিত ফণীর দর্পিত ফনা মন্ত্রে বশীভূত হবে না, তার বিষ-দাঁত ভাঙতে চাই পাকা লাঠির কঠিন নির্মম আঘাত।"

মাষ্টারদা লক্ষ্য করলেন যে. এই চার দিনের অনিদ্রা অনাহার অনুগামীদের বিপ্লবীতেজ স্তিমিত করতে পারেনি। সেই তেজকে আরও তেজোদীপ্ত করতে তিনি প্রেরণাময় কণ্ঠে বললেন—"এই সাময়িক বিচ্যুতিতে হতাশায় আচ্ছন্ন হলে আমরা বিপ্লবী ধর্ম হতে বিচ্যুত হবো।"

বিপ্লবকে বাঁচাতে হলে লড়তে হবে। লড়াই করেই বাঁচার অধিকারকে কায়েম করতে হবে। তোমাদের অটল ধৈর্য্য আর প্রচণ্ড সংকল্প শক্তির সংঘাতে বিপ্লবের মশাল সকলের সামনে উঁচিয়ে ধরতে হবে। তবে হ্যাঁ, বিপ্লবের মশাল সজ্জনকে পোড়ায় না। সে মশাল চিত্তকে শুদ্ধ করে—অন্ধকার দূর করে—মনকে আলোকিত করে।

"বীর দর্পে পৌরুষ গর্বে সাধরে সাধ দেশের কল্যাণ"

নেতারা আবার এক জরুরী বৈঠকে বসলেন। অম্বিকাদা একটি দৈনিক পাঞ্চজন্য নিয়ে এসেছেন। সেই পত্রিকার সংবাদ কেন্দ্র করে এই আলোচনা। (পাঞ্চজন্য চট্টগ্রাম জেলার দৈনিক সংবাদ পত্র)। নিজস্ব সংবাদদাতা মণীন্দ্র গুহ এখনও ফেরেন নি, তাই সকলেই অত্যন্ত বিচলিত।

দেশের নিয়ম শৃংখলার এই ভাঙাহাটে বিপ্লবের চরিত্র বিশ্লেষণ করার জন্য এই আলোচনা সভা।

মাষ্টারদা বল্লেন—"এখানে তর্কের কথা বেশী নেই। হৃদয় দিয়ে বুঝবার বিষয় আছে। এতে চাই তীক্ষ্নবুদ্ধি আর বাস্তব জ্ঞান। একচুল ভুল থাকলে সমূহ বিপদ।"

নির্মলদা বল্লেন—"বিপ্লবের সঙ্গে সর্বসাধারণদের নাড়ির টান। সে দিকেও নজর দিতে হবে।" লোকাদা বল্লেন—"সহরে আমাদের প্রবেশ করা যে অপরিহার্য তা সূর্যোদয়ের মতই নিশ্চিত। আমাদের প্রধান শক্তি যুবক, ছাত্র তার সাধারণ মানুষ। ১৮ এপ্রিলের ইস্তাহারে যে শক্তিকে আমরা ডাক দিয়েছিলাম, সেই অদম্য শক্তি অতন্দ্র অপেক্ষায় দিন গুনছে। শহরে গ্রামে কত উৎসুক প্রাণ আমাদের দিকে চেয়ে আছে। যোগ্য ব্যক্তির জন্য বিপ্লবের দরজা খুলে দিতে হবে।"

এইভাবে এই পরামর্শ সভায় অনেক মতের আদান প্রদান হলো। সর্বশেষে স্থির হলো—বিপ্লবের চাকা এবার ঘুরিয়ে দিতে হবে। প্রথম আঘাতের মতো পূর্ব পরিকল্পনার ন্যায় ঘড়ি দেখে কাঁটায় কাঁটায় আক্রমণ আর হবে না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চরিত্র হবে ভিন্ন। পদ্ধতিটাই হবে একেবারে নূতন।

এখন রীতি ও নীতি রচিত হবে মুহূর্তের বিচারে। আক্রমণ হবে ঝড়ের গতিতে। পরিকল্পনা তথ্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ হবে। চাতুর্য হবে সাফল্যের বাহক। এই অভিনব মুক্তি আন্দোলনের রক্তরাঙা পথের শক্ত দুর্গমতাকে জয় করতে দরকার—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

অম্বিকাদা বল্লেন—"মাষ্টার বাবু. ছেলেদের নিয়ে সহরের পথে এগোবার পূর্বে একটা বিঘ্নজয়ী উপায় আবিষ্কার করা প্রয়োজন। অভিযানকে বিভিন্ন দিক থেকে যাচাই করার আয়োজন করুন। আমার ইচ্ছা, পাহাড়ের রাস্তাধরে অগ্রসর হওয়ার দরুন কিছু নরহত্যা বাদ পড়তে পারে। মাষ্টারদা অনুভব করলেন—বিষয়টি যেমন দায়িত্বপূর্ণ অম্বিকাদার প্রস্তাবটিও তেমনি গরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি অন্তরের শান্ত মণ্ডলে সত্যকে খুঁজতে লাগলেন।

মাষ্টারদা গভীর চিন্তার নিদ্রা হতে মুক্ত হয়ে নির্মলদাকে বল্লেন—"নির্মল বাবু, শহরে আমাদের সাজান বাগান পশুরা নষ্ট করে দিয়েছে। দুজন তুখোড় ছেলে চাই যারা সহরের নাড়ীর খবর জানে অথচ পুলিশ তাদের চেনে না।"

নির্মলদা ভাবনার ভুবনে প্রবেশ করলেন। প্রতিটি বিপ্লবীর বুদ্ধির প্রাখর্য্য, মানসিক শক্তির প্রাচুর্য্য আর বিপ্লবী আচরণের ইতিহাস বিচার করলেন।

নির্মলদা যুক্তির কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে দীপ্তিমেধা চৌধুরী ও অমরেন্দ্র নন্দীকে যথার্থ যোগ্যজন বলে নির্ণয় করলেন।

এমন সময় গম্ গম্ শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সহায়রাম দাশ আকাশ মুখে চেয়েই চাপা কন্ঠে বলে উঠলেন—"এয়ার রেড্। এয়ার রেড্। তীক্ষ্নকণ্ঠে আদেশ দিলেন—জলদি শটি বনে লুকিয়ে যাও, লুকিয়ে যাও।" সহায়রামের নির্দ্দেশে সকলেই ঘন শটিবনের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করলেন। গুপ্ত স্থান হতে উপরের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের মধ্যে একটা উড়োজাহাজ বার বার ঘুরে ঘুরে পাহাড়গুলিকে প্রদক্ষিণ করছে। কেউ কেউ বায়ুযানটিকে গুলি বিদ্ধ করে ঘায়েল করতে রাইফেলের নিশানায় তাক করলেন। বায়ুযানটিকে ছিল অনেক উঁচুতে, রাইফেলের গুলির সীমানার বাইরে। এত উঁচুতে যে, সেটিকে ছোট চিলের মত মনে হচ্ছিল। তাই কেউ বৃথা শক্তিক্ষয় করলেন না।

আকাশযানটি আকাশে অনেকক্ষণ মহড়া দিল। কিন্তু বোমা বর্ষণ বা গুলিবর্ষণ কিছুই করলো না। হয়ত বিপ্লবীদের হদিস পেল না। অপরদিকে শিকারীর ফাঁদ হতে শিকার পালাতে বিপ্লবীরা আফশোষ করলেন। আশাহত হয়ে ক্লান্ত হাওয়াই জাহাজটি চলে গেল। বিপ্লবীগণ অস্বস্তিকর শটি জঙ্গলে রুদ্ধ শ্বাসে এতক্ষণ বসেছিলেন। বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন। ব্রিটিশ সরকার কত বিচলিত হলে জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে এরূপ অভিযান চালায় তার আলোচনা করলেন। আর কালক্ষয় নয়, আজই সহরে প্রবেশ করে হতবুদ্ধি ব্রিটিশ শক্তির মোকাবিলা করা হবে।

অমরেন্দ্র ও দীপ্তিমেধা দুইজনই ছিলেন অফুরন্ত উৎসাহ আর অক্লান্ত উদ্যমের অক্ষয় প্রস্রবণ।

মাষ্টারদা নির্মলদার সঙ্গে পরামর্শ সাঙ্গ করে এক নির্জন স্থানে বসলেন। অমরেন্দ্র ও দীপ্তিমেধাকে কাছে বসালেন। পরম স্নেহ সহকারে বল্লেন, তোমাদের সহিষ্ণুতা আর বিপ্লবের প্রতি অনুরাগের বিষয়ে যখন চিন্তা করি তখন শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও আমি স্বর্গসুখ অনুভব করি। কারণ তোমাদের কাছে প্রাণের চেয়েও দেশ বড়।

বিপ্লবী আলাদা জাতের মানুষ, বিপ্লবী ভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরি, তোমাদের দেখে এই সত্য আমার মনে দৃঢ়তর হয়। এমন কোনও কর্তব্য নাই যা বিপ্লবীরা করতে পারে না। এমন কোনও সমস্যা নাই যার সমাধান বিপ্লবীরা জানে না।

এই যে সহর হতে সংবাদ সংগ্রহ করা—এ অত্যন্ত জটিল কাজ। তবে বিপদের মধ্য দিয়েই হবে বিপ্লব সাধনা, বন্ধুর পথে হবে শক্তির আরাধনা।

মনে রাখবে সংকল্প যাদের দৃঢ়, ইচ্ছা যাদের প্রবল, উদ্দেশ্য যাদের মহৎ, পথ যাদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিতের কল্যাণে সর্বস্ব দান, সাফল্য তাদের মুঠোর মধ্যে। মুক্তি পণের মুক্ত গতিকে কেউ রোধ করতে পারবে না।" মাস্টারদার কথাগুলো অগ্নিরেখার ন্যায় সকলের মস্তিষ্কে ক্রিয়া করছিল। তিনি দুইজনকেই সাবধান করে বল্লেন—"মানুষের মন দুর্বল হয় স্নেহ, মায়া, মমতার প্রভাবে। এই মোহের ছিদ্রপথে স্বদেশ সাধকের যাবতীয় শৌর্য-বীর্য, সাহস আর বল-বিক্রম মুহূর্তের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। তোমরা অন্তরে অনুধাবন কর যে স্বার্থ-পরতা আর কাপুরুষতা মহাপাপ, ও ব্যক্তিগত মান, যশ, ইজ্জত অনেক পরে, দেশ আগে।" তারপর পথের কাঁটা উপড়িয়ে বিপদকে এড়িয়ে নির্বিঘ্নে সহরে পৌঁছবার জন্য উভয় অভিযাত্রীকে কয়েকটি পরামর্শ দিয়ে মাস্টারদা বল্লেন—"অদৃষ্ট পূর্ব সমস্ত বিরোধিতাকে মোহমুক্ত নির্মল বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করবে। একতরফা বিচারে সত্যকে সর্বোতভাবে পাওয়া যায় না। পথের ধারে মিত্রতা সৃষ্টি করে করে অগ্রসর হবে। পথে চলতে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকবে। সমস্ত জ্ঞানইন্দ্রিয় আর কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলোকে সব সময় জাগ্রত রাখবে। স্থানীয় লোকের কথা শুনবে মন দিয়ে, অনুধ্যান করবে গভীরভাবে। মনোযোগের সঙ্গে চিন্তা করে মতামত প্রকাশ করবে। চলনে, বলনে, আচরণে ভদ্র হবে, সরল হবে, কিন্তু মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না। নিজেদের পরিচ্ছন্ন চরিত্রের ভাবমূর্তি তৈরি করবে।" তারপরে সহরে কি করতে হবে তার একটি ছক কাটলেন। বুঝিয়ে বললেন—"সহরে ঢুকতেই চন্দনপুরা। সেখানে সুখেন্দু দস্তিদারের সঙ্গে দেখা করবে, সহরের হালচাল জানবে, সরকারের কর্ম-কান্ডের খোঁজখবর নেবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তিত অবস্থার খোঁজখবর নেবে।

"সদরঘাটের অর্ধেন্দু গুহ তোমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাকে দিয়ে সহরে নূতন স্থাপিত শক্তিকেন্দ্রগুলোর, সৈন্য ব্যারাকগুলোর একটি নক্সা তৈরি

করাবে। আক্রমণের পক্ষে সুযোগ ও বিপক্ষে কি কি বিপত্তি আছে সে সমস্ত আলোচনা করবে। অনন্ত, গণেশের খবর নেবে। সতীভূষণ সেন, আনন্দ গুপ্ত ও রজত সেনের বাড়ি গেলেই তাদের খবর পাওয়া যেতে পারে। অনন্ত আর গণেশের নেতৃত্বের শক্তির সঙ্গে আমাদের শক্তির মিলনে এক মহাশক্তির সৃষ্টি হবে। তবে রাত্রি সাতটার মধ্যে খবর নিয়ে এখানে মিলিত হবে। কর্তব্য অনেক, পথ দীর্ঘ, সময় কম। যানবাহনের সাহায্য নেবে। সহরে সাইকেলের সুযোগ পাবে। অভিযানের জয়টীকা তোমাদের জন্য তোলা রইল আর আঁধার হবে ক্ষয়, তোমাদের হবে জয়, এ আমার অন্তরের প্রতিধ্বনি।"

"চাবো না পশ্চাতে মোরা মানিব না বন্দন ক্রন্দন"

অমরেন্দ্র ছিল সদরঘাটের ছেলে—অনন্ত সিংহের হাতে গড়া একেবারে ঘুঘু ছেলে। অনন্ত সিং তাকে সংযমের আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে পাকা সোনায় রূপান্তরিত করেছেন। তার কাছে জীবনের চেয়ে দেশের মর্যাদা অনেক, অনেক বড়। এমন শানিত-বুদ্ধির ছেলে, এ কাজের যোগ্য। কারণ সে ভয়লেশহীন, কর্তব্যে কঠিন, তেজস্বী বালক। অমরেন্দ্র ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হওয়ার যোগ্যতা রাখে। অথচ এমন সর্বার্থসাধক, সৎ ছেলে রাজার আইনে রাজদ্বারে অবাঞ্ছিত। অমরেন্দ্র সম্পর্কে এই কথাগুলি মনে মনে চিন্তা করছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী।

অমরেন্দ্র ছিলেন সদরঘাট ব্যায়ামাগারের ব্যায়ামবীর। শক্তিতে ছিলেন ভীম, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।

অনন্ত সিং কর্তব্যের হাতুড়ি দিয়ে সকাল বিকাল পিটিয়ে পিটিয়ে কাঁচা লোহা থেকে তাকে কঠিন ইস্পাত নির্মাণ করেছেন। আবার বিজ্ঞানের ছাত্র অমরেন্দ্র যেমন আচার্যদের ছিলেন স্নেহধন্য, ছাত্রদের সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, তেমনি পাড়ার ছেলেমেয়েদের অমরদা ছিলেন মহল্লার গুন্ডা আর সমাজ বিরোধীদের সাক্ষাৎ যম। অমরের ঘুঁষিতে মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যায়নি এমন ষন্ডা সেই পাড়াতে কেউ ছিল না। তিনি কেবল মুষ্টিযোদ্ধাই ছিলেন না, লেঠেলও ছিলেন।

ছয় ফুট লম্বা বাঁশের লাঠির উপর ভর দিয়ে লাফ মেরে একতলা বাড়ির ছাদের উপর হাসতে হাসতে সটান দাঁড়াতেন অতি অবহেলায়।

আবার সেই লাঠির ওপর ভর দিয়ে সগর্বে নিচে নেমে আসেন চোখের নিমেষে। তাঁর লাঠি দুষ্টের মাথা ফাটাতো, শিষ্টের মুখে হাসি ফোটাতো। অমরেন্দ্র যখন সদরঘাট ক্লাবের বার্ষিক প্রদর্শনীতে উপস্থিত হতেন নয়ন-নন্দন পেশীবহুল তার স্বাস্থ্য দেখে যুবকগণ ঈর্ষা করতেন, বৃদ্ধেরা প্রশংসা করতেন।

প্রতিযোগিতার দর্শকদের সামনে তিন সুত মোটা তিন ইঞ্চি চওড়া ও সাত ফুট লম্বা ইস্পাতের পাত অমরেন্দ্র তার ইস্পাত-দৃঢ় কব্জীতে মুচড়িয়ে সাপের কুন্ডলীর ন্যায় চার পাঁচটি রিং পাকিয়ে উপস্থিত মহাশয়দের সামনে ধরতেন। ক্রীড়ামোদীরা দুঃসাধ্যতা উপলব্ধি করে বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। আনন্দে, উল্লাসে, হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাতেন। সলজ্জ আনন্দে অমরেন্দ্র জনতার সেই প্রশংসা উপভোগ করতেন।

আর দীপ্তিমেধা। তিনি ছিলেন কর্মচঞ্চল, চটপটে, হাসিখুশী আর ফুট-ফুটে। চেহারায় কার্তিক, বিদ্যায় গণেশ, নৈপুণ্যে, চাতুর্যে আর বুদ্ধিতে অমরেন্দ্ররই সমকক্ষ।

মাষ্টারদার উপদেশ অভিযাত্রীদ্বয়কে উৎসাহিত করলো। তাঁর আদেশ সর্বশক্তি দিয়ে পালনের আশ্বাস তাঁরা দিলেন।

যাত্রার পূর্বে তাঁরা ধরা চূড়া ছাড়লেন, অর্থাৎ যুদ্ধের অস্ত্রাদি ও সৈনিকের পোষাক পরিহার করলেন, ধুতি-সার্ট পরিধান করলেন। শুধু সাথে রাখলেন দুইটি করে রিভলবার। শিষ্ট অতি ভদ্র বেচারা বাঙ্গালী সাজলেন। একটু আগেও যাঁরা ছিলেন বীর যোদ্ধা, এখন তাঁরা নিষ্ঠাবান সজ্জন। ফুলেতেও কীট থাকতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও মালিন্য ছিল না।

অথচ মনে উত্তেজনার ঝড় বইছে, শিরায় শিরায় সবেগে রক্ত ছুটছে।

যে দায়িত্ব কেউ পেল না, সে কঠিন কর্তব্যের গুরুতর বোঝা বইবার অধিকার নিয়ে তাবা আনন্দে আত্মহারা। তারা মনে মনে ভাবলেন—এতে আলাদা একটা সৌরভ আছে, বিশেষ বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি আছে, মর্যাদার ইঙ্গিত আছে।

তারপর পথিকদ্বয় মাষ্টারদাকে প্রণাম করে সহ-বিপ্লবীদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বল্লেন—"শুধু এই আশীর্বাদ চাই এই গুরুভার বহনের শক্তি যেন পাই।"

এই বলে পাহাড় হতে পথে অবতরণ করলেন। সতর্ক পদক্ষেপে সচকিত মনে দ্রুতপদে তাঁরা ছুটে চলেছেন। মন ভাবছে সময় কম, সহর বহুদূরে। দ্রুত দৌড়ে চল। গতরাত্রের পথশ্রমে ক্লান্ত শরীর কিছুতেই চলতে পারছে না পা, বেদনায় অচল। তবুও সংকল্পে অটল—হয় মন্ত্রের সাধন, নয় শরীর পতন। বিবেকের আলোক যে তাদের নৈতিক সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছে, তাই এই তরুণ হৃদয় যুদ্ধ-জয়ের সর্বনাশা নেশায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

তাঁরা আশা পোষণ করছেন যে, গ্রামে, সহরে এবং পাহাড়ের বনে দেশ-মুক্তির জন্য যে শক্তির জাল ছড়িয়ে আছে তা একসাথে বেঁধে দিতে পারলে জনবিক্ষোভের প্রবল স্রোতে রাজনৈতিক চেতনার ধারাটাই পাল্টে দিতে পারবেন।

মুক্তির দূত-দ্বয় যখন এরূপ চিন্তার বানে ভেসে চলছেন, তখন দেখলেন ফটিকছড়ি থেকে ধূলোর মেঘে আকাশ আচ্ছাদিত করে একটি বাস সহরের দিকে ছুটে চলেছে। তাঁরা তাতে আরোহন করলেন।

লোকনাথ বল (লোকনাথদা) ছিলেন তদারককারী। কে কে পাহারা দেবেন, কে কোন্ কাজে নিযুক্ত থাকবেন, কে বিশ্রাম করবেন, কে কোথায় কি-ভাবে অবস্থান করবেন, দলের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিটি খুঁটিনাটি তিনি তদারক করতেন। ত্রুটিহীন শাসনে আর্মির শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। সৈনিক চরিত্রের লোকদা বক্তা ছিলেন না, ছিলেন সেনাধ্যক্ষ।

তখন পাহাড়ের গুপ্ত গহ্বরে বসে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কত জল্পনা কল্পনা করছেন। অমরেন্দ্র আর দীপ্তিমেধাকে নিয়ে রঙ্গীন কল্পনার নানা জাল বুনছেন। ভাবছেন, তাদের যোগাযোগের প্রচেষ্টা জটিলকে সহজ করবে। নূতন পথের সন্ধান দেবে। হয়তো নবতর ইতিহাস তৈরির দরজায় পৌঁছে দেবে।

কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সেনাপতির মনে জাতি ও জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাবনার উদয় হচ্ছে। এখন বাঙ্গালী চরিত্রের দুর্বলতার চিন্তা তার অন্তরকে তোলপাড় করে তুলেছে। আর এই দুর্বলতাকে সহায় করে কি করে বিদেশী শাসন ভারতবাসীর উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাচ্ছে। তামাম ভারত-বর্ষে নিষ্পেষণের যাঁতা ঘোরাচ্ছে, সেই মর্মান্তিক বিবরণে লোকনাথ উদ্‌ভ্রান্ত। সেই মনের বিক্ষোভ তিনি কিছুতেই ভিতরে চেপে রাখতে পারছেন না, না প্রকাশ করে শান্তি পাচ্ছেন না।

তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমরা শক্তির মূল্য ভুলতে বসেছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছে।' আত্মরক্ষা আর স্বার্থরক্ষা নিষ্ক্রীয়েদের লভ্য নহে। আমরা চাই—চিন্তা না করে জ্ঞান, বিনাশ্রমে ফল, সহজ সাধনায় সিদ্ধি, বিনা বীজে শস্য।

বাঙালীর আচরণে যদি চিন্তার গভীরতা, শক্তির প্রখরতা, বীরোচিত সাহস ও দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে পারে তবে সে ভারতের নেতৃত্ব কেন জগতকে পথ দেখাতে পারবে। জ্ঞানহীন মনে আসে সংকীর্ণতা, আসে ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি। এই চারিত্রিক অপকর্ষের সুযোগ নিয়ে বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর জীবনকে কুকুর বেড়ালের জীবন হতেও মূল্যহীন মনে করে।

লালা লাজপত রায়ের মতো পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ দেশবরেণ্য নেতাকে বৃটিশ পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করে। জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নৃশংস হত্যালীলা সংঘটিত করেছে তার রক্তের দাগ ভারতবাসীদের মন হতে এখনও মুছে যায়নি। সেই বিভীষিকার স্মৃতি ভারতবাসীকে আজও আতঙ্কিত করে, জান! উদ্ধত ও উলঙ্গ অসির আস্ফালনে আর লাঠির অত্যাচারে তারা আমাদের অধিকারের দাবীকে দুপায়ে দলিত করছে। অমানবিক আচরণে ভারতবর্ষ ও ভারত-বাসীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করছে। আমাদেরই দেশের মাটিতে তাদের তৈরি ক্লাবে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। আমরা যেন মানুষ নই। সহরের বুকে ইউরোপীয় হোটেলে ভারতীয় পরিচ্ছদ পরে দেশীয় মানুষ ঢুকতে পারে না। ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে পর-পদানুকরণ করে বিদেশী পোষাকে সেখানে যেতে হয়।

রেলের এক কামরায় সাদা শয়তান আর কালো আদমীর একত্র ভ্রমণ সাহেবদের ঈর্ষা উৎপন্ন করে। ভ্রমণ করলে অপমানিত হতে হয়, লাঞ্ছিত হতে হয়। তাতে নাকি গাড়ি অপবিত্র হয়, মাতালগুলোর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

এই যে অকারণে মানুষকে ছোট করে দেখা, মানুষের প্রাণের দেবতাকে অপমান করা, তার প্রতিবিধান আবেদনে হবে না—নিবেদনেও না।

বিষ দিয়েই বিষ ক্ষয় করতে হবে। কিলের বদলে কামান দাগতে হবে।

যে, যে ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই তাকে বোঝাতে হবে। আসল কথা হলো তাদের মানুষ বললে সত্য বলা হলো না। মানুষের সঠিক পরিচয় হলো মনুষ্যত্বে। তাদের মূল পরিচয় ভুলে গিয়ে, মানুষ ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে তাদের "ইংলিশ ম্যান" পরিচয়টাই তারা বড় করে ধরেছে আর মনুষ্যত্বের

স্থানটা ফিকে হতে হতে দুর্বৃত্ত মানুষের রূপ ধরেছে। আজ তাই শ্বেত শয়তানের রুধির দিয়েই হবে সহীদের তর্পণ।

এটা নিয়তির মত অবধারিত যে, বিপ্লবের বিজয় রথ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলবে। বাধা-বিপত্তিকে গুঁড়িয়ে পিষিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, অগ্র-গতির জয় নিশান উর্দ্ধে উঁচিয়ে ধরবে। মনে রাখবে—যেহেতু তারা অত্যাচারী, সেহেতু তারা ভীতু। আর আমরা অগ্নিকল্প বিপ্লবী। আমাদের লক্ষ্য—সহর আবার অধিকার করা।

যে শ্বেতাঙ্গগণ ভয়ে কাঁপছিল, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে এতদিন সমুদ্র সলিলে ভাসছিল, হয়ত এখন তারা সহরে ফিরেছে বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করতে। গুপ্ত ছুরিতে বিষ মাখাচ্ছে। নিজের শক্তিসামর্থের দৈন্য টের পেয়ে ফোর্ট উইলিয়ম হতে হয়তো সেনাবাহিনী আমদানী করেছে। তবে যত ফন্দি আঁটে আঁটুক, দাবার চাল যেভাবে খুশী চালুক। কিস্তি মাত্ আমরা করবোই। সেজন্য যত রক্ত দরকার হয় দেব। আত্মদানের প্রয়োজন হয় করবো। চূড়ান্ত বিজয় লাভ না হলে এক পাও নড়ব না।" লোকনাথ বলের জ্বালাময়ী ভাষণে, বিপ্লবী তরুণেরা ক্ষুধার জ্বালা ভুলে ছিলেন। কিন্তু এরপর যখন অম্বিকাদা তাদের জন্য খিচুড়ি তৈরী করিয়ে নিয়ে এলেন, স্বর্ণবর্ণ তপ্ত খিচুরির সন্দর্শনে ক্ষুধার্তদের শুষ্ক জিভ লোভের লালায় ভিজে গেল, ক্ষুধার আগুন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠল। অম্বিকাদা তারই এক স্থানীয় বন্ধুবাড়ী হতে খিচুরী রান্না করিয়ে এনেছেন।

সকলেই ক্ষুধার্ত। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রত্যেকেই চঞ্চল, ভোজ্য বস্তু সামনে রক্ষিত কিন্তু কেউ খেতে পারছেন না। খিচুরী থেকে এখনও ধোঁয়া উদ্গিরণ হচ্ছে। অগ্নিবৎ তপ্ত খিচুড়ী রাখবার তাদের কাছে কোনও পাত্র নাই। হাতে রাখলে হাত জ্বলে, এদিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলছে। অগত্যা, বিমর্ষ হয়ে অনেকেই দূরে সরে গেলেন। শেষ এপ্রিলের গরম আবহাওয়ায় আহার্য্য কিছু-তেই ঠান্ডা হচ্ছে না। ক্ষুধার্তদেরও অপেক্ষায় সময় কাটছে না, খিচুড়ী ঠান্ডা হতেই আধঘন্টা সময় কেটে গেল।

তখন সবাই ভাবছেন অনেক খিচুড়ী খাব, যত পারি পেটে পুরে নেব, তিন দিনের খাবার আজ ভোজন করব, তিন দিন আর খেতে হবে না। কিন্তু খেতে বসে তা আর পারলেন না। এমনকি ভরপেটও খেতে পারলেন না। তিন দিনের উপবাসে দুর্বল পাকস্থলী কিছুই গ্রহণ করতে চায় না। সকলের

খিচুড়ী ভোজন যখন সাঙ্গ হল তখন বেশ রাত। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা, পথ ঘাট চেনা যায় না। চৌকির দরকার নেই। চৌকিস্থল থেকে রক্ষীদল ফিরে এসেছেন।

তাদেরও ভোজন পর্ব শেষ হ'ল, কিন্তু অমরেন্দ্র, দীপ্তিমেধা এখনও ফিরলেন না। সেজন্য অধীর উৎকণ্ঠায় সংবাদের জন্য সকলেই উদগ্রীব। প্রত্যেকেই ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। সময় হয়ে আসছে, সাতটা প্রায় বাজে, এক্ষুণি চলে আসবেন। এই ভেবে সকলেই মনকে প্রবোধ দিচ্ছেন। অপেক্ষায় অপেক্ষায় সাতটা বেজে গেল। সাতটা পনেরো মিনিট এখন। সময় অতিক্রান্ত। এখনও তারা পৌচলেন না, অজানা আশঙ্কায় সকলেরই মন বিষণ্ণ। কি হ'তে পারে আর পারে না, তা নিয়ে নানা দুর্ভাবনা। বহু জল্পনা কল্পনা, সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকারের সংশয় আর সন্দেহে ভারাক্রান্ত সকলের মন। পনেরো মিনিট সময় মনে হয় কত দীর্ঘ সময়।

এমন সময় সকলেরই কান খাড়া হল। ঐতো শুকনো পাতার উপর দিয়ে হেঁটে চলার মর্মর শব্দ। হয়তো অমরেন্দ্র আর দীপ্তিমেধা আসছেন। নিশ্চিত হতে কেউ কেউ এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না, সব মায়ার ছলনা। হয়তো বন্য পশুর ছোটাছুটির শব্দ। তবে কি তাদের অগস্ত যাত্রা হল, মনে মনে সন্দেহ আর সংশয়।

অম্বিকাদা বল্লেন—বিপ্লব ইতিহাসে অনিশ্চিতের অপেক্ষায় হতাশ হওয়া এই প্রথম নয়। চারিদিকে প্রতিকূল অবস্থায় বাস করে বিপ্লবীকে কাজ করতে হয়। তাই বিপ্লবের পরিকল্পনাকে বিপত্তি কাটিয়ে নানা বাঁধন ছিঁড়তে ছিঁড়তে এগোতে হয়। বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবকে পরাজিত করে আকাঙ্ক্ষিত কর্মসূচীতে রূপ দিতে হয়। আজকের এই অঘটন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

তবে শোন—ঠিক পনেরো বৎসর পূর্বে ১৯১৫ সনে আজকের অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল বাংলার বাঘ বিপ্লবী যতীন মুখাজীর জীবনে। আজ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য যেমন দেশের স্বাধীনতা, সেদিন তাদের লক্ষ্যও ছিল "দূর হটাও পরাধীনতা"।

তাদের দৃষ্টি ছিল বিস্তৃত সমুদ্রের বুক জুড়ে প্রসারিত, বালেশ্বরের সমুদ্রতীরে বিদেশী অস্ত্র বোঝাই জাহাজের জন্য। বাঘা যতীন ও তার চারজন বীর সহযোদ্ধার সেই প্রতীক্ষার পরিণতিতে ইতিহাসে যে অসম-সাহসিক সম্মুখ যুদ্ধের রক্তাক্ত সংগ্রাম হয়েছিল সে কাহিনী আজ সুবিদিত।

"এসেছে আদেশ বন্দরে, বন্দনকালে এবারের মতো হল শেষ"

অম্বিকাদা যখন তাঁর মনোমত স্মারক কাহিনী শেষ করলেন তখন পাহাড়ের উপর গভীর নীরবতা বিরাজ করছে। সকলেই মৌন, সবাই ম্লান। দুশ্চিন্তার চিহ্ন, বিরক্তির ছাপ প্রত্যেকের চোখে মুখে। সকলের অন্তরের ভাবনা একরকম ; অমরেন্দ্র কেন এল না ? যা হতে পারে বা পারে না, সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকারের সংশয় সন্দেহে ভারাক্রান্ত সকলের মন। আটটাও বেজে গেল।

তবে কি তারা শেষ হয়ে গেল ? আতঙ্কিত হৃদয়ের শঙ্কিত জিজ্ঞাসা, জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখায় যে তাদের অবস্থান !

মাষ্টারদা বললেন—আর অপেক্ষা নয়, এবার এ স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়। ৯টা বেজে গেছে তবুও কোন সংবাদ পেলাম না। অমরেন্দ্রর না ফেরা আমার কাছে দুঃস্বপ্ন। মাষ্টারদার চোখের দৃষ্টিতে নৈরাশ্যের প্রতিবিম্ব।

"আবার যাত্রা হ'ল শুরু"

মাষ্টারদার সম্মতি নিয়ে অম্বিকাদা পাহাড় থেকে অবতরণের আদেশ দিলেন।

এত গোলা, বোমা ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে খাড়া পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসা এক কঠিন কসরৎ। একটু অন্যমনস্ক হলেই পা হড়কে একেবারে নীচে 'পপাত ধরণীতলে,' হাড় গুঁড়ো হয়ে ধুলোয় মিশে যেতে হবে। উপরন্তু নামার সময় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানেই শরীর বেসামাল হবার ভয়। সেই টান ও দেহের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন, ঐকান্তিক সতর্কতা। তাই অতি কষ্টে আর অত্যন্ত সাবধানে সবাই পাহাড় থেকে নীচে নেমে এলেন।

তখন চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সামনে কণ্টকাকীর্ণ ঝোপ-ঝাড়, কাঁধের বোঝার ভারে আনত দেহ। পথহীন পথে বাধা-বিঘ্ন ডিঙিয়ে অতি সন্তর্পণে সবাই অগ্রসর হচ্ছেন।

ক্ষীণদেহী মাষ্টারদাও অম্বিকাদার সঙ্গে চলেছেন। এই অনাহার আর পরিশ্রমের মধ্যেও তাঁর আচরণে গ্লানির আভাস নেই। শরীরে ক্লান্তির চিহ্ন-মাত্র নেই। পরম বিশ্বাস আর চরম ভরসার ইঙ্গিত তাঁর চোখে ও তাঁর সর্বাঙ্গে।

কঠিন কষ্টে এলিয়ে পড়বেন এমন তিনি বোধ করছেন না, যদিও তাঁর শরীর দুর্বল।

বিপ্লবীরা চলেছেন একই রকম রাস্তা ও ঘন সবুজ বনানীর মধ্যে দিয়ে। মনমুগ্ধকর ঢেউ খেলানো নৈসর্গিক শোভা আর পর্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়ে মাষ্টারদা চলেছেন আর ভাবছেন, এই আমার সুন্দর দেশ, ধনধান্যে পণ্যে পুণ্যে ভরা আমার সোনার মন্দির—স্বর্গভূমি, বিদেশী দস্যুর দৌরাত্ম্যে শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। দেশ গেল, রাজ্য গেল, শিল্প বাণিজ্য, ঐশ্বর্য গৌরব সব ধ্বংস বিধ্বস্ত হয়ে গেল, এখন মানুষ হয়ে জন্মাবার অধিকার টুকুও হারাতে বসেছি।

ন্যায় নীতি সত্যের দেশ আমার, অনাচারে ডুবে গেল। চারিদিকে কেবল ক্ষুধার সমুদ্র। পুলিশ আর মিলিটারীর ভয় দেখিয়ে ক্ষুধার জ্বালা ভোলাতে চাইছে ইংরাজ।

এই সমস্ত চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে ক্ষুব্ধ মনে সৌন্দর্যের লীলাভূমির মধ্য দিয়ে তাঁরা চলেছেন। মাথার উপরে তারা-ভরা আকাশ ও নিম্নে গভীর রাত্রি। চরাচর নিস্তব্ধ, নীরব বনভূমি।

কেবল শুকনো পাতার উপর দিয়ে বন্য পশুর যাতায়াতের মর্মর শব্দ মাঝে মাঝে রাত্রির মৌনতা ভঙ্গ করছে।

অভিযাত্রীরা আকাশছোঁয়া পর্বত রাশির পাদদেশ দিয়ে বন্ধুর পথে চলেছেন, পথে পথে পাচ্ছেন কণ্টকের অভ্যার্থনা। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছেন গুপ্ত সর্পের গূঢ় ফণা।

এইভাবে অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায় একটা মধুর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অর্ধেক সপ্তাহের অধিককাল কেটে গেল, কারও মনে কোন গ্লানি নেই, অসন্তোষ নেই, নেই কোন বিরূপতা। সবাই ম্লেচ্ছ ইংরাজদের মোকাবিলা করতে সমান অভিলাষী।

চলতে চলতে যখন আকাশের তারা জ্যোতিহারা হয়ে আসছে, অনেক উঁচুতে নীল আকাশে সাদা কালো মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছে, পাখীরা কলরব করে দিনের আগমনী গাইছে, তখন সেই আনন্দঘন মুহূর্তে রাজদ্রোহীরা একটি ছোট্ট পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামলেন।

ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই। তাই তাঁরা ধীরে ধীরে সামনের পাহাড়ে আরোহণ করলেন।

এই পাহাড়টি বিগত আশ্রয়গুলোর মতো আকাশচুম্বী নয়। পাহাড়টি আকারে ছোট, উঁচুতেও কম। প্রস্থেও খুব বিস্তৃত নয়। ছায়াযুক্ত গাছ একটিও নেই, আছে ছোট ছোট চারাগাছ, আর কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড়। মাথার উপরে ঝাঁঝাঁ রোদের উন্মুক্ত আকাশ, পায়ের নীচে তাপিত ধরণী। সামরিক দিক থেকে অসুবিধাজনক। এই স্থানে পেঁাছে সংগ্রামীরা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অথচ স্থানান্তরে গমনেও অনেক বিপদের আশঙ্কা। কারণ গ্রীষ্মের প্রভাতেই চাষীরা লাঙ্গল কাঁধে পাচনবাড়ি হাতে চাষের জোড়া বলদ তাড়াতে তাড়াতে মাঠে চলে এসেছে। গ্রামবাসীগণও যাতায়াত শুরু করেছে। এই অসময়ে অবস্থান পরিবর্তনে লোক জানাজানির যথেষ্ট ভয়। এতগুলো অপরিচিত সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত লোক সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তাদের সঙ্গের অস্ত্র-শস্ত্রও গ্রামের মানুষের কৌতূহল বাড়িয়ে দেবে। আর সেই অনুসন্ধিৎসা মুহূর্তে সর্বত্র বিস্তার করবে এবং তার পরিণতিতে বিপদ ডেকে আনবে না তা তো বলা চলে না।

তবে সমুদ্রের ঢেউ দেখে ডাঙ্গায় তরী ডোবাব কেন? তাই সেদিনের মত সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, যথারীতি কয়েকজন পাহাড়ায় নিযুক্ত হলেন।

সকলেরই দৃষ্টির সীমানার মধ্যে একটি ঝোপের পাশে বসে আছেন মাষ্টারদা। পাশেই রয়েছেন নির্মল সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী।

সকলের মধ্যে মাষ্টারদার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে; তিনি নির্ভীক, সৌম্য দর্শন। যেন পাথরের বুদ্ধমূর্তি।

২২শে এপ্রিলের এই হল প্রথম আলোচনা সভা। এই দেশপ্রেমিক যুদ্ধে আক্রমণকারী ব্রিটিশদের ধূলিসাৎ করে দেওয়ার সম্ভাবনা যে কত উজ্জ্বল সেটাই বর্ণনা করলেন মাষ্টারদা। তিনি বললেন—

"এই যে আগুনের টুকরো বালকেরা এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কষ্টের দিনেও তারা সকলেই ধীর স্থির, মুখে কথা নেই, ঠোঁটে নির্ভীকতার হাসি, তারা প্রত্যেকেই উদ্যম উৎসাহ আর অধ্যবসায়ের অফুরন্ত প্রস্রবণ। জানেন অম্বিকা বাবু, ধৈর্য, স্থৈর্য আর সহিষ্ণুতা মহাশক্তি রূপে তাদের সকলের অঙ্গে মিশে আছে। লক্ষ্য করার মত তাদের গুণ হল, আত্মপ্রত্যয় আর আত্মনির্ভরতার দ্বারা তারা আলস্য ও নিদ্রা হতে বিমুক্ত। তাদের যন্ত্রণা হল অমর্যাদাকর পরাধীনতা। এই যন্ত্রণাই তাদের অহর্নিশি দগ্ধ করছে। স্বাধীনতার চিন্তায়

আলোড়িত হচ্ছে তাদের সমস্ত সত্বা, তাদের অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সবই দেশপ্রেমে মথিত। তাদের চরিত্র অনুধাবনকরলে বুঝতে পারা যায় যে, তামাম ভারতবর্ষের দুঃখ আর্তিকে, দৈন্য-দুর্দশাকে তাঁরা নিজের বলে গ্রহণ করেছেন। যেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবন।' গোটা ভারতবর্ষের জন্যই তারা। তাদের এই উপলব্ধি সত্য।"

মাষ্টারদা স্বচ্ছ করে যা ভাবেন কোনও ভনিতা না করে স্পষ্ট করে তা বলেন। তাঁর প্রত্যেকটি শব্দে যে দীপ্ত ওজস্বিতা এবং বলিষ্ঠ প্রতীতির ঝঙ্কার তা সহজেই সকলকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

এই যে তাঁর চারপাশে বিপ্লবের মানস সন্তানেরা সমবেত হয়েছেন, অগ্নি-মন্ত্র দ্বারা বিপ্লব চেতনায় স্বাধীনতার যোদ্ধা হিসেবে তিনি তাদের সকলকে তৈরী করেছেন।

দাস্য সুখে হাস্য মুখে পর-পদলেহন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মনুষ্যত্ব, পৌরুষ ও বীরত্বের আদর্শকে উজ্জীবীত করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি মহৎ জীবনের প্রবলতম রিপু—দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতাকে দমন করে দেব-প্রতিম চরিত্র মহিমায় পাপের শাসনকে আর পাপীকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

তাঁর শিক্ষার মূল মন্ত্র ছিল—জীবনের সুখকে তুচ্ছ কর। তিনি দীক্ষা দিতেন—জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ভূমিকায় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অমিত তেজে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যকে প্রকাশ কর। বিপ্লব শক্তির বীজ সকলের মধ্যে রোপণ কর। আর এই বিপ্লব-ভাবকে পূর্ণতা দিতে শক্ত মেরুদন্ড নিয়ে দন্ড হস্তে দন্ডায়মান হও।

এই মানসিকতাকে কার্যে পরিণত করতে কল্যাণ-মন্ত্রের উদ্গাতা ছিলেন তিনি। আবার যেখানে বাধা বা বেড়া সেখানে আরও সক্রিয়। বাধা ভাঙার জন্য আরও উদ্দাম শক্তির যোগানদারও ছিলেন তিনি।

মাষ্টারদা এত বড় মহৎ ভাবনার ভাবুক ছিলেন যে—এই বৃহৎ ভারত-বর্ষের সকল ভাল মন্দকে তিনি স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলে দেশপ্রেমের প্রতি প্রেরণাপদ সকল মতকে যুগান্তর, অনুশীলন, শ্রীসংঘ বা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এমনকি কংগ্রেসের সঙ্গেও ছিল তাঁর যোগাযোগ। কোন দর্শন, কোন বিশ্বাসকেই তিনি আঘাত দিতেন না। সকলের মধ্যেই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতেন। আবার তাঁর

বীরাচার সাধনাও সকলকে অভিভূত করত। তিনি ছিলেন সকলের আশীর্বাদ-ধন্য।

১৯৩০ সালের ২২শে এপ্রিল মঙ্গলবারের সকাল ৭টার এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে গত রাত্রে দীপ্তিমেধা ও অমরেন্দ্রকে কেন্দ্র করে সকলের মনে যে জিজ্ঞাসা রয়েছে, যে অবিশ্যাস্য ভাবনা কাঁটা হয়ে সবার মনে বারে বারে ফুটছে, সে বিষয়ে মাষ্টারদার অভিমত জানতে অনেকেই উদগ্রীব। এই উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য নিয়ে প্রায় সকলেই তাঁর চারপাশে এসে মিলিত হলেন।

মাষ্টারদা তো শুধু নেতা নন, তিনি হলেন তাদের সর্বদুঃখহর আশ্রয় ছায়া। মাষ্টারদা সমবেত সহযোদ্ধাদের চারপাশে দেখে তাঁদের মানসিক যন্ত্রণা বুঝে নিলেন। সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন— দীপ্তিমেধা ও অমরেন্দ্রকে নিয়ে তোমাদের মনস্তাপ, কিন্তু যাতে অমৃত নেই তা দিয়ে তোমরা কি করবে? জানো, আমার বিপ্লবের সাধনায় প্রবঞ্চনার স্থান নেই। দেশমাতা ফাঁকি সইতে পারেন না। বলতে পার নিষ্ঠাবান সাধক কখনও দুর্বল হয়? হয় না। সে যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জনকল্যাণের উদ্গাতা। বিপ্লবীর লক্ষণ কি? তার কান সব সময় ধ্বংসের মধ্যেও সৃষ্টির গান শুনতে চায়। তার জিভ শুধু বিপ্লব কথা বলতেই আগ্রহী। ভয় কাকে বলে সে জানে না। সে জানে যেখানে পাপ সেখানেই প্রতিকার আর প্রতিবিধানে দুর্জয় শক্তি নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

দৃঢ়তর কণ্ঠে তিনি বললেন— তোমরা শোন, আমার কথা কোন সংস্কার নয়, আমার বাণী হল-মনুষ্যত্ববোধের মর্মবাণী,— আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ক-প্রসূত চিন্তারত্ন। তাই বলছি, বাঁধন ছিঁড়বার সময় হয়েছে। সুতরাং তোমাদের ওপর কঠিন কাজের পর কঠিনতর সংগ্রামের দায়িত্ব ন্যস্ত হবে।

শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে গিয়ে বাধা-বিঘ্ন, বিপত্তি ও সমালোচনা অগ্রাহ্য করে ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য অবলম্বন করে অসীম উৎসাহ আর অধ্যাবসায়ের দ্বারা তোমাদের বাধার লৌহকপাট ভাঙতে হবে। শুধু আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে আত্মোৎসর্গের দ্বারা কঠিন হতে কঠিনতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। জটিলতা অসুবিধা হতাশ করবে না। মৃত্যু? সে তো তুচ্ছ বস্তু। জীবন তো শুধু ইন্দ্রিয়ভোগের অকিঞ্চিৎকর প্রলোভন। একমাত্র বিজয়ই সারবস্তু।

মাষ্টারদার কথায় সকলের মন নাড়া দিল।

রক্ষীদল স্বীয় কর্তব্য শেষ করে ফিরে এলেন। তাদের শরীর রৌদ্রদগ্ধ,

পরিচ্ছদ ঘামে ভিজে। হাতের রাইফেল তপ্ত। বৃক্ষছায়ায় এসে বিশ্রাম চায়, শুনতে চায় মাষ্টারদা'র প্রেরণাবাণী।

অনুগামীদের অনুরোধ রক্ষার্থে মাষ্টারদা বললেন,— "যারা আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে, আমাদের ক্ষুধার খাদ্য, লজ্জার কাপড় কেড়ে নিয়েছে, দেশকে চরম দারিদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, তাদেরই রইল আমাদের হত্যাকরার অধিকার আর আমাদের আপন দেশে নিজের জন্মভূমিতেও আমাদের ঠাঁই নেই। জান, বিদেশীর আইনে মানুষের মৌল অধিকারগুলোই সবচেয়ে বেশী করে পদদলিত। ব্রিটিশেরা চায় না, আমরা মানুষ হয়ে বেঁচে থাকি। তারা ভাবে ভারতবাসী তো ক্রীতদাসের জাত।"

এই কথা বলার সময় মাষ্টারদার ভেতরটা যেন ক্রোধে জ্বলে উঠল। তিনি রাগে গরগর করে বললেন,— আমার বিপ্লবের লক্ষ্য হল—প্রবলের গায়ের জোরে অক্ষম দুর্বল যেন তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। আর আমাদের মনুষ্যত্ববোধকে যেন কেউ ভয় দেখাতে না পারে। আমরা যেন দুঃখ লাঞ্ছনা, কষ্ট তুচ্ছ করে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে হাসিমুখে মনুষ্যত্বের জয়গান গেয়ে যেতে পারি।

তোমরা আমার অন্তরের বাণী মন দিয়ে শোন। যে চিন্তায় আমার দিন যায়, যে স্বপ্নে আমার রাত্রি ভোর হয়, তা হল সক্ষম ভারতের অভ্যুত্থান—

যে পুণ্যে হবে ভারতবর্ষ বীর্যবান, হৃদয়বান, তেজস্বী, বিশ্বাসী, অকপট মানুষদের বাসস্থান। যারা দেশপ্রেমিক হবে, যে প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করবে।

আর যাকে আমি পূজা করি, তা হল এদেশের দরিদ্র মানুষ। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, গৃহহীন, সর্বস্বান্ত মানুষই হল আমার নারায়ণ। অনাহারে ক্লিষ্ট, অপুষ্টিতে রুগ্ন, অস্থি চর্মসার দেশবাসীই আমার দিবা-রাত্রির আরাধ্য দেবতা।

কিন্তু এদেশে একদিন সোনা ফলত। পুকুরভরা মাছ, গোয়ালে দুধ, গোলাভরা ধান থাকত। বারো মাসে তেরো পার্বণ, নারায়ণজ্ঞানে অতিথি আপ্যায়ন, দোল, দুর্গোৎসবে, কীর্তন মহোৎসবে ভারত মুখরিত থাকত। সেই সুখের দেশে শ্বেতদস্যু এসে সব ছারখার করে দিয়েছে।

"আমার অন্তরের বাসনা দেশ-প্রেমের সঙ্গে দেশ সেবাকেও সংযুক্ত করে বিপ্লবী দলকে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত মানুষের জীবন যুদ্ধের হাতিয়ার করে

গড়ে তুলতে হবে। সংকীর্ণ স্বারত্ত শাসনের চিন্তা থেকে দেশকে উদ্ধার করে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশকে পূর্ণ স্বাধীনতার চিন্তায় জাগাতে চাই আমি।

তাই দেশপ্রেমে পূর্ণ তোমরা এই লড়াইয়ে লড়বে, আপ্রাণ লড়বে, জীবনভর লড়বে। লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সুন্দর হয়ে ফুল হয়ে ফুটবে। তোমাদের মুক্তি চাই? ভোগে মুক্তি আসে না ভাই! মুক্তির পথ তৈরী হয় ত্যাগের মধ্য দিয়ে। আবেদন আর খোসামোদে বন্ধন মুক্তি হয় না, তাকে উপার্জন করতে হয় পৌরুষের মূল্যে, শুধু বীরই বিজয়মাল্যের অধিকারী হয়, তা জানো?"

তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— "তোমরা বলতে পারো জাতির শক্তির উৎস কোথায়?" প্রশ্নকর্তাই এই প্রশ্নের সমাধান করলেন। বললেন— "মহৎ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শই জাতীয় শক্তি প্রতিষ্ঠা করে। আর সেই শক্তিতেই জাতীয় প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। জাতির হৃদয়ের মর্মস্থলও সেখানে।"

"জানো, আমার বিপ্লবের সাধনা চলে শত্রুর অজ্ঞাতে ও দুষ্টলোকের চোখের অন্তরালে। নিশির শিশির বিন্দু যেমন অদৃশ্যভাবে পতিত হয়ে রাশি রাশি ফুল কলিকে ফুটিয়ে তোলে, আমার তপস্যাও নীরবে মুক্তি পাগল মানুষকে আমার সর্বকর্ম চিন্তা ভাবনার বিগ্রহ করে তৈরী করে।"

"তবে হ্যাঁ, এই বিপ্লব শক্তি স্রোতস্বতীকে চিরস্রোতা রাখতে নিরন্তর অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। আত্মতুষ্টির স্থবিরত্বকে ক্ষণিকের জন্যও প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।"

"পরহাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে রহো লৌহনির্ম্মিত হার বুকে"

কে গো তুমি আলো ঝলমল করা প্রস্তর বিক্ষিপ্ত সুউচ্চ পর্বতে বসে তোমার রাজসভা চালাচ্ছ! তুমি অস্নাত, অভুক্ত, তবুও তোমার জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে চারিদিকে। তোমার চিন্তার বিরাম নেই, মন তো উড়েই চলেছে।

কে তুমি? এই ধূলার ধরণীতে নেমে এসেছো কোন্ দেবলোক বা স্বপ্নলোক থেকে? তোমার সভাকে রাজসভাই বলব। ভারতের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাই এই রাজসভায় প্রবেশের একমাত্র ছাড়পত্র।

প্রেরণার এই বিরাট চৌম্বক শক্তির আধার, বরেণ্য পুরুষ প্রবরটির নাম নির্মল কুমার সেন। তাঁর ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা যে কত গভীর, প্রকৃতিগত সাধনা যে কত যোগযুক্ত এই ক'দিনের অভিযানে তার চাক্ষুষ প্রমাণে সঙ্গীরা বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় হতবাক।

এই পরম শ্রদ্ধেয় নেতা নির্মলদা যুক্তি ও উদাহরণ উল্লেখ করে অত্যাচারীর পরিণাম বর্ণনা করলেন তিনি বললেন,— "এটা শতসিদ্ধ সত্য যে, কোন অত্যাচারীই বেশীদিন তিষ্ঠোতে পারে না। যেমন পারেনি মহম্মদ ঘোরী, পারেনি নাদির শাহ। অন্য দেশের ইতিহাসও এই সাক্ষ্য দেয়। গ্রীসের এমন একদিন ছিল যখন তার বীর বাহিনীর গর্বিত দর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হত। আজ সেই দর্পিত শক্তির চিহ্ন মাত্রও নেই। রোমের প্রভুত্ব একদিন সারা ইওরোপ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। আজ তারা কোথায়? সীজারের বাহিনী যে ক্যাপটো-লাইন গিরি থেকে দোর্দন্ড প্রতাপে পৃথিবী শাসন করতো তা আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

তারপর তিনি দৃপ্তকণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন,— শত অনাচার, ব্যাভিচার আর অত্যাচারে কণ্টকিত বিরাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও একদিন জল বুদ্বুদের মতোই বিলীন হয়ে যাবে। তোমরা জানো, দেশ এখন বিক্ষুব্ধ রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গাঘাতে উদ্দাম। দেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর হৃদয় পরাধীনতার অনলে দগ্ধ। এই দহন জ্বালা নির্বাণে যে জীবনপ্রদ বারির প্রয়োজন তা এখান থেকে, এই চট্টগ্রাম থেকেই প্রবাহিত হবে।

জানি, এতে অনেক বাধা আসবে, পর্বত প্রমাণ সমস্যার উদ্ভব হবে, তবে আমার সঙ্গে আছেন জনসাধারণ, আর আছো তোমরা। আমার অগ্নি-শুদ্ধ ভাইয়েরা, তোমরা শরীরের রক্তের বিনিময়ে, এমন মহৎ আর নির্ভীক আদর্শের সৃষ্টি কর যা লক্ষ্য করে বর্তমানের কল্যাণকামী, দিশেহারা পথ ভোলা মানুষ পাবে সাহস ও প্রেরণা। পাবে সঠিক পথের সন্ধান। তোমরা এমন কাহিনী রচনা কর যা ভাবী কালের মায়েরা তাদের সন্তানদের কাছে বলতে গর্ববোধ করবে। যে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আগামী দিনের দেশপ্রেমিক নাগরিক মেরুদন্ড সটান করে দাঁড়াতে পারবে। তবে যা করবে তা যেন সত্যরূপে প্রতিভাত হয়—নিখাদ সত্য।"

এরপর নির্মলদা ইংরেজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় মনোযোগ দিলেন। এই বর্ণনা হল তাঁর প্রপিতামহের নিকট শোনা কাহিনীর স্মৃতিচারণ। তিনি

বললেন—নিজেদের রাজার জাত ভেবে যে সমস্ত অতি গর্বী ইংরেজের মাটিতে পা পড়ে না তারা আকারে মানুষ, ব্যবহারে বনমানুষ মাত্র। অসামান্য মিথ্যা আর ধাপ্পাবাজির মূর্ত বিগ্রহ। অপরকে লাঞ্ছনা-বঞ্চনা তাদের মজ্জাগত সংস্কার, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তারপর সকলের প্রতি তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করে প্রশ্ন করলেন, "বলতে পার মানুষের শত্রু কারা?" সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন —"ইংরেজ"। নির্মলদা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন,—"শুধু শত্রুই নয় মানুষকে অমানুষ বানাবার অতি চতুর যাদুকর, রাসপুটিন। এই ইংরেজ যাদুর ইন্দ্র-জালে মুর্শিদাবাদের উজির মিরজাফরকে উজবুক করেছিলো। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন টুম্বের সর্বত্যাগী ফকিরকে ফিকিরে নামিয়েছিল। দরবেশকে করে-ছিল দানব। প্রথমে নন্দকুমারকে 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত করে পরে ফাঁসিতে লটকালো। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলিশা'র ধনমান সব নিলো, নির্বাসিত করলো। তবুও কাগজে কলমে, সম্বোধনে তিনি 'নবাব'। এত বড় ধূর্ততা ইংরেজ চরিত্রের বাইরে কোথাও পাবে কি?"

"কী কলঙ্কিত ঘটনায় মসী লিপ্ত ইংরেজ শাসনের ইতিহাস। যা মনে পড়লে মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়। যে দেশ ছিল ধর্মের লীলাভূমি, দস্যুর হাতে পড়ে তাই পরিণত হল দানবের ক্রীড়াভূমিতে। বড় দুঃখের বিষয়. ভারতের বুকে বারে বারে সেই দুর্দৈবের চক্র ঘূর্ণিত হচ্ছে এখনও।

নির্মলদা অনেক নতুন কথা শোনালেন। যা আমরা জানতাম না, যা দেখিনি, শুনিনি, পূর্বে কখনও ভাবিনি। তিনি সেই সব ঐতিহাসিক কাহিনীর বর্ণনা দিলেন।

"১৯১৪ সালের ১ম বিশ্বযুদ্ধের চাপে ভারতবাসীর জীবনে মহা দুর্যোগ নেমে আসে। তাই তিনি বলেন, এই যুদ্ধ ছিল ভারতের স্বার্থের পরিপন্থি, ভারতের পক্ষে এক মারাত্মক অভিশাপ। বাটপাড় ব্রিটিশ নিজের স্বার্থে, ভারতবাসীর অসম্মতিতে ষড়যন্ত্র করে ভারতকে এই বিধ্বংসী যুদ্ধে জড়িত করে। সরকারের নির্দেশে বিকানীরের মহারাজা, মধ্যপ্রদেশের গভর্ণর জেনারেল স্যার জেমস্ মেষ্টন, বাংলার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ ইংল্যাণ্ডে ওয়ার কনফারেন্সে যোগ দেন। এই তিন ব্রিটিশ ভক্ত ভাড়াটিয়া প্রতিনিধি ব্রিটিশের আর্থিক স্বার্থের পক্ষে ভারতের হয়ে ভোট প্রদান করেন। এই ষড়যন্ত্রে ভারত-বাসী বিচলিত হলেন। দল, মত, পথ নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের মানুষ এই হীনমন্যতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানালেন।

এই অনভিপ্রেত চক্রান্ত ভারতের ভাগ্যে মহা অভিশাপ হয়ে দেখা দিল। ভারত থেকে ব্রিটিশ ১৫ লক্ষাধিক ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে এবং ১৯১৭ সালে ১৫০ কোটি টাকা এবং ১৯১৮ সালে ৬৭ কোটি টাকা দান হিসেবে ভারতবর্ষকে দিতে বাধ্য করল। আবার বিশ্বযুদ্ধের বিপুল খরচ বহন করার ও বিরাট সেনাবাহিনীর খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করার দায়িত্বও ভারত সরকারের অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণের উপর আরোপ করল। পরাধীন দেশ এই সর্বনাশা আদেশ মানতে বাধ্য হল। খাদ্যশস্য কাঁচামাল ও খনিজ-পদার্থ যুদ্ধের জন্য ভারতের বাইরে পাচার হতে লাগল। যুদ্ধবাজ বৃটেনের ঋণের সুদের পয়সা জোগান দিতে ভারতের সর্বসাধারণ দেউলিয়া হল।

যুদ্ধের এই কালান্তক কুফলে হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখামুখি এসে দাঁড়ালেন।"

নির্মলদা এরপর এ্যানি বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতারণার ও কূটনৈতিক দূরদর্শিতার বিষয়ে বিশ্লেষণ শুরু করলেন। এই এ্যানি বেসান্ত ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। কুটিল চক্রান্তের ধাপ্পাবাজ রাজনীতিজ্ঞ। তাঁর হোমরুল আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি ছিল এক বিরাট ফাঁকি। এই হোমরুল ছিল শুধু আলেয়া। এই ধূর্ত মাদ্রাজবাসিনীর সম্মোহিনী চালে নব্য-পন্থী, প্রাচীন-পন্থী, প্রগতিশীল, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ সবাই এসে ধরা দিল। এমন কি বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, সুরেন ব্যানার্জীর মত অতি বিচক্ষণ নেতাগণও বেসান্তের পাতা ফাঁদে বাঁধা পড়লেন।

"এই মোহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করেন পুনার বিনায়ক সাভারকর আর বাংলার বীর বিপ্লবীবৃন্দ। বাংলা তখন উত্তাল। তাদের হোমরুল চাই না। তারা সোচ্চার—স্বায়ত্বশাসন নয়, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস? অতি তুচ্ছ। বিপ্লবীদের একমাত্র কাম্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। সর্বাত্মক মুক্তি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন হতে মুক্তি। এই মুক্তিরই প্রস্তুতি চলেছে, দিকে দিকে। সেই রাজনৈতিক চেতনার ফলে সিঙ্গাপুরে শিখ সৈন্যগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। এবং সাতদিন সিঙ্গাপুরকে স্বাধীন রাখলেন। সেই সময়ে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে ইবাক ইচ্ছুক হয়। ইরাকস্থ ভারতের বন্দী সৈন্যগণ ভারতের স্বাধীনতার জন্য এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ আফগান আমীরের সহযোগিতায় আফগান সীমান্তে ভারতের বিপ্লব পরিকল্পনা নিয়ে গঠন করেছেন এক স্বাধীন সরকার। আবার পূর্ব-এশিয়াতেও বিপ্লব উদ্যোগের ধুম পড়ে যায়।

১৯০৭ সালে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার সাহায্যে হেমচন্দ্র কানুনগোয় ভারতের স্বাধীনতার জন্য বোমা তৈরী শিখতে প্যারিসে যান। চতুর্দিকে বিপ্লবের সাজ সাজ চঞ্চলতা। এই তো হল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর বন্ধু রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বতন্ত্রতা সংগ্রামের বহির্বিশ্বের আন্দোলনের ছবি। দেশের অভ্যন্তরও তখন অগ্নিগর্ভ। গৌহাটি থেকে লাহোর পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র জনগণ বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা রূপায়নে প্রদেশে প্রদেশে ব্যস্ততা। সংগ্রাম-পরিস্থিতি প্রস্তুতির শেষ বিন্দুতে উপনীত। ছোটলাট ফ্রেজারের ট্রেন ওড়াবার দু-বার চেষ্টা, ঢাকার জেলা শাসক অ্যালেনকে হত্যারও চেষ্টা হয়ে গেছে। বাংলার বিপ্লবীরা যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে জার্মানী থেকে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা করছেন। দেশের এই দাবদাহন 'কমন উইলস্', 'নিউ ইন্ডিয়া', তিলকের 'কেশরী' ও 'মারাঠা' পত্রিকায় স্ফুলিঙ্গের ভাষায় পরিবেশিত হতে লাগল।

"ভারতের এই দাহ্য বাতাবরণে প্রাদেশিক সরকারগুলো ভাবনায় পড়ল। যুদ্ধে লিপ্ত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এখন এ জাতীয় আন্দোলনের ফলে ইংরেজের বিশ্বযুদ্ধ জয়ের আশা দূরে থাক, রত্নগর্ভ ভারতে ব্রিটিশ শাসনই সম্পূর্ণরূপে বিপন্ন হবে। এই সর্বনাশের সম্ভাবনায় ভারতবাসীকে স্বপক্ষে টানবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। তবে তা দেওয়া হবে যুদ্ধের পরে। শকুনির চালে উদারপন্থীরা কুপোকাত হলেন। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে লাগল। মহাত্মা গান্ধী তো গুজরাটের গ্রামে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহে নিযুক্ত হলেন।"

"মনুষ্যত্বের পরম শত্রু ইংরেজকে কিন্তু বাংলার তরুণ-তুর্কীরা চিনতে ভুল করলেন না। তাদের ফাঁদে পাও দিলেন না। এই নির্ভীক দেশভক্তদের এত বড় অবাধ্যতা তো আর ব্রিটিশ সরকার সহ্য করতে পারে না। তাই বীর বিপ্লবীদের দেশভক্তিকে তিলে তিলে পিষে মারতে আর বিপ্লবকে ব্যাহত করতে জারী করল কালাকানুন "ভারতরক্ষা আইন"।

সভ্যতার মুখোশ পরে এত বড় মারাত্মক ব্যক্তি-স্বাধীনতা-বিরোধী বিধি-নিষেধ আর কেউ কখনও কোথাও তৈরী করেনি।

দেশবাসীর আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা ও দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার অপরাধে পরাধীন দেশের দেশপ্রেমিকগণ এই কু-আইনে কারারুদ্ধ হলেন। যুদ্ধান্তে হোমরুল এর ফলস্বরূপ জালিওয়ানয়ালাবাগের হত্যাকান্ড ঘটল ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯ সালে।

যুদ্ধোত্তর ভারত কিছু সুযোগ সুবিধে পাবে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় উজ্জ্বলতর হবে, এই সুখস্বপ্নে লালিত হয়ে যুদ্ধক্লিস্ট ব্রিটেনকে ভারতবর্ষ অর্থ দিল, স্বার্থ দিল, জীবন দিল, সর্বস্ব দিয়ে যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করল। অনেক খ্যাতকীর্তি নেতাও ভুলে গেলেন যে স্বার্থসাধনে ও বিশ্বাস-ঘাতকতায় এই যুদ্ধবাজ বেণিয়া জাত অতি দক্ষ।

আবার পলাশীর পুনরাবৃত্তি হল। আপৎকালে দেওয়া আশ্বাস, যুদ্ধ শেষে অকৃতজ্ঞ ইংরেজ বেমালুম ভুলে গেল। মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার, ভারতবাসীকে ভিক্ষে হিসেবে দেওয়া হল। মহম্মদ আলি জিন্নার মত প্রতিক্রিয়াশীল নেতাও যাকে বিরক্তিকর বলে অভিহিত করলেন।

রক্তাম্বুধি করিয়া মন্থন তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন

যে বাক্যসুধা পান করে এই তরুণ দেশহিতৈষীগণ আজ তিন দিন যাবৎ পেটের ক্ষুধা ও কণ্ঠের পিপাসার কষ্ট ভুলে আছেন সেই কথামৃত পান করার আশায় তাঁরা মাষ্টারদাকে ঘিরে বসলেন।

সরলতার প্রতিমূর্তি, অতি সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, মাষ্টারদা তাঁর স্বভাবদত্ত গম্ভীরতার সঙ্গে, ব্রিটিশ কূটনীতি বিশ্ব-রাজনীতিতে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাদের শোষণমুখী অর্থনীতি ভারতের মাটিতে কতটা গভীরে শেকড় গেড়েছে তা আবেগময় ভাষায় বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন,—তোমরা অনেকে জানো না, যারা অর্থনীতির ছাত্র, তারা হয়ত এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা কর যে ব্রিটিশ অর্থনৈতিকভাবে আত্মকেন্দ্রিক। সে যতই পাচ্ছে পাওয়ার আকাংখা তার ততই প্রবল হয়ে উঠছে। ভারতের দুর্দশা থেকেই বোঝা যায় এই প্রবৃত্তি কত সর্বগ্রাসী। অপরদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে ব্রিটিশ তার অধিকার বিস্তার করেছে। ব্রিটিশের এই পররাজ্য

লিপ্সা সারা বিশ্বে এক মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এবং তার হঠকারী সামরিক তৎপরতা সুস্থ উন্নয়নশীল কর্মধারাকে বাধা দিচ্ছে।

তাই ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে কোনও সরকারী অর্থকরী পরিকল্পনা রচিত হয়নি। তাদের বন্ধ্যা অর্থনীতিই দেশের দুঃখের হেতু।

তিনি বর্তমানের সংকটজনক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে ওাঁ ঝাঁঝাল-স্বরে বললেন—বর্তমানে ভারত উৎপীড়িত ও ক্লিষ্ট কারণ, ভারত ব্রিটিশের শোষণের কেন্দ্রবিন্দু।

তিনি উদ্দেশ্য করে বললেন,—"তোমরা সকলেই জান যে আমাদের দেশ সর্বতোভাবে ধর্মের উপর নির্ভরশীল। এই পবিত্র ধর্মক্ষেত্রকেও কপট রাজ-নীতিবিদগণ সাম্প্রদায়িকতার তীব্র হলাহলে বিষিয়ে তুলেছে। রাজনীতির কলকাঠিও ধর্মান্ধদের দ্বারা চালিত হচ্ছে। কেবলমাত্র বিপ্লববাদ এই অনৈতি-কতা দ্বারা কলুষিত হয় না। পরে আরও জোরের সঙ্গে বললেন—আজ আমার এই কথা দিন ও রাত্রির মত সত্য যে পরাধীন দেশগুলির বিপ্লবছাড়া আর কোনও উপায় নেই।"

এই আলোচনা এখানেই শেষ হল। তারপর শীর্ষনেতাদের মন্ত্রণাসভা আরম্ভ হল।

সময়টা ছিল সকালবেলা, ভোরের আলো মাত্র ফুটে উঠেছে, মাসটা ছিল বৈশাখ। নব-বর্ষের প্রভাত সূর্য রুদ্ররূপে উদয় হয়েছে। রাঙা রৌদ্রে তাঁদের সর্বশরীর ছিল স্নাত। তাঁদের মলিন বেশ, আলুথালু কেশ, কিন্তু অন্তরের জ্যোতিঃস্পর্শে তাঁদের আশাদীপ্ত মুখমণ্ডল। শরীরের সর্বত্র পৌরুষের প্রকাশ।

অম্বিকাদা ওজোস্বিনী ভাষায় ঘোষণা করলেন,—আমাদের সাধনা হল লোক-মঙ্গল। আমাদের স্বপ্ন হল ভারতীয়ভাবে ভারত গঠন। আমরা দ্বিধাহীনভাবে মনে করি—ভারতের জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বিবর্তন। বিবর্তনের জরুরী সংস্করণই হল বিপ্লব। তোমাদের সংগঠনটি আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু তার বৈপ্লবিক আদর্শ বিরাট।

কেবল অমূল্য জীবন বলিদান করেই এই অমূল্য রত্ন লাভ করা যায়। তিনি ক্ষুব্দ কণ্ঠে সকলকে জানাইয়া দিলেন—জান? বিগতশ্রী বিধ্বস্ত ভারত আজ 'দাস' ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই দাস্য-বৃত্তির বিনাশ যজ্ঞে চট্টগ্রাম হবে অগ্নিহোত্রী।

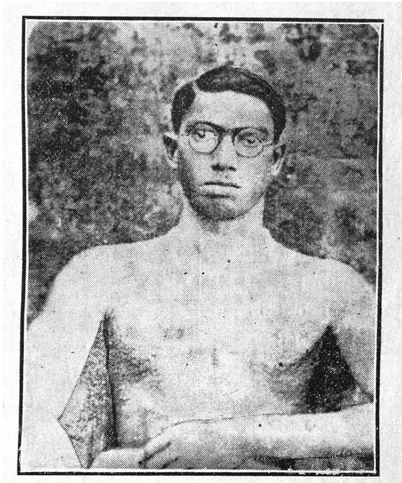
তবে হাঁ, এই রাজসূয় যজ্ঞ সহজ কাজ নয়। এই দুঃসাধ্যকে সহজ সাধ্য করতে প্রয়োজন সাহস, উদ্যম, অফুরন্ত ইচ্ছাশক্তি আর চাই যে কোন বাধাকে অগ্রাহ্য করার মত দৃঢ় মনোবল, চাই একতা, বিশ্বাস বলিদান।

মাষ্টারদা মন্তব্য করলেন—বিপ্লবের নিরলস সন্ধানে মানুষের জীবন পালটায়। কাজ পালটায়, প্রতিটি মুহূর্ত পালটায়, তাই দলটি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্মে ও চিন্তায় খাঁটি একটি সর্বোতোভাবে বিপ্লবী সংগঠন অক্লান্ত শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। শক্তি-সমৃদ্ধ তার সদস্য বৃন্দ। এ আমার আকাশ কুসুম কল্পনা নয়, নিখাদ সত্য। আমার বিশ্বাস এই যুগান্তরকারী বাহিনীই হবে বিপ্লবের অগ্রদূত। যুক্তি সঙ্গত করণেই এই গৌরবের সে অধিকারী।" নির্মল সেন বল্লেন, "আমি আমার বিপ্লবী জীবনের অভিজ্ঞতা, বন্দীজীবনের স্মৃতি এবং বিভিন্ন সংগ্রামীদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগে জানি যে দিনের নক্ষত্রের মত ভারতের মহাকাশে লোক চক্ষুর অন্তরালে বিপ্লব নক্ষত্রগণ বিপ্লবী আলো বিকিরণ করছেন। সেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগণ দেশের এই দুর্দিনে ঘোরতর অন্ধকারে জাতিকে পথ দেখাবে।" দলের নেতাগণ সকলেই নির্মলদাকে সমর্থন করলেন। তিনি সকলকে জানিয়ে দিলেন—দেশ এখন সুপ্ত আগ্নেয় গিরি। বিস্ফোরণের অপেক্ষায় নীরব। তিনি আরও বল্লেন—"চট্টগ্রাম অখ্যাত স্থান, তা সত্ত্বেও পূর্ব দিগন্তের অল্প-খ্যাং চট্টলভূমি হইতেই ভারতের স্বাধীনতার বিপ্লব সূর্য উদিত হয়েছে। একদিন এই নগন্য চট্টগ্রাম এই বিরাট ভারতের সমগ্র বিপ্লবী রক্তকে সর্বনাশা নেশায় মাতাল করে তুলবে। মুক্তিমন্ত্রের উদ্যোক্তা চট্টগ্রাম বিপ্লবী আহ্বান জানাচ্ছে—"স্বাধীনতা জাতির এক মহামূল্য সম্পদ। নির্মল সেনের আপ্ত বাক্যে শেষ হতে না হতেই মাষ্টারদা তাঁর প্রাণকৃষ্ণদের মনোরঞ্জন করতে গলার সুর এক পর্দা উঁচুতে তুলে দৃঢ়তার সঙ্গে ওজস্বনী ভাষায় বল্লেন—"দুশ বৎসরের গোলামীর লোহার শিকলটা ছিঁড়তে হবে। হউক না বন্ধুর, হউক না, ভয়ংকর, বিপ্লবের পথেই দেশকে মুক্তির তোরণ দ্বারে উপনীত হতে হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা জান, বিপ্লবী অসম্ভব আর অবাস্তব বলে কিছুই জানে না ; মানে না।

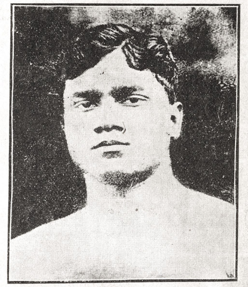
তবে হাঁ, এই কঠিন জিঞ্জির ছিঁড়তে হলে শক্তির দরকার। আত্মশক্তির। দেহ মন, প্রাণ নিঃশেষে দান করার মত আত্মশক্তির আর এই শক্তির জন্য চাই সাধনা, গভীর আরাধনা। সে জন্য দরকার সততা ও আদর্শবোধ।



সূর্য সেন (মাষ্টারদা)
(সর্বাধিনাযক চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ)



অনন্ত সিংহ



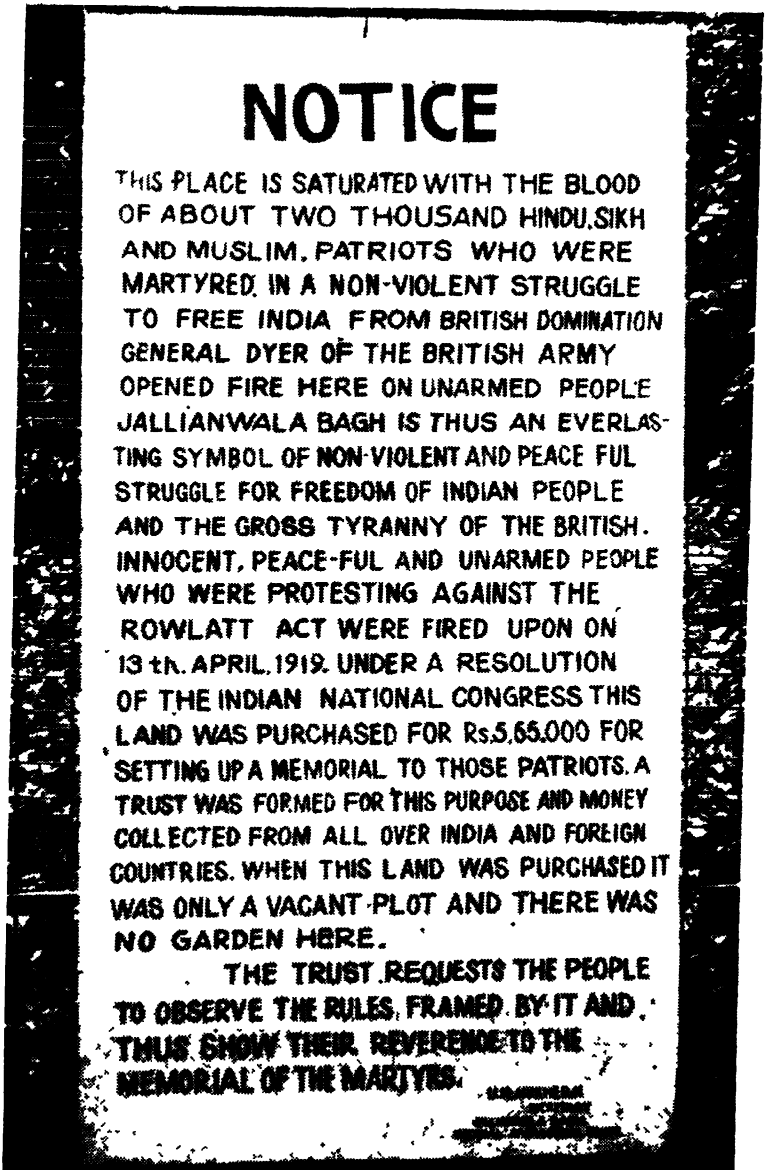
লোকনাথ বল



অম্বিকা চক্রবর্তী



গণেশ ঘোস



নরহত্যার স্মারকলিপি

ফটো ঃ শ্রীস্ফটিক উপাধ্যায়, জন্ন ১৯৮৭ সেক্রেটারি শ্রী ইউ, এন্, মুখোপাধ্যায়

পরপর তিনি আধুনিক সাধণার দুটি অতি সত্য উদাহরণ উল্লেখ করে বললেন,—যোগাভ্যাসে নরেন্দ্র বিবেকানন্দ হতে পারেন, দেহপ্রাণ লয়কারী তপঃ-প্রভাবে মূর্খ গদাধর পরমহংস রামকৃষ্ণ হয়ে যান।

এরপর জিজ্ঞাসু নয়নে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন ও তিনি জানতে চাইলেন.—তোমরা পারবে কি সেরূপ কৃচ্ছ্র সাধনে দেশের জন্য জীবন, যৌবন ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, দেহ, মন, প্রাণ সব বিলিয়ে দিতে ? আমি নিঃসন্দেহ, দেশহিত ব্রত সাধনা কোন তপস্যা হতেই ছোট নয়।

২১শে এপ্রিলের দ্বিতীয় বৈঠক

সেদিন মাষ্টারদার চারপাশে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন উৎসাহী শ্রোতা, জ্ঞানপিপাসু অনুগামীগণ নেতাদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন, এবং বিন্দু বিন্দু মধু আহরণ করে স্বীয় জ্ঞান-ভান্ডার পূর্ণ করতেন। তাই, দাদারা বলতে যত উৎসাহী ছিলেন ভাইরা তার চেয়েও অনেক বেশী কৌতুহলী ছিলেন শুনতে। অজানা কত কি জানতে পারছেন। ইংরেজ শাসনের যে রহস্য কোনদিন শোনেনি তা তাঁরা শুনে চরিত্র-হীন ইংরেজ রাজপুরুষদের ফলাও ভ্রষ্টাচারের মর্ম বুঝতে পারছেন।

মাষ্টারদাও চোখের চাহনী কপালের রেখা দেখেই সহ অভিযাত্রীদের অন্তরের অবরুদ্ধ অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন। প্রাণপ্রিয় তরুণদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে তিনি ধীরে ধীরে শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন,—তোমরা মনোস্থির করলেই উপলব্ধি করতে পারবে, যে মানুষ যখন জেগে ওঠে তখন তার অনায়াস লভ্য সব সখ ছারখার হয়ে যায়। তখন সে অকুণ্ঠ চিত্তে পরমার্থে দেশের কল্যাণে নিজেকে দান করে দেয়। যখন সে জানতে পারে, যে এই প্রাচুর্যে ভরা ভারতেও মানুষ অনাহারে মরে, শিশুরা ক্ষুধা নিয়ে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন সে ভাবে দুঃখের তপস্যাই আমার তপস্যা। সুখ আমার চাই না, সুবিধায় আমার প্রয়োজন নেই, আনন্দে আমার অধিকার নেই। তখন সে দেশকে ডাক দিয়ে জানিয়ে দেয়, যে এই লক্ষ্মীর ভান্ডারেও ক্ষুধা, অনাহার, অপুষ্টি, অশিক্ষা, অচিকিৎসা ও নগ্নতার জন্য যাঁরা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।

অতঃপর মাষ্টারদা দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভাগ্যের কারণগুলির উল্লেখ

করে বললেন,—"দেশের শাসকেরা সব কিছু গ্রাস করেছে, তাই প্রজারা দুঃখ পাচ্ছে। দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ বর্ণনাতীত বর্বরতায় ও নির্দয়তায় নির্যাতিত হচ্ছে, মানুষের মত বাঁচার সমস্ত সুযোগ হতে বঞ্চিত তারা। জান? তাদের নিম্নে দলিত হতে বাধ্য করা হচ্ছে। ভয়াবহ অবিচার চলছে।" তাঁর পরামর্শ হল,—"এই অসহ্য অকথ্য ব্যবস্থা বন্ধ করতেই হবে। আর তা করতে হবে অতি শীঘ্র"। তাঁর মন্তব্য হল—"শান্তি আর সাম্রাজ্যবাদ এক সঙ্গে কখনও তিষ্ঠোতে পারে না, তাই এই আজাদীর জেহাদ।"

এই জীর্ণ শীর্ণ লোকটি যখন এ দেশের দুঃখের কারণগুলি উল্লেখ করছিলেন, সেই সময় চারিদিকে বিরাট নিস্তব্ধতা ছিল। কোথাও টুঁ শব্দটিও ছিল না। তাঁর কথার মায়াজালে সবাই মুগ্ধ ছিলেন।

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,— "এই বিদেশী পাপাচার হতে মুক্তি পেতে দেশের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন স্বাধীনতা—পূর্ণ স্বাধীনতা। "নাল্পে সুখমস্তি"। কেবল পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের পূর্ণতা আনতে পারে। শোন, আমার অন্তরের নির্দেশ হল, অভ্যাসকে নয়, প্রথাকে নয়, সংস্কারকে নয়, ধর্মের জন্যও নয়; মানবাধিকার পাবার জন্য স্বাধিকার দরকার। এই অধিকার কোন গোল টেবিল আলোচনায় পাওয়া যাবে না। পুনঃ পুনঃ ত্যাগের মধ্য দিয়ে শ্রম ও রক্ত দিয়ে রাজ-শক্তিকে উপার্জন করতে হবে"। তিনি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন, "শোন, মন দিয়ে শোন। শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য বলিদান করতে হয়। পারবে দিতে? বক্ষ চিরে হৃৎপিণ্ড বের করে, সেই রক্তসিক্ত হৃদয় দেশজননীর পূজার বেদীমূলে উৎসর্গ করতে পারবে"? আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর তখন কাঁপছিল। মাষ্টারদা ও তাঁর অনুগামীদের এই হৃদয়গ্রাহী আলোচনার দ্বারা সংগ্রামীদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে কত গভীর সে কথা প্রকাশ পাচ্ছিল, শুধু তাই নয়, ভারতের স্বাধীনতা দাবীর ন্যায্যতা আর যৌক্তিকতাও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল।

ইহাদের সাথে নিতে হবে, দিতে হবে অধিকার

এই স্বদেশপ্রেমীরা ভারতের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করতেন। আবার দু-একজনের অবচেতন মনে সময় সময় একটু আধটু সন্দেহেরও উদ্রেক হত। সেদিন অন্তরের অন্তঃ-

স্থলের এই দু'টানা ভাব ভাষায় প্রকাশ করলেন শ্রীপুলিন ঘোষ। তিনি জানতে চাইলেন যে ব্রিটিশ সসাগরা অর্ধেক পৃথিবীর অধীশ্বর। ব্রিটিশ রাজ্য এত বৃহৎ যে তাতে সূর্য অস্তমিত হয় না, এমন অপরিসীম শক্তিধর জাতিকে ভারত থেকে চলে যেতে বাধ্য করা কি সহজ হবে? তাঁরা যে রক্তশোষক। পুলিনের সন্দেহের জবাবে অম্বিকাদা বললেন,—"আসমুদ্র হিমাচল বিরাট ভারতের জীবন পণ করে তেত্রিশ কোটি নরনারী যেদিন মুক্তির মশাল হাতে নিয়ে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, সেদিন শ্বেতাঙ্গ শয়তানরা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলেও পালাবার পথ পাবে না। জান, কতটা হীনমন্যতায় আমরা ভুগছি? এ জন ইংরেজ শাসক যতগুলি ভারতবাসীকে পরিচালনা করে, কোন স্বাধীন দেশে একজন লোক এতগুলি মেষও পরিচালনা করতে পারে না।" নীরব উল্লাসে অম্বিকাদার বক্তব্য সকলেই সমর্থন করলেন কিন্তু অম্বিকাদা'র যুক্তিতে পুলিন ঘোষের দু তরফা মনের সন্দেহের মূল উৎপাটিত হল না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কৈ, সমস্ত দেশ তো আমাদের সঙ্গে নেই। আমাদের শক্তি শত্রুর ক্ষমতার তুলনায় সমুদ্রের শিশির বিন্দু মাত্র।"

অম্বিকাদা পুলিনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "শোন পুলিন, পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সেতুবন্ধন করতে যে কোনও সমাজ সংস্কারে বা রাষ্ট্রবিপ্লবে গোড়াপত্তনের সময় দু-চারজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনিষীই হাল ধরে থাকেন। বিদ্যাসাগর মশাই বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে যদি গণভোট প্রার্থনা করতেন তবে আজও তিনি তাতে সমর্থন পেতেন না। যুগের জোয়ার এক বা দুটি মহামানবের মনেই প্রথম আসে।

মাষ্টারদা বিশেষ প্রজ্ঞাবলে বুঝলেন, সন্দেহ, হতাশা, ভয়ই পরাজয়। তিনি চট্টগ্রামের স্বাধীনতার দীপশিখা কি করে ভারতের সর্বত্র ছাড়িয়ে দেওয়া যায় তার একটি মনোজ্ঞ উদাহরণ দ্বারা সরলভাবে সকলকে তা সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন। তিনি অগ্নির দাহিকা শক্তির উদাহরণ দিয়ে বললেন, "একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ ধূমায়িত হয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়। প্রজ্জ্বলিত অনল অনিলের যোগে সৃষ্টি করে অগ্নিকান্ড। অগ্নিকান্ড জনপদের পর জনপদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, বিধ্বংসী রূপ নিয়ে সেই লেলিহান অগ্নিশিখা বায়ুবেগে বিস্তার লাভ করে। এই লকলকে অগ্নি-জিহ্বাকে আয়ত্বে আনা মানুষে ও তার আয়ুধের পক্ষে অসম্ভব হয়। তেমনি তোমাদের সঙ্গে ছাত্রদল আর যুববল ও

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মিলিত শক্তি যে সর্বগ্রাসী বিপ্লব-বহ্নির সৃষ্টি করবে, সেই জ্বলন্ত দেশপ্রেম—বহ্নিশিখাকে কে রুখবে? আমি পূর্বেই বলেছি সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। চট্টলের প্রজ্জ্বলিত দেশপ্রেম আগুনের সঙ্গে সেই ভারতব্যাপী সুপ্ত শক্তির বিস্ফোরণ ঘটলে যে অগ্নুৎপাতের সৃষ্টি হবে, ইংলিশ চ্যানেলের সমস্ত জলরাশীও তা নির্বাপিত করতে পারবে না। এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে বিপ্লবের চক্র যতই ঘুরবে বিপ্লব ততই শক্তিশালী হবে। এতো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একটা বোমা বিস্ফোরণে জনগণ-মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে অন্য কোন আন্দোলন জনমনে সেই ঢেউ তুলতে পারে না। ক্ষুদে ক্ষুদিরাম যে অসংখ্য জনমনে শ্রদ্ধার আসন পেতে রেখে গেছেন তা আর কোন বরেণ্য নেতার পক্ষে সম্ভব হয়েছে কি? তিনি চাষী থেকে ঋষি, ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে যে দেশপ্রীতির ছবি এঁকে গেছেন তা আজও অম্লান। তাঁর দ্বারা রোপিত বিপ্লবী বীজের ফল আমরা। এখন ভেবে দেখ মানুষের মনে বিপ্লবের শিকড় কত গভীরে যায়।" প্রবক্তার উপমা শুনে মনে শক্তি এল। কারও মনে সন্দেহের লেশমাত্রও রইল না।

খানিক চুপচাপ থেকে ভাব-বিহ্বল হয়ে পাগল-সাধক বলে উঠলেন, "না না, চাটগাঁয়ের বিপ্লব সাধনা, গোটা ভারতকে বীরেশ্বর করবে। তবে হ্যাঁ, এতো হল বিপ্লবের বহিঃপ্রকোষ্ঠ, তার অন্তর্জগতে রয়েছেন নির্যাতিত ও নিঃস্ব কিন্তু জাগ্রত জনসাধারণ।"

মাষ্টারদা যেমন ছিলেন দূরদর্শী ও আদর্শ রাজনীতিজ্ঞ, তেমনি কৌশলী কূটনীতিবিদ। ব্যক্তি-মনুষ্যের মর্যাদা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ছিল তাঁর কাম্য। শান্তিপ্রিয় ভারতীয়দের প্রতি বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বর্বরতা তিনি কখনও মুখ বুজে সহ্য করতেন না। আবার তিনি প্রহরে প্রহরে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। প্রতিটি মুহূর্ত দলের স্বার্থে ব্যয় করতেন। পার্টির শক্তিবৃদ্ধিই ছিল তাঁর সব চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য।

মাষ্টারদা এই কূটনীতি বিশ্বাসী ছিলেন যে, বিপ্লবের আয়োজনে সমাজের নীচ ও উপর সর্বস্তরের সর্বপ্রকার লোকের প্রয়োজন রয়েছে। তাই তিনি ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী আন্দোলনকে কৃষিজীবী শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান। তিনি মনে করেন দলের বাইরে যে সমস্ত লোক ঠিকাদার পরিচয়ে সাহেবদের রেশন যোগান দেয় তাদের তৃষ্ণার

বরফ, নেশার মদ সরবরাহ করে, সেই হতভাগ্যরা পায় কেবল মদ্যপকের কটু ভর্ৎসনা।

মাষ্টারদার বিশ্বাস. এই নিগৃহীত ভারতীয়গণের আন্তরিক সহযোগিতায় বিপ্লবী দল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। আবার যে সমস্ত অসহায় অনভিজ্ঞ ভারতসন্তানগণ আয়া ও বাবুর্চি নামে যে সমস্ত জাত্যাভিমানী ও উগ্র মেজাজী ইংরেজদের বাসন মাজেন, কাপড় কাচেন, তাদের ক্ষুধার ব্রেক-ফাস্ট, ডিনার, টিফিন, সাপার পরিবেশন করেন, তারাও হতাশায় অবসাদে ও নৈরাশ্যে মুহ্যমান। মাষ্টারদা তাদের মনের অবস্থা, হৃদয়ের দুঃখ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। তিনি নিজে অপরের নিকট যে শ্রদ্ধা আশা করেন সে শ্রদ্ধা তাদেরও প্রাপ্য মনে করেন। শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য হতে মুক্তি তাঁর মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য। তাঁর কূটনীতি হল, আপামর সাধারণ মানুষের উপর রাজনীতির প্রভাব যে যত বেশী বিস্তার করতে পারবে ততই সে সার্থক বিপ্লবী হবে।

তাই এই অজ্ঞান অন্ধকারে যারা ডুবে আছে তাদেরও বিপ্লবী আন্দোলনের অংশীদার করতে হবে। অজ্ঞ জনসাধারণকে বিপ্লবের আদর্শে দীক্ষিত করে, রাজনীতির কলা-কৌশলে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মধ্যেও চরিত্রের দৃঢ়তা অনমনীয় মানসিকতা, একটা অভঙ্গুর প্রত্যয় এবং বৈপ্লবিক ভাবধারা তৈরী করে, কি কর্তব্য আর কি অন্যায়, সে বোধ জাগাতে হবে। সজাগ করতে হবে তাদের ব্যক্তিসত্বাকে। সাধারণ মানুষের মনের জমিনে দেশপ্রেম রোপণ করে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগাতে পারলে স্বাধীনতার জন্য সমিধ তারাও আহরণ করবে।

মাষ্টারদার রাজনীতির কূটনীতি চাল হল—ভারতবাসী নিজেকে সার্থক-ভাবে পূর্ণ বিকাশ করাই হল স্বাধীনতার বৃহত্তম সার্থকতা। কারণ দেশের প্রধান সম্পদ মানুষ, বিবেকবান লৌহদৃঢ় মানুষ।

তিনি দেশের অভ্যন্তরে এমন মানুষ তৈরী করতে চান, যে মানুষের বাইরের লক্ষণ হবে কর্ম্ম। মনের ভিতরের উপাদান হবে গঠনমূলক চিন্তা। তিনি বলেন, 'যে জ্বালা আমার বুকে বিপ্লব-আগুন সৃষ্টি করেছে, সমগ্র জাতির বুকে যে জ্বালা, যে মানুষ সেই আগুন গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ছড়িয়ে দেবে, সেই জ্বালা প্রত্যেক যুবক যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক-মজুরের বুকে বিদ্রোহের বহ্নি সৃষ্টি করবে। আমি চাই সেই আদর্শ পুরুষ।' জঘন্যতম

শত্রুর বিরুদ্ধে সর্ব্ব-সাধারণের ব্যক্তিসত্তা জাগ্রত করাই তাঁর কূটনীতি। সর্ব্ব-সাধারণের সহযোগিতা আর সমর্থনকে সাথে করে অভঙ্গুর সংকল্প সহায়ে তিনি লক্ষ্যে পেঁছিতে চান।

হবেনা হবেনা বলিদান বিনা, ঝরিবে শোণিত জাগিবে চেতনা

সেদিন মাষ্টারদা তাঁরই অনুগত সমর্থকদের নিকট বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুব্ধ মনের পুঞ্জীভূত রোষ আবারও প্রকাশ করলেন। বিদেশী শাসনে দেশ কত ক্ষত বিক্ষত এবং কেন এই বিদ্রোহ তারই বর্ণনায় তিনি বল্লেন,—যে সমস্ত বিদেশী বিধর্মীর অনাচারে আমার এই শস্য-শ্যামল দেশ বিপর্যস্ত, যাদের পাপস্পর্শে আমার সোনার মন্দির কলুষিত সেই দানবদের বিরুদ্ধে আমার এই বিদ্রোহ। গঙ্গাজল দিয়েই গঙ্গাপূজা হবে। যেভাবে তারা ভারতবর্ষকে পৈশাচিক লাঞ্ছনায় নিগ্রহ করেছে তার বিনিময়ে তাদের ন্যায্য পাওনাই সুদ সহ ফিরিয়ে দেব। বিদেশীর অত্যাচার, অত্যাচারিত ভারতবর্ষ আর মুখ বুজে সহ্য করবে না।

তিনি তাঁর স্বপ্নের ভারতের রূপ বর্ণনা করলেন। বল্লেন,—আমার ভাবনার ভারতে রাজায় প্রজায় প্রভেদ থাকবে না, থাকবে না ভেদাভেদ মানুষে মানুষে। ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-চন্ডাল ছুৎ-অচ্ছুৎ সবই হবে এক সমান এক মন প্রাণ। আমার স্বপ্নের এই সুন্দর ভারতে পীড়ন থাকবে না, পীড়িত রইবেনা না। দুঃখ, বঞ্চনা, ছলনা দূর হবে।

নেতার এই কথা সকলেই নীরবে শুনছিলেন। তিনি যেন তাদের সকলের মনের কথাই বলছিলেন। এই আলোচনা অন্তে মাষ্টারদা'র অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রকল্পকে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তবে রূপ দিতে বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা মানসে চিন্তাশীল নেতাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা বৈঠকে বসলেন। এই মন্ত্রনা সভায় যোগ দিলেন লোকনাথ বল, নির্মল সেন, আর অম্বিকা চক্রবর্তী।

চার নেতার এই গোপন সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রগুপ্তি চলছে। চলছে পরবর্তী এ্যাকশনের আলোচনা, এখানে মূল প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির তর্কের ঝড় উঠছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে সমস্যার চুলচেরা বিচার চলছে।

শেষে সর্বসম্মত অভিমত হল, আজ সন্ধ্যায় সহর অভিযান। এই

অভিযানের জন্য প্রধান প্রয়োজন অতি দ্রুত গতিশীল যানবাহন। কিন্তু নিজেদের কোন গাড়ী নেই, জীপ নেই, একটি সাইকেল পর্যন্ত নেই। যা ছিল ১৮ই এপ্রিল কাজে লেগে গেছে। লোকনাথ বল্লেন,—নাইবা রইল দলের, দেশের তো আছে। দেশব্রতীদের হাতে, দেশোদ্ধারের জন্য দেশের যানবাহন তুলে দিতে দেশের লোকেরা গর্ববোধ করবেন। দেশ যখন মুক্তি পাগল যানবাহনের তখন অভাব হবে না। লোকাদার প্রস্তাবই 'নেতাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।" এখন সকলের মধ্যে শহরের হাল সম্বন্ধে চলছে চিন্তা ভাবনা, চলছে অনুসন্ধান।

বিচক্ষন অম্বিকাদার অনুমান, ভয়ে ব্যাকুল সাহেবকুল সাহসে বুক বেঁধে এতদিনে সমুদ্র বক্ষ ত্যাগ করে চট্টগ্রাম শহরের বুকে এসে গেছে। কারণ চট্টগ্রামে ফৌজ আসার প্রধান ফ্যাসাদ লাঙ্গলকোটের রেল প্রাঙ্গনের ভাঙ্গন ইতিমধ্যে মেরামত হয়ে গেছে। সৈন্য বোঝাই রেল কোচ চট্টগ্রামে পৌছে গেছে ও আরও ছুটে আসছে। সৈন্য শিবিরে শিবিরে শহরের পথঘাট ছেয়ে গেছে। সাঁজোয়া বাহিনী দিনরাত অষ্টপ্রহর শহর টহল দিচ্ছে। জনমানব শূন্য পথঘাট সৈন্যে সৈন্যে ছয়লাপ। শহর এখন ক্ষুদ্র রণক্ষেত্র। শহরে বর্তমানে লৌহ-কঠিন সামরিক শাসন চলছে।

এই সমস্ত সদা শতর্ক বাহিনীর আশ্বাসে আর নিজ নিজ আগ্নেয় অস্ত্রের ভরসায় ব্রিটিশ সন্তানগণ শহরে বসবাস করতে সাহসী হয়েছে। তারা সকলেই ছিল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অতি আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত। কারণ 'ভারতীয় অস্ত্র আইন' (Indian Arms Act) কেবল ভারতীয়দের জন্য। ভারতে বসবাসকারী বিদেশীদের উপর এই আইন প্রযোজ্য ছিল না।

এই বিমাতৃসুলভ পক্ষপাতিত্বের জন্য ভারতীয়রা ছিলেন ক্ষুব্ধ। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এর জন্মের পর অর্থাৎ ১৮৭৬ সনের পর হতে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলে। কিন্তু পরাধীন দেশের নাগরিকদের ক্ষোভ বিক্ষোভের মূল্য বেপরোয়া ব্রিটিশ সরকারের কাছে এক কানা—কড়িও ছিলনা। সুতরাং প্রতিটি সিভিলিয়ান নিরাপত্তার জন্য অস্ত্রসস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। আর সতর্ক সশস্ত্র সৈনা দ্বারা শহর বেষ্টিত ছিল। এহেন পাষাণ কঠিন সামরিক বেষ্টনী ভেদ করেই আজ সন্ধ্যায় মুক্তি যোদ্ধাদের শহরে প্রবেশ করা চাই-ই চাই। বিপ্লবীদের এই ছিল দৃঢ় সংকল্প।

আর পাপের শাসন নাশ করার জন্য মুক্তি যোদ্ধাদের রণধ্বনি হবে ঃ—

শঠে শাঠ্যং সমাচারেৎ। এই ধ্বনি এই জন্য যে, বিলাত হতে বিশেষ তালিম নিয়ে ও'ডায়ার সাহেব ভারতে এসেছিল। এসেছিল অবাধ্য ভারতীয়গুলিকে মেরে মানুষ করার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে। বেয়াদব কালা আদমীগুলি এখন স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে চিৎকার করতে সুরু করেছে। অনধিকারীর এই স্বরাজের আব্দার সাহেবের অসহ্য।

তবে একথা অত্য যে, যুদ্ধ জয়ের পর ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার দিয়েছিল। তবে তা তো ছিল একটা শুধু রাজনৈতিক ভাঁওতা মাত্র। ইংরেজের এই মিথ্যা চাল বুঝবার জ্ঞান মূর্খগুলির নাই। এ যে কুকাজের কান্ডারী মহা বোকা ডাঃ সত্যপাল। কুলাঙ্গার মহামান্য সম্রাটের সমালোচনা করছে। পরম করুণাময় ব্রিটিশ সরকারের নিন্দা রটাচ্ছে। সদাশয় সুসভ্য ব্রিটিশ জাতির মাথায় নিন্দার ঝাঁপি চাপিয়ে দিচ্ছে। সভা ডেকে লোক জড়ো করে তাদের সাদা গায়ে কাদা মেখে দিচ্ছে। পরাধীন অপদার্থগুলির এই স্বাধীনতা চর্চা স্বাধীন ডায়ার কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। কারণ ডায়ার যে ইংরাজ। ভারতীয়দের মুখের ভাষা অন্তরের বেদনা কি করে স্তব্ধ করে দিতে হয় তা সে জানে। ডায়ার সৈনিক।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে জালিয়ানওয়ালা বাগে ছিল এক প্রতিবাদ সভা। দেশের পরম পূজনীয় নেতা দেশবন্ধু ডাঃ সত্যপালকে ও কিচলুকে বিনা দোষে বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করার বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের মনে খেদ প্রকাশের জন্য প্রতিবাদ জনসভা। স্বেচ্ছাচারী ভারত শাসকের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লাঞ্ছিত ভারত-আত্মার ক্ষোভ জানাতে যুবা বৃদ্ধ বালক পুরুষ নারী সকলের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বেই সভাস্থল লোকে লোকারণ্য—যেন জনসমুদ্র।

কুখ্যাত ডায়ার সভাস্থল হতে একমাত্র নির্গম পথের মুখে মেশিনগান বসাল, পথ অবরোধ করল। কোনও হুশিয়ারী না দিয়ে, কোন প্রকার সাবধান বাণী উচ্চারণ না করে, এমন কি কোনও ইঙ্গিত বা ইশারা পর্যন্ত না দিয়ে শান্ত, নিরীহ, নিরাপরাধ মানুষের উপর অকস্মাৎ শ্রাবনের ধারার ন্যায় গুলি বর্ষণ করল ঃ তারপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালালো রাত্রির অন্ধকারে ঃ সারারাত চলল বীভৎস হত্যাকান্ডে অগণিত লোকের হাহাকার ঃ বুক ফাটা কান্নায় জালিয়ানওয়ালা বাগের আকাশ বাতাস ভরে গেল। পুরুষের উপর চলল বেত্রাঘাত। নারীর উপর নিয্যাতন।

এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বেদনাদায়ক স্মৃতি আজও ভারতবাসীর মনের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ত্রাসের সঞ্চার করে। লাঞ্ছনার পৈশাচিকতায় চমকে ওঠে নির্যাতিত মানুষের বেদনাবিধুর আত্মা। ক্ষত বিক্ষত হয় অন্তর, পরাধীনতার কারণে ভারত কোথায় নেমে এসেছে এই চিন্তায় দেশের মনিষী মর্মাহত হন। ভারতবাসী ভুলবে না, ভুলতে পারে না এই নিগ্রহ।

ভারতবাসীকে বন্য পশুর মত হত্যা করার অপমানের জ্বালা ভারতের মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ভারতের বীর সন্তানরা এই জ্বালা নীরবে সইবে না। তাই আজকের এই অভিযান হবে সেই দুষ্কর্মের প্রতিদান। নিষ্ঠুরতার ঋণ নিষ্ঠুরতা দিয়েই সুদে আসলে পরিশোধ হবে। সেদিন হিন্দুস্থানীর কান্নায় আকাশ কম্পিত হয়েছিল। আজ শ্বেত ঘাতকের বিনাশে যে দক্ষযজ্ঞের সৃষ্টি হবে তার প্রচণ্ডতায় ব্রিটিশ সরকারের বুক কেঁপে উঠবে।

ধৈর্যের প্রতিমূর্তি মাষ্টার দা সমবেত ক্ষুৎপীড়িত সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করতে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ভারত ভূমিকে ব্রিটিশ জঞ্জাল মুক্ত করা, ভারতকে ভারতবাসীর দেশ করা আমাদের নৈতিক উদ্দেশ্য। চট্টগ্রাম হ'তে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত দেড় হাজার মাইলের ভারতবর্ষ আমার দেশ, মা আমার আপন ঘরে বন্দিনী। বন্দিনী মায়ের এই বন্ধন আমরা ঘুচাতে চাই। যে দেশভক্ত পশ্চাতে তাকাবে না। দিন বা রাত্রি বিচার করবে না, শুধু বৈশাখীর ঘূর্ণিঝড়ের বেগে ছুটবে। বাধা ভেঙ্গেচুরে খান খান করবে। অত্যাচারীর হাতের কৃপাণ করবে শক্তিহীন। স্তব্ধ করবে পাপীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস।

মনে রাখবে শক্তি কেবল শক্তিমানকেই সাহায্য করে। তারপর খানিকক্ষণ তিনি নীরব রইলেন। নিরীহ গোবেচারী মানুষটির চোখে মুখে ফুটে উঠল দুর্বাসার ক্রোধ। হঠাৎ প্রদীপ্ত অগ্নি শিখার ন্যায় জ্বলে উঠলেন তিনি। সক্রোধে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের সন্ধি? কার সাথে সন্ধি? কিসের গোল টেবিল বৈঠক? যাদের দ্বারা লাঞ্ছিত আমাদের দেশ, যাদের লোলুপ বাসনায় বঞ্চিত গোটা জাতি, যাদের অত্যাচারে শঙ্কিত দেশের মানুষ, তাদেরই সঙ্গে শান্তির প্রস্তাব। কংগ্রেস শান্তি চায় চাক। বিপ্লবীর অন্তরের বিশ্বাস, ভিক্ষায় নয়, শক্তি দ্বারাই তৈরী হবে মুক্তির রাজপথ। দূর হবে দুঃখীর হাহাকার। শুধু ছলনায় ও সহানুভূতিহীন মিথ্যা আশ্বাসে অন্ধকারই গভীর হয়। পিটিশান, প্রেয়ারে পাওয়ার আসবে না।

দেশের দশা হেরি হৃদয় বিদরে, করিতেছে শিরে পাদুকা বহন

আজ ২২শে এপ্রিল, মঙ্গলবার ১৯৩০ খৃীস্টাব্দ। এই ২২শে এপ্রিল মঙ্গলবার দিনটিতে কি যে বিস্ময় লুকিয়ে আছে তখনও তা কেউ জানেনা। মুক্তি ফৌজীদের ২২শে এপ্রিলের দীর্ঘ আলোচনা ছোট্ট জালালাবাদ পাহাড়ে বসে যখন শেষ হল তখন বেলা দ্বিপ্রহর। এই ভর দুপুরের রৌদ্রে জালালাবাদ জ্বলছে। সকাল বেলার জবাকুসুম-সঙ্কাশং দিবাকর এখন মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড রূপে ধরণীর বুকে আগুন ছড়াচ্ছে। রোদে আগুণের ফিনকি। সেই আগুনের হল্কায় জালালাবাদের বক্ষ তাপিত, ঝোপ ঝাড় তরুলতা ঝলসে যাচ্ছে। পিপাসিত বিপ্লবীগণ জলের জন্য দিশেহারা। বন্দুকের নলটিও কাঁধে রাখা যাচ্ছেনা, গরমে গায়ের চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। জল কোথাও নেই, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। উপরন্তু পূর্ববর্তী দিনগুলিতে কলাগাছের মাজ চিবিয়ে পিপাসা মিটাত, নল ভেঙ্গে জল পেত, তার শাঁস খেয়ে ক্ষুধা মিটাত। বিরল বৃক্ষ জালালাবাদে ক্ষুধিত ও পিপাসিতগণ আজ সেই সুযোগ হতেও বঞ্চিত। তাছাড়া প্রথম দিনের অর্দ্ধাহার, দ্বিতীয় দিনের আম্র আহার, তৃতীয় দিনের ফলাহার, চতুর্থ দিনের পূর্ণ আহার আর পঞ্চম দিনের নিরম্বু অনাহার আর পিপাসার কষ্টে সেচ্ছা-সৈনিকগণ জীবনমৃত।

একুশ তারিখের লবণবিহীন কিছুটা খিচুরী শীর্ণকায় কালীপদ চক্রবর্তী (পণ্ডিতদা) তাঁর চারদিনের অপরিচ্ছন্ন লংগোট খুলে তার ভিতরে সঞ্চয় করে ঝোলার মত করে, ভবিষ্যৎ-এর অনাহারের কথা ভেবে, সঙ্গে রেখেছিলেন। আজ বাইশে তারিখ তাঁর গ্রুপের কয়েকজন মিলে দিনেরবেলা তা খেলেন। যেমন, সুবোধ বল, সবোজ গুহ, বনবিহারী দত্ত, অশ্বিনী চৌধুরী, সীতারাম বিশ্বাস ও আরও কয়েকজন।

কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে চার পাঁচ জনে এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে ক্লান্তি দূর করতে, অবসাদগ্রস্ত বিপ্লবীগণ ঝোপের আড়ালে শয়ন করলেন। এখন ধরিত্রী তাঁদের ধাত্রী। তা বলে এসব হচ্ছে কর্তব্যকে বিসর্জন দিয়ে নয়। প্রকৃতির আক্রোশে দেহ দমিত হলেও মন কাবু হয়নি। কর্তব্য-কঠিন লৌহ-দৃঢ় মন শত নির্যাতনেও নিঃশঙ্ক। নির্দয় প্রকৃতির দারুণ কাঠিন্য এঁদের স্পর্শ করতেও পারেনি। তাঁদের চোখে মুখে বীরত্বের ছবি ফুটে উঠছে। তাতে মার্জিতমনা বৈদগ্ধের পরিচয়। তাঁরা প্রাণ সম্পদে ভরা, তাঁদের কার্যকর কর্মপন্থা নির্ভীক।

ছয়জন রক্ষীসেনা নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থা গ্রাহ্য না করে সতর্ক দৃষ্টিতে সব দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন, তাঁদের দৃষ্টিতে ছিল তীক্ষ্ণ ধার, মনে প্রত্যয়জনক দৃঢ়তা। তাঁদের ছিল এক জটিল দায়িত্বের যৌথ প্রয়াস। কর্তব্য অক্ষুন্ন ভাবে পালন করতে, আঙ্গুলের ফনা কপালের উপর স্থাপন করে, উজ্জ্বল রৌদ্র বলয়ের মধ্যে দৃষ্টি দূর হতে দূরতম স্থানে নিক্ষেপ করে, দূরের বহু দূরের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করছিলেন। রক্ষীবাহিনীর দৃষ্টি ছিল গৃধিনীর দৃষ্টির মতো নির্ভুল। সেই শ্যেন দৃষ্টিতে ছোট বড় সব ঘটনা প্রতিফলিত হত। আর তুচ্ছ বা গুরুত্বপূর্ণ সব দৃষ্টবস্তুর সম্বন্ধে মাষ্টারদা'কে ওয়াকিবহাল করা হত। এই ছিল তাদের উপর নির্দেশ।

তারপর সেণ্ট্রি বদল হল। অগ্নিক্ষরা সূর্য দেবতা যখন মাথার উপর, ঠিক দ্বিপ্রহরের কিছু আগে একদল নিরাপত্তা রক্ষীর কার্যকাল শেষ হল। তাঁরা স্বাস্থানে ফিরে এলেন। তাঁদের ডিউটিতে কোনও ঘটনা বা অঘটন কিছুই ঘটেনি।

দ্বিতীয় দফায় অর্দ্ধ ডজন বীর বিপ্লবী শিবিরের চারিদিক পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত হলেন। সেই জোটে ছিলেন, হেমেন্দু দস্তিদার, সুবোধ বল, মধুসূদন দত্ত, কৃষ্ণ চৌধুরী, শক্তি নাগ আর ননী দেব। তাদের কর্তব্য যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার সম্বন্ধে প্রত্যেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। যে কোন অদৃষ্টপূর্ব ও অকল্পনীয় দুস্কৃতীর মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি সাহস ও বুদ্ধি তাদের ছিল।

নির্ভীক যোদ্ধারা বীর বিক্রমে চলেছেন শত্রু ব্রিটিশ চরদের শায়েস্তা করতে। যাদের দৃঢ় পদক্ষেপে তাদের মনের দৃঢ়তার পরিচয়। মনের মন্ত্র—"মোরা বীর, উচ্চ মোদের শির।"

এই রক্ষীদল জানতেন যে সাবধানতার মার নেই, তাই অভিযানে সতর্কতার ন্যূনতা ছিলনা। আর ফাঁকির ফাঁকও ছিলনা। কর্তব্যে কঠোর ফৌজীগণ পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই সতর্ক প্রহরাতে কৃষ্ণ চৌধুরীর নজরে পড়ল, দু'জন গামছা পরা খালি গা, হাড় জিরজিরে গ্রাম্য মানুষ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে, আবার তর্জ্জনী নির্দেশ করে কি যেন দেখাচ্ছে। পরক্ষণেই আড়ালে লুকোচ্ছে। আগন্তুকদের আচরণ অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তাদের হাবভাবে কৃষ্ণের মনে সন্দেহ জাগল। তাদের চোখে অনুসন্ধানের চাহনি,

দৃষ্টি ভয়চকিত। দুষমন হবে ভেবে কৃষ্ণ এই দুই গ্রামীন লোকের অস্থিরতার প্রতি হেমেন্দুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাদের ধরণ-ধারণ চাল-চলন দেখে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পন্ন হেমেন্দুর কর্তব্য স্থির করতে মুহূর্তও দেরী হলনা। পড়ি কি মরি করে, তড়িৎ গতিতে দুই লাফে লোক দু'টিকে ধরে ফেললেন। শান্তি হেমেন্দুর অনুসরণ করলেন। শান্তির মর্মপীড়া এই কারণে যে, ধূর্ত বিদেশী সরকার জীবনে হতাশ-গ্রস্ত লোকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে, অর্থের লোভ দেখিয়ে এই কুকর্মে লুব্ধ করেছে, লিপ্ত করেছে। কপট সরলদের মনে গরল ঢেলে দিয়েছে।

একজনকে শান্তি সামলাচ্ছেন, আর হেমেন্দু আর একজনের দুই বাহুত বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে প্রবল বেগে তিন চারটি ঝাঁকুনি দিলেন। ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোঁয়ারা কিয়ের লাই এন্ডে আইস্য, তোঁয়াগো কনে পাঠায়্যে? তোমরা কেন এখানে? তোমাদের কে পাঠায়েছে?" ঝাঁকুনি আর বকুনিতে লোক দুইটি হতভম্ব হয়ে গেল। কান্নায় ভেঙে পড়ল। সভয়ে বল্ল, "আঁয়ারা গরীব। হুয়ানা লায়রীর লাই রোজ এন্তে আই। লায়রি বেচিয়ারে আঁয়ারা খাই। আওনারা এন্ডে আছেন আঁয়ারা জাইনতাম ন। কালুয়া রাতুয়া বাচ্ছাগুলি ন খায়।" আমরা গরীব লোক, শুকনো কাঠের জন্য রোজ এখানে আসি। কাঠ বিক্রী করেই আমাদের সংসার চলে। আপনারা এখানে আছেন আমরা জানতাম না। আমাদের ছেড়ে দিন। কাল রাতে বাচ্ছাগুলি কিছুই খায়নি।

দেহাতী দুজনের কাকুতি মিনতিতে শান্তি হেমেন্দুর মন দয়ায় ভিজে গেল। গ্রামের ভূষণ সরলতা, তাই তাদের কথায় বিশ্বাস করলেন ও তাদের মুক্তি দিলেন।

ছাড়া পেয়ে ধূর্ত লোকগুলি চোখের নিমেষে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। নাটকীয় ভাবে পলায়নের ক্ষিপ্রতা দেখে দুজনের মনেই সন্দেহ জাগল, কিন্তু ততক্ষণে তারা অনেক দূরে।

হৃদয়-দুর্ব্বলতাহেতু, ভুলবশত আই. আর. এ.-এর আইন অমান্য হল। এই ক্ষুদ্র ভুলের পথ ধরে কত বিপর্যয়কে যে ডেকে আনা হল তা আঁচ করতে পেরে শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের মন অনুশোচনায় কাতর হল।

আত্ম-গ্লানিগ্রস্ত শান্তি ও হেমেন্দু ভুলের বিবরণ সবিস্তারে মাষ্টারদা'র নিকট বর্ণনা করলেন। এই বিচ্যুতির সংবাদ দলের যারা শুনলেন সবাই বিরক্ত হলেন, সকলেই বিরূপ মন্তব্য করলেন।

মাষ্টারদা চিন্তিত হলেন, গম্ভীরভাবে বললেন,—"শত্রুর চর দরিদ্র হলেও শত্রু, এদের বেঁধে রাখাই উচিত ছিল।" পরে বললেন—"এ হল অমঙ্গলের সংকেত-ধ্বনি। তবে বিপ্লবীরা শনি-মঙ্গলের ধার ধারে না। চন্দনের পরিবর্তে শ্মশানের চিতাভস্মেই তাদের ললাট চর্চ্চিত হয়। বিপ্লবী বিশ্বাস করে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিহিত রয়েছে নব-জীবনের সমৃদ্ধির বীজ।"

তাই শহর অভিযান আর হল না। ভৈরব আনন্দের ধূপ-ধূনা দিয়ে এখানেই হবে বিপ্লবের মঙ্গলারতি।

তিনি আসন্ন ঝড়ের গন্ধ পেলেন। সবাইকে ডেকে বললেন, সংকট আবর্ত মাঝে নির্ভীক প্রাণে ছুটে যেতে তোমরা তৈরী হও। আর ইজ্জৎবোধ নিয়ে দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হও।

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,—তোমরা শুনে রাখ, আজকের ঘটনা বাঁচার সংগ্রামের ইতিহাসে হবে অন্যতম বড় ঘটনা। আর হবে এই দশকের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল আদর্শ। উচ্চ আদর্শ। মূল্যবান আদর্শ।

ভূমিকম্প নয়। ১৮ই এপ্রিলের সঠিক বলিষ্ঠ উদ্যোগে ইংরেজের হৃদকম্প হয়েছিল। আর আজকের দিন হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কাঁপানো এক ঐতিহাসিক দিন। সেই স্বাধীন ভারতের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার আজ শুভ দিন।

মনে রেখো, এই আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের পিছনে রয়েছে সর্ব্বস্তরের ভারতবাসীর সক্রিয় সমর্থন। তাই আদেশ দিচ্ছি, বিদেশী পিশাচের কবল হ'তে দেশকে উদ্ধার করতে। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করতে তোমরা প্রস্তুত হও।

আত্মার শক্তি অসীম, তাই তোমাদের সহায় হবে।"

মাষ্টারদা'র আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন সংগ্রামীদের শরীরে তড়িৎ-প্রবাহের সুইচ্ টিপে দিল। সকলের শরীরের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জড়তা, আলস্যতা, অবসাদ সব উবে গেল। যেন আলোর আবির্ভাবে পলকে অন্ধকার দূর হল। যোদ্ধাদের সর্ব্বশরীর সিংহের শক্তিতে তেজীয়ান হয়ে উঠল।

ভাবী সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে বিপ্লবীদের এই সাজ সাজ রব অম্বিকাদা প্রত্যক্ষ করলেন এবং প্রস্তুতি পর্ব্বে বিপ্লবীদের উৎসাহ দিতে, তিনি বললেন,—"জন্ম ও মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, সেরূপ জাতির জীবনেও উত্থান-পতন অনিবার্য। কিন্তু যে জাতি আত্মবিস্মৃত নয়, আত্মমর্য্যাদা যারা

বিসর্জন দেয়নি, সেই জাতি জগৎ মাঝে আবার আপন প্রতিভায় গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠা করবেই করবে। বাঙ্গলার যুব-শক্তি আজও আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর, আত্মমর্যাদায় শ্রদ্ধাশীল। তাই ভারতের পুনরুদ্ধার প্রভাত-সূর্য্যের উদয়ের মতই অবশ্যম্ভাবী।"

অম্বিকাদার কথা শুনে স্বাধীনতার দিশারীরা আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। মাত্র ক'টি কথা, কিন্তু এর মূল্য অনুগামীদের কাছে অনেক। সেই প্রাণের উচ্ছ্বাস সকলের মধ্যে সংক্রামিত হল।

অম্বিকাদা সহযোদ্ধাদের আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবার বললেন,—"তোমরা আত্মোপলব্ধির সাহায্যে যদি আপন শক্তিকে জানতে পার, দেখবে তোমাদের দেহ মন প্রাণ অসীম সমুদ্রের মত অনন্ত শক্তির আধার। তোমরা তোমাদের প্রকৃত স্বরূপ চিনতে চেষ্টা কর। তোমরা শক্তিশালী হবে, মহান হবে। তোমরা যে সর্বশক্তিমানের অংশ! জান? যে নিজেকে হীন ভাবে হীনতা তাকে পেয়ে বসে, সে হীনচেতা হয়ে যায়। তোমরা যে অমৃতের সন্তান। এই বিশ্বাস তোমাদের মধ্যে অজেয় শক্তির সৃষ্টি করবে। আর সেই শক্তিই তোমাদের বিজয়কে সুনিশ্চিত করবে।

"সাজো সাজো সকলে রণসাজে"

তিনি তারপর আরও দৃঢ়তর কণ্ঠে বললেন,—একথা অতি সত্য যে, পথ যার সৎ, উদ্দেশ্য যার মহান, ত্যাগ যার বাসনা, সাফল্য তার করতলগত। বিশ্বের অনন্ত জীব, অনন্ত শিব তার সহায়।

আজ ভারতমাতার আশীর্বাদের অমৃতধারা তোমাদের উপর বর্ষিত হবে। আর তোমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভক্তিভরে নতশিরে তা মাথা পেতে নেবে। মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তোমরা আগুনের মত জ্বলে ওঠো, বজ্রের বেগে ধাবিত হও, উল্কার মত জ্বলতে জ্বলতে নিঃশেষ হয়ে যাও। মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে অস্ত্র ধর।"

"তারপর অম্বিকাদা দেশকে কিভাবে চিন্তা করেন সে সম্পর্কে বললেন,—আমার হৃৎপিন্ডের মত, আমার সত্তার মতই সত্য আমার দেশ। আমার ভারতবর্ষ।

সেই সত্য মূর্তির পূজার জন্য তোমাদের শক্তি দিয়ে নিষ্ঠার সাহায্যে

প্রজ্বলিত কর বৃহৎ আর মহৎ আদর্শের আলোকবর্তিকা। পরাধীনতার ঘোর অন্ধকারে সেই জ্বলন্ত আদর্শ ভারতবর্ষকে উদ্ভাসিত করবে। সেই প্রজ্বলিত শিখার লেলিহান জিহ্বা হৃদয় হতে হৃদয়ে বিপ্লবের আগুনকে প্রসারিত করবে। জান তোমরা? দেশের মানুষের মনে বিদেশী কুশাসনের দরুণ রয়েছে ভয়, আছে অলীক আশংকা। তোমাদের শৌর্যশালী আদর্শে দূর হবে ভীরুর ভয়।"

এই তরুণ দেশপ্রেমিকদের আজ পাঁচদিন যাবৎ স্নান নেই, খাওয়া নেই, সারারাত বিরামবিহীন চলার ক্লান্তি, সারারাত অনিদ্রাজনিত শ্রান্তি কিছুই যেন তাঁদের স্পর্শ করতে পারছে না।

একটি অনুচ্চারিত স্বর তাদের মনে মনে ঝংকৃত হচ্ছে, সে হচ্ছে দেশ-প্রীতির সুর। তাঁরা আসন্ন মুক্তিযুদ্ধে ব্যক্তি-অহংকারকে দেশপ্রেম-অহংকারে রূপান্তরিত করতে চান। রাহুর গ্রাস হতে দেশকে উদ্ধার করে প্রাচীন ভারতের মহান বেদ-বেদান্তের, প্রজ্ঞাবান মুনি ঋষিদের ভাবধারার পুনরুদ্ধার করে দেশে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা তাদের জীবনের মূল মন্ত্র। মঙ্গলময় বিধানের প্রাণদানের এ হল দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

এই স্বদেশ শ্রী চিন্তায় মগ্ন হয়ে যুগান্তরকারীদের যত দুঃখ ছিল মনে, সব তারা গেছে ভুলে। যুদ্ধের আহ্বান শুনেই প্রত্যেকের প্রতি শিরায় উপ-শিরায়, সকল স্নায়ুতে, ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবল বেগে ছুটোছুটি করতে লাগল। শান্তি দেশভক্তির প্রীতি নিমেষে তাদের উন্মাদ করে তুলল। স্বদেশ প্রেমিকদের মনে শরীরে এখন বল, বীর্য, কর্ম, কীর্তি ও আত্মবিকাশের প্রবল তান্ডব। শত্রুর দিগন্তজোড়া কালবৈশাখীর ঝড় ঝাপটার মধ্যেই যে তাদের ওড়াতে হবে স্বাধীন ভারতের গৌরবময় বিজয় কেতন!

এই আজাদি সৈনিকগণ যখন সংগ্রামের জন্য আন্তরিকভাবে উৎসুক, সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ব্যায়ামবীর লোকনাথ বল জলদ-গম্ভীর আওয়াজে বললেন, "স্বাধীনতার স্থপতিগণ শোনো, দুঃশাসনের দৌরাত্ম্যকে বিপর্যস্ত করতে পূর্বাহ্নের প্রস্তুতি পর্ব সম্পূর্ণ কর। আমি হাওয়াতে আভাস পাচ্ছি, সাম্রাজ্যবাদিদের আক্রমণ আসন্ন।" তারপর বিপুলদেহী দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছাত্রনেতা বুঝতে পারলেন সম্মুখ বিজয় লাভ করে বিজয় নিশান বিপ্লবীরাই ওড়াবে। তবে তা লাভ করতে হবে বীর্য ও মৃত্যুর শুল্কে।

যুদ্ধজয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি সমবেত সঙ্গীদের বললেন,—"মনে রাখবে

এই মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হতে না পারলে অপমানের আর সীমা থাকবে না। আর এও মনে রাখবে আমাদের জন্ম মুহূর্তেই আমাদের মৃত্যু লিখিত হয়েছে।"

লোকাদার আদেশে যুদ্ধপাগল বীরেরা পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতিপর্বে মন দিলেন।

তারা রাইফেলের স্ক্রু টাইট করলেন। মাস্কেট্রির নল পরিষ্কার করলেন। বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি লুব্রিকেটিং অয়েল দিয়ে তৈলাক্ত করলেন। সম্মুখ সমরের জন্য প্রস্তুত হতে হতে সরোজ গুহ বললেন,—"জানো ননী, আমাদের আজকের আত্মদান কীর্তির চিহ্ন হয়ে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, কারণ এই যুদ্ধ দস্যু লুটেরার বিরুদ্ধে ন্যায়ের অভ্যুত্থান"। ননী জবাব দিল,—"তুই ঠিক বলেছিস, সরোজ, দেশ শক্তির আরাধনা ভুলে গেছে। শক্তিও দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে। ক্ষুদিরাম যে শক্তিবীজ বপন করে গেছে, বাঘা যতীন তাতে জল সেচন করে গেছে, আমরা সেই মহাশক্তিকে দেশময় ছড়িয়ে দেব।" এরূপ বলতে বলতে তারা ম্যাগাজিনের যন্ত্রাংশ মেশিন অয়েল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিলেন।

যুদ্ধার্থীগণ অতঃপর ঢিলেঢালা পোষাক-পরিচ্ছদ আঁটসাট করে পরলেন। শ্লথ কোমরবন্ধ শক্ত করে বাঁধলেন। জুতার ফিতে জুৎসই করে কষলেন। তারপর পিস্তলে, রাইফেলে গুলি ভর্তি করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

দলপতি দেখিয়ে দিলেন, শিখিয়ে দিলেন কি করে বিস্ফোরকে পলতে ভরতে হয়। কি করে বোমা ছুঁড়তে হয়। কি করে লক্ষ্য অব্যর্থ করতে হয়। বলে দিলেন, কখন কিভাবে আক্রমণ করতে হয়। জালালাবাদকে কাঁপিয়ে তুলতে পারে এমন শক্তিশালী বোমাও বিপ্লবীদের দলে ছিল।

প্রস্তুতির পর রণ-প্রিয়গণ মহড়ায় মনোযোগ দিলেন। তখন তাদের মনে তাপ-উত্তাপ, উদ্বেগ, উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠার কি ভয়ানক আবর্ত চলছিল। গোলাগুলির সময় দ্রুত ছোটাছুটি করতে সব ঠিক আছে কিনা তার মহড়া চলছিল।

দুবৃত্তদের রণকৌশল মোকাবিলায় দক্ষতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। নৈপুণ্যের বিচার হচ্ছিল।

মুক্তিযোদ্ধারা যখন পূর্ণোদ্যমে সমর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত. এমন সময় হুস্ হুস্ হাস্ শব্দ কাণে এল। যুদ্ধার্থীরা দেখতে পেলেন চলমান ধোঁয়ার কুন্ডলী গাছের আড়াল থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ আকাশে উঠে বায়ুমন্ডলীকে কালিমা-

লিপ্ত করছে। এই ধূম্ররাশি শহরের দিক থেকে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গতিশীল ধূম্রকুণ্ডলী স্থিতিশীল হয়ে গেল। এই কালো ধোঁয়া যে রেলগাড়ির তা ট্রেনটি না দেখেও তারা বুঝে গেলেন।

এখানে কোনও যাত্রী ওঠানামা করে না, রেলস্টেশন এখানে নেই। এই অস্থানে ট্রেনটির স্থিতিশীল হওয়ার রহস্য দিনের আলোর মতই তাদের কাছে পরিষ্কার। কারও মনে সন্দেহ নেই যে সাম্রাজ্যবাদীদের সৈন্যে আর অস্ত্রে বোঝাই ট্রেনটি এস্থানে দাঁড়াবার অর্থ বিপ্লবীদের অনর্থ সৃষ্টি করা। মুক্তি-পিয়াসীদের পিষে মারার ষড়যন্ত্রে দুর্ভাবনাগ্রস্ত বিদেশী সৈন্য জালালাবাদে এসে হাজির।

তবে "এ ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়।" তৎক্ষণাৎ সাজ সাজ রব পড়ে গেল সকলের মধ্যে। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় এই মুক্তিপাগলেরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। জেগে উঠল তাদের মধ্যে অলোক-সাধারণ সাহসিকতা। তবে প্রস্তুত তাঁরা পূর্বেই ছিলেন। এখন আগের প্রয়াসকে আর একবার যাচাই করে নিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে উম্মাদনা প্রবল। আক্রমণের অপেক্ষায় ওৎ পেতে আছেন। অধীর অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণছেন। এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে মাষ্টারদা উত্তেজিতও নন, বিচলিতও নন।

তিনি ধীর স্থির হয়ে অটল বিশ্বাস নিয়ে লোকনাথ বলকে কাছে ডাকলেন। শান্ত উচ্চারণে অথচ প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, "জানো লোকনাথ এই সংগ্রাম সন্ধিক্ষণে আমার সামনে নূতন আশার রশ্মি জেগে উঠছে। আজকের উদ্যম হবে সারা ভারতের সাড়া জাগানো ঘটনা। তবে এই যুগান্তর সন্ধিক্ষণে অনন্ত আর গণেশের অভাব আমি সবচেয়ে বেশী অনুভব করছি। তাদের অনুপস্থিতি বড় বেশী করে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করার পূর্ণ ক্ষমতা তোমাকে দিলাম। তুমি তিনজনের দায়িত্ব এবং কর্তব্য একা সম্পন্ন করবে এবং আসন্ন সংগ্রামে তুমিই নেতৃত্ব দেবে।

সর্বান্তঃকরণে এই বিশ্বাস সর্বদা মনে রাখবে এই সম্মুখ সমর হ'তে বহু জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অনেক অভিজ্ঞতা দেশকে দিতে হবে। জানত? যুগ যুগ ধরে বিপ্লবীদের যা ছিল অন্তরের সাধনা, সেই সাধনার আজ অগ্নিপরীক্ষা।"

লোকনাথ বল ছিলেন অনন্যসাধারণ শক্তিধর। তিনি দুহাতে দুটি চলন্ত

মোটর গাড়ির গতি স্তব্ধ করে দিতে পারতেন। আবার ছাত্রনেতা হিসাবে তাঁর বিচারশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ, পরিচালনা বুদ্ধি ছিল সর্বজন প্রশংসিত।

মাষ্টারদা সেই কৃতিত্বের উল্লেখ করে বললেন,—"লোকনাথ, তোমার পেশীর জোর আছে ও আছে মগজের জোর, তোমার জ্ঞান, তোমার অভিজ্ঞতা সকলের মধ্যে প্রসারিত করে দাও। আমি জানি মুক্তিযোদ্ধাদের দেহমন দেশপ্রেম আগুনে জ্বলছে। তোমার প্রেরণা হোমাগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত তাদের আরও প্রজ্জ্বলিত করবে। তোমার বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অধিকতর দুর্ধর্ষ করবে।"

মাষ্টারদা তাঁর অনুগত ভাইদের নিজের অগাধ পাণ্ডিত্য দ্বারা গভীর জ্ঞান, অনাড়ম্বর বিনয় ও সম্মোহনী চরিত্র-মাধুর্য মুগ্ধ করে অনেককাল সঙ্গ দিয়েছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, সার্থকতা বিষয়ে জানতে পেরেছেন। জানতে পেরেছেন সেই মহান আদর্শলাভের জন্য তাদের ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা। যে আকাঙ্ক্ষা প্রাণপাতেও পিছপা নয়।

মানুষের ভাল হোক, অশুভের ধ্বংস হোক তাদের এই বাসনা লোকনাথকে জানিয়ে দিয়ে মাষ্টারদা বললেন, "আমার এই বিপ্লবী ভাইরা প্রত্যেকে এক একটি মেঘাবৃত অশনি। তোমার দক্ষ নেতৃত্ব তাদের মনের সঞ্চিত বারুদে আগুল ধরিয়ে দাও। তারা আগুন হয়ে শত্রুকে দগ্ধ করবে, ঝঞ্ঝা হয়ে উৎপাটিত করবে।

তোমার অতীত অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যে জালালাবাদকে পরিণত কর এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ। শারীরিক শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে নিজেকে তৈরী কর এক অজেয় সেনানী, দলের মধ্যে সৃষ্টি কর দুর্নিবার বিধ্বংসী শক্তি।

ভীম প্রভঞ্জনের মত সংঘ শক্তি দ্বারা অত্যাচারীর বিষাক্ত খড়্গ কৃপাণকে খর্ব করে দেবে। দুর্বৃত্তের ঔদ্ধত্যকে দন্ড দেবে।

জানো লোকনাথ, আমার অন্তর এখন কি ভাবনায় আলোকিত হচ্ছে? আমার এই তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা দধীচির প্রতীক। এরা প্রত্যেকে যেন অভিমন্যুর আধুনিক সংস্করণ।"

মাষ্টারদা'র আবেগোচ্ছ্বাসের মাধুর্যে লোকনাথ বিস্মিত ও স্তম্ভিত। তিনি সর্বাধিনায়কের নির্দেশ ও উপদেশ পেয়ে মনে মনে সংকল্প করলেন—হারতে চাইনা, হটতে পারি না। মাষ্টারদা'কে বললেন,—আপনার আদেশ

পালনে আমাদের সুখ, শুধু এই আশীর্বাদটুকু চাই, এই মহাব্রত যাপন করতে শক্তি যেন পাই।

মাষ্টারদার উদ্বুদ্ধ বাণীতে অনুপ্রাণীত লোকনাথ বল সর্বত্যাগী তরুণদের অন্তরে নিজের আসন স্থাপন করতে তাঁর হৃদয় নিসৃত গভীর মানব প্রেম ধীর স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণে প্রকটিত করলেন।

তার পূর্বে তীক্ষ্ন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত মুক্তিযোদ্ধাদের নিরীক্ষণ করলেন। প্রস্তুতিতে কোন গাফিলতি নেই। শুধু সমরসজ্জায় নয়, মানসিক চেতনাতেও উৎসাহে সকলেই টগবগ করছেন দেখে গর্বে বুক তাঁর উঁচু হয়ে গেল।

মুখ্য সেনানী রক্ত চনমন করা ভাষণে বললেন,—"মুক্তিপাগল বীরবৃন্দ! তোমরা পরাধীন জাতির জীবনে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছো। সেই ইতিহাস ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবে কি মাসলিপ্ত করবে তার ফয়সলা হবে তোমাদের বীরত্বে। যুদ্ধে প্রাণ দেওয়াই বড় কথা নয়।

আসন্ন আহবে প্রয়োজন হল, দলের সংগঠিত শক্তি সংহত করে সম্মিলিত ভাবে প্রচণ্ড আঘাত হানা। শত্রুর স্পর্ধার উচিত জবাব দেওয়া। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঐ গোখরো সাপগুলোর বিষদাঁত বাড়িয়ে দেওয়া।

তার চেয়েও বড় কথা পৃথিবীর দ্বিতীয় জনাকীর্ণ দেশের ভাগ্য, এই গুটি কতক ছন্নছাড়া ব্রতচারীর উপর ঝুলছে। সে গুরু দায়িত্ববোধ মনে রাখা।

মনের গভীরে চিন্তা করতে করতে ধীরে ধীরে নায়ক বললেন—"স্বাধীন ভারত সৃষ্টির তোমরাই পথিকৃৎ।"

ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে, শত্রু সৈন্যদল করিয়া বিনাশ

দেশব্রতীরা যুদ্ধের উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত ছিলেন, সেই উচ্ছাসকে জ্বলন্ত করতে নেতা বললেন—"দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপুষ্টি, রোগ প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের কারণে এবং শান্তি সমৃদ্ধি ও প্রগতির জন্য ভারতের শৃংখল ছেঁড়ার ও ভারতের বিবেককে জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে এই রক্তরাঙা অভিযান দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তাই বিতর্ক বিচারে আর কাজ নাই, তোমরা রণ মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়।

দক্ষ যজ্ঞের সৃষ্টি কর, শত্রু বিনাশ কর। প্রচণ্ড পরাক্রমে শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ কর। শত্রু-সেনাপতিগণকে হতভম্ব কর, হতাশায় আহত কর। তোমাদের রণনাদে কাঁদিবে দস্যু দীর্ণ হাহাকারে।

এই চেতাবাণীতে রণ উন্মাদনায় বিপ্লবীগণ উদ্দাম হয়ে উঠলেন।

জেনারেল বল সহরণবীরদের মনন প্রশিক্ষণ এখানেই শেষ করলেন। সুরু করলেন সমর শক্তি বৃদ্ধির ও তার সুশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—"আমি মনে করি সবার আগে শৃঙ্খলার প্রয়োজন সর্বাধিক। আমি আদেশ দিচ্ছি, এই মূল্যবান উপদেশ কেউ অবহেলা করবে না। শৃঙ্খলার খাতিরে বিনা আদশে কেউ নড়বে না। এক পাও এদিক ওদিক সরবে না, বিনা হুকুমে ফায়ারিং একেবারে মানা। রণনেতার সব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানবে। এই জরুরী সময়ে সকল কাজ নির্দেশমত করবে। আর হুকুমের জন্য জাগ্রত সতর্কতায় অপেক্ষা করবে। অটল ইচ্ছা-শক্তি ও গভীর নিষ্ঠা নিয়ে আসন্ন সংগ্রামের জন্য অতন্দ্র প্রস্তুত থাকবে।"

তারপর জেঃ বল এই ক্ষুদ্র দলটিকে একটি শক্তিশালী দল গড়তে আটটি ডিভিশনে বিভক্ত করলেন। এই অষ্টবসুকে অষ্টবিধ দায়িত্ব দিলেন। সামরিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আটটি স্থানে আটটি ডিভিশনকেই স্থাপন করলেন। ব্রিটিশ সৈন্য প্রবেশের মুখে, মিলিটারী বিচারে মুখ্য মুখ্য স্থানে নিযুক্ত করলেন।

১ম ডিভিশনে রইলেন সুরেশদে, বিনোদ চৌধুরী, জীতেন দাশগুপ্ত দ্বিজেন দস্তিদার, নিরঞ্জন রায় আর শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, দ্বিতীয় বিভাগে ছিলেন কৃষ্ণ চৌধুরী, বিনোদবিহারী দত্ত, সরোজ গুহ, কালীদে, মধুসূদন দত্ত, আর ননীদেব। তৃতীয় বিভাগে ছিলেন ক্ষীরোদ ব্যানার্জী, হেমেন্দু দস্তিদার, কালী চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু দস্তিদার, আর রণধীর দাশগুপ্ত, চতুর্থ দলে ছিলেন সহায়রাম দাস, মতিকানুন গো, বিধু ভট্টাচার্য, নারায়ণ সেন, পুলিন ঘোষ। পঞ্চমে ছিলেন মহেন্দ্র চৌধুরী, নির্মল লালা, বীরেন্দ্রদে, বিজয় সেন, নিতাইপদ ঘোষ। ষষ্ঠাংশে ছিলেন অশ্বিনী চৌধুরী, বনবিহারী দত্ত, শশাঙ্ক দত্ত, সুবোধ-বল, শান্তি নাগ। সপ্তমে ছিলেন, ফণীন্দ্র নন্দী, হরি পদ মহাজন, ভবতোষ-ভট্টাচার্য, সুধাংশু বসু, সুবোধ চৌধুরী, বিধু সেন আর সুবোধ রায়। অষ্টম দলে ছিলেন ত্রিপুরা চৌধুরী, মনোরজন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, হরিগোপাল বল, রজত সেন, স্বদেশ রায়, প্রভাস বল আর সীতাম বিশ্বাস।

সেনধ্যক্ষ জালালাবাদরে সম্পূর্ণ বক্ষ জুড়ে স্বদেশী সেনাদের সন্নিবিষ্ট করলেন। তারা সকলেই সংকল্পে অটল দেশ স্বেচ্ছাসেবক। এ প্রস্তুতি পর্বে সেনাধ্যক্ষের যে সামরিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য ছিল তা হল কোন দিক থেকেই যেন শত্রুসৈন্য আত্মপক্ষকে ঘেরাও করতে না পারে, আর শত্রুর অতর্কিত আক্রমন যেন প্রতিহত করা যায়।

জেনারেলের ব্যবস্থা অনুসারে গর্বিত বিপ্লবীগণ ঝোপের গর্ভে আত্মগোপন করলেন। নিজেদের লোকদৃষ্টির আড়ালে রাখলেন। আনেকটা যেন সেই 'ট্রয়ের ঘোড়া'র গল্পের মত।

এই গুপ্তস্থানে মুক্তি যোদ্ধারা রাইফেলে গুলি ভর্তি করে, ট্রিগারে আঙ্গুল লাগিয়ে মাস্কেটির নল শত্রুমুখো করে ঝোপের মধ্যে শুয়ে বা কেউ কেউ হাঁটু মুড়ে বসে শুধু মাথা উঁচু করে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন।

বিবরে যেন ওৎপাতা সিংহরাজ। আবার সকলের চক্ষুতে অপলক দৃষ্টি। প্রত্যেকেই শত্রু ঘায়েল করার মোওকায় নীরবে অধৈর্য্য অপেক্ষায় রত।

জালালাবাদে এখন সদা সতর্ক ও সজাগ, সরজমিনে পরোয়াহীন মুক্তিসেনা সজ্জিত।

সৈন্য বিন্যাসের পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি ভাবনা বিপ্লবীদের মনে ভেসে উঠল—যাদের বুদ্ধি আছে, আছে সাহস, দক্ষতা ও মস্তিষ্ক, বিজয় তাদের অবধারিত। বুদ্ধিহীন বল হল ফাঁদে পরা হাতি। সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির পর গোলকধাঁধা সৃষ্টির জন্য এই যুদ্ধো যোজনার বাইরে রইলেন মাষ্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্ম্মল সেন ও লোকনাথ বল।

ফৌজদার বল পরিকল্পনা অনুযায়ী রণক্ষেত্র সাজানো হল কিনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তত্বাবধান করলেন। তিনি কোন খুঁৎ রাখতে চান না।

তারপর তাঁর কড়া হুকুম—গোপন আবাসে নড়নচড়ন নয়। হাঁচিকাশি মানা। উঁকিঝুঁকিও বিধেয় নয়। কথা বলা তো দূরের কথা।

নেতার আদেশ অনুগামীদের শিরোধার্য্য। বৈশাখের তাপ প্রবাহে লতাগুল্মের আবরণের আড়ালে যোদ্ধাদের শরীর ঘমাক্ত তবুও মাথা বরফের মতো ঠান্ডা।

বিপ্লবীদের সকলের মনে একই ভাবনা। তা জীবনের ভাবনা নয়। বিজয় বাসনার উত্তাল করা ঢেউ। কল্পনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে তাদের মনে ভেসে উঠছে কত আশার স্বপ্ন। যুদ্ধের নিদান। কত ঔৎসুক্য আর কত উৎকণ্ঠা।

এই সর্বত্যাগীদের মন এখন চ্যালেঞ্জের জন্য চঞ্চল। সকলের মনেই প্রবল ইচ্ছা ক্ষমতা উজাড় করে লড়বে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। দ্বিগুণ তেজে আক্রমণ রচনা করবে বিপক্ষের উপর। শত্রুর শারীরিক শক্তি নিঃশেষ করে ফেলবে। উজিয়ে গিযে আক্রমণ করবে। দুষমন সেনাদলে ফাটল ধরিয়ে দেবে। হানাদারদের মধ্যে অঘটন ঘটিয়ে ছত্রভঙ্গ করে ছাড়বে। বিজয়ী হবে।

এরূপ একটা তেজোময় ভাবনা চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে যুদ্ধকামীরা সুযোগের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণছেন। উৎসাহ উদ্দীপনায় তাঁরা ফুটছেন, মনে তাদের ভয়ের বিন্দু বিসর্গও নেই। তারা যে বিপ্লবী। যুদ্ধের অধি-নায়ক বিজয়ের আকাঙ্খায় ও আক্রমণের আশংকায় অত্যন্ত সাবধানী। তিনি বুদ্ধি ও বলের সমন্বয় ঘটিয়ে মুক্তিবাহিনীকে অপরাজেয় বাহিনী তৈরী করতে সংকল্পবদ্ধ। তাই তিনি দায়িত্বভার ভাগ করে দিলেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশনকে ফ্রন্ট লাইনের দায়িত্ব দিয়ে বললেন, "প্রথম আক্রমণ তোমরাই প্রতিহত করবে। বিপক্ষকে কোনও সুযোগ না দিয়ে, ঘুর্ণাক্ষরেও শত্রুকে কিছু বুঝতে না দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আচম্বিতে শত্রুর উপর সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

"যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে দুষমন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়"

তৃতীয় ও চতুর্থ দলটি রাখলেন প্রথম ও দ্বিতীয় দলের সাহায্যকারী দল হিসাবে। তারা প্রথম ও দ্বিতীয় দলের শক্তি বাড়িয়ে দেবে। দুর্মদ করে তুলবে।

একটু উপরে, পথের পাশে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে স্থাপন করলেন পঞ্চম ও ষষ্ঠ দল—জয় পরাজয়ের বার্তাবহ—শত্রুর গতিবিধির ঘোষণাকারী।

সবার উপরে থাকবে সপ্তম ও অষ্টম দল। তারা থাকবেন ডিফেন্সে। যেদিক থেকে শত্রুর অগ্রগতি দেখবে সেদিকের প্রতিবন্ধক ভেঙ্গে-চুড়ে চুরমার করে দিয়ে হুড়মুড় করে এগিয়ে যাবেন। শত্রুর গতি তছনছ করে দিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবেন শত্রুর সংগঠনকে। বিশৃংখলার সৃষ্টি করবেন হানাদারদের মধ্যে।

"অস্ত্র নিধনে কিসের তরাস—অস্ত্র নিধনে তোরাকি তরাস"

চারিদিক থেকে বাছাই করা সংগৃহিত ব্রিটিশ শক্তির মোকাবিলা করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করতে ও বিপ্লবীদের আরও বাস্তবমুখী করতে সমর নায়ক লোকনাথ বললেন,—"নিছক কল্পনা গড়তে যদি বা পারে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ইচ্ছার মধ্যে চেষ্টা ও ক্ষমতা থাকা চাই।"

অতঃপর লোকাদার প্রস্তুতি পর্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার পর পরিদর্শন করতে এলেন মাষ্টারদা, অম্বিকাদা আর নির্ম্মলদা। সঙ্গে লোকাদা।

রণ-শৈলীর যে চাতুর্য্য এই সমরসজ্জায় প্রবর্তিত হয়েছে, তাতে চিন্তা কত পরিশিলীত এবং কল্পনা কত বুদ্ধিদীপ্ত হলে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা যায় তা অভাবনীয়। যুদ্ধ প্রস্তুতির বৈশিষ্ট্যগুলি নিষ্ঠার সহিত এখানে রূপায়িত করা হয়েছে।

নেতারা ঘুরে ঘুরে খুঁটিনাটি সব তীক্ষ্ন নজরে দেখলেন। অম্বিকাদা মন্তব্য করলেন—"এযে বাঘ মারা ফাঁদ। এই সমর সমাবেশ বিপ্লবীদলের অর্দ্ধেক জয় সুনিশ্চিত করেছে। বাকিটা আমরা লড়াই করে জিতব।"

নির্ম্মলদা বললেন,—"জালালাবাদ স্তব করতে বসেছে।" মাষ্টারদা'র অভিমত, "জালালাবাদ আজ মণিপূর্ণ খনি।"

এমন সময় অষ্টম গ্রুপের রজত সেন চাপাস্বরে বললেন,—"ঐতো ওরা আসছে। চোরের মত সতর্কে এগুচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে ৫১টি প্রাণে হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—"আসুক না ওরা, আমরাও দেখে নেব। গুলি ছুঁড়েই ওদের অভ্যর্থনা করব।"

রাজদ্রোহীগণ আচ্ছাদনের মধ্য থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেন মাঠের মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রু-সৈন্য। প্রত্যেকের ডাল-রুটি খাওয়া তাগড়া চেহারা। চওড়া বুক, বেঁটে দেহ। সিপাইদের শরীর বটলগ্রীণ রঙের পোষাকে আবৃত, মাথায় হেলমেট, দুপায়ে এ্যামিউনিশন বুট, হাতে রাইফেল। রাইফেলের মাথায় উদ্যত সঙ্গীন।

পূর্ণ সামরিকবেশে সজ্জিত ব্রিটিশবাহিনী পাহড়ের দিকে এগুচ্ছে। তবে তারা এগুচ্ছে সোজা মার্চ্চ করে নয়। ঝোপের আড়ালে আবডালে, লুকিয়ে লুকিয়ে, এক একটি ঝোপ পিছনে ফেলে অতি সন্তর্পণে সামনে

আসছে। একজন পথপ্রদর্শক এগিয়ে এসে সাদা কাপড় উড়িয়ে এগুতে ইঙ্গিত দিচ্ছে। এত সতর্কতার একটাই কারণ, অতর্কিতে আক্রমণ করে দেশপ্রেমিকদের বন্দী করা।

ধূর্তদের চাতুরী ভেস্তে গেল। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ মুক্তি-পিয়াসীদের নজরে প্রতিফলিত হচ্ছিল।

এতক্ষণে একদল শত্রুসৈন্য পাহাড়ের পাদদেশে এসে হাজির হল। পিছনে দলের পর দল শত্রুর পঙ্গপাল। দৃষ্টির শেষ সীমারেখা পর্যন্ত শুধু সৈন্য, সৈন্য আর সৈন্য। অস্ত্রসজ্জিত হ'য়ে তারাও এগিয়ে আসছে। বিরাট শত্রু-বাহিনী দেখে বিপ্লবীরা উত্তেজনায় উজ্জীবিত হলেন। শত্রুর যে পদাতিকগণ পাহাড়ের পাদদেশে এসে ছিল তারা বীর বিক্রমে পাহাড়ে চড়তে লাগল।

দাম্ভিকগুলো জেনারেল বলের পাতা ফাঁদে পা দিল। বিপ্লবীদের কৌশল ছিল যুদ্ধবাজদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়ে আক্রমণকারীদের পাহাড়ে চড়তে বাধ্য করা। তাই পাহাড়ের চূড়ায় দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত উন্মুক্তস্থানে ছিলেন মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্ম্মল সেন আর লোকনাথ বল। তাঁরা ছিলেন পাহাড় শীর্ষের দুইপ্রান্তে। তাদের দায়িত্ব ছিল পাহাড়ের বিপরীতদিকে লক্ষ্য রাখা। অর্থাৎ যেদিক থেকে আক্রমণ হচ্ছে তার উল্টো দিকে পাহারা দেওয়া। তাঁরা করছিলেনও তাই। আর এই করে শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কথায় আছে, অতি চালাকের গলায় দড়ি। হলও তাই।

চতুর চূড়ামণি ব্রিটিশ সেনানীদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, ব্রিটিশভীত বিদ্রোহীগণ ভয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠেছে। পালাবার চেষ্টায় আছে।

এই ভুল বিশ্বাস তাদের মরণের দুয়ার খুলে দিল। তারা রাইফেলধারী গোর্খাদের হুকুম দিলেন, 'জলদি পাহাড়ে ওঠ। কাপুরুষদের বন্দী কর।'

আদেশ পাওয়া মাত্র তরতর করে জোয়ানেরা পাহাড়ে চড়তে লাগল। জেনারেল বলের সযত্নে সাজানো জাল, ঘুপচি স্থানের সেনাশ্রয়গুলি তাদের নজরে পড়ল না। এমনকি অনুমান বা অনুভব করতেও পারল না।

জেনারেল বলের জাদু অক্ষরে অক্ষরে সফল হল। পাহাড়ের মাথায় বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে উর্ধ্বশ্বাসে শত্রুসৈন্য উপরে উঠতে লাগল। পিছন থেকে গোলন্দাজ এসে শূন্যস্থান পূর্ণ করতে লাগল। পাদদেশে মৌচাকে মৌমাছির ন্যায় সৈন্যে সৈন্যে গিজগিজ করছিল। স্বদেশীগণ সৈন্য দেখে

উতলা হলেন। আক্রমণের জন্য ছটফট করতে লাগলেন। জেনারেল বল শত্রুর অলক্ষ্যে হাতের ইশারায় জানালেন যে এখনও নয়, সময় হয়নি।

মুক্তি যোদ্ধাগণ মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় রইলেন। তাঁরা, ধীর, স্থির, নীরব শান্ত।

ব্রিটিশ সৈন্য ততক্ষণে আরও উপরে উঠল।

সংগ্রামীগণ সাবধান হলেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। তাঁরা নেতার আদেশের জন্য ব্যগ্র হলেন। ব্রিটিশবাহিনী ধাপে ধাপে প্রায় পাহাড়ের অর্ধেকটা উঠে এসেছে। মুক্তিবাহিনীর গুলির আওতার মধ্যে ঢুকে গেছে। জেনারেল বল দুষমনকে আর এক পা-ও এগোতে দিতে রাজী নন। বজ্র গর্জন হল,—"হু কামস্ দেয়ার ?"

গর্জন শুনে শত্রু থমকে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে পুনরায় বজ্রনাদ হল—"হল্ট্।"

দ্বিতীয় বজ্র নির্ঘোষে শত্রুর বুক কেঁপে উঠল। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ভেবেছিল ভয়ে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করবে। তা না করে উল্টে হুমকি দিচ্ছে, চোখ রাঙাচ্ছে। এই অকল্পনীয় শাসানীতে তারা সম্পূর্ণ বুদ্ধিহারা। শত্রু সম্বিত ফিরে পাওয়ার পূর্বেই বাতাসে ভেসে উঠল বহু আকাঙ্খিত আদেশ—"ফায়ার।" 'ভলি ফায়ার।' হুকুম হওয়া মাত্র হলপ হাসিল হল একসঙ্গে একান্নটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একান্নটি রাইফেলের নল হতে নির্গত হল। এই যৌথ তির্যক শব্দ তরঙ্গে জালালাবাদের বুক কেঁপে উঠল, চমকে উঠল প্রকৃতি, ডানা ঝাপটে উড়ে গেল পক্ষীকুল। প্রত্যেকটি অগ্নিগোলক বর্ষিত হল বট্‌লগ্রীন পোষাকধারীদের লক্ষ্য করে।

এই আচম্বিত ও অচিন্ত্যনীয় আক্রমণে হানাদারেরা হকচকিয়ে উঠল। আহত সৈন্য অস্ত্র ফেলে হামাগুড়ি দিয়ে পালাতে সুরু করল, মারাত্মকভাবে জখমীরা সাহায্যের জন্য হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করল। ভয়ে ভীত বিহ্বল সৈন্য-দের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

ব্রিটিশবাহিনী ভাল করে ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই বিপ্লবীগণ তাদের উপর ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আক্রমণের শুরুতেই অগ্নিহোত্রীগণ দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠলেন। বিপক্ষকে মাঝখান দিয়ে আক্রমণ করলেন। তাদের রক্ষণ এলাকায় হানা দিয়ে রথীমহারথীদেরও আতঙ্কিত করলেন।

মৃত্যুভয়হীন বীরবৃন্দ হুড়মুড় করে বিপক্ষের ডিফেন্স তছনছ করে তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে যাওয়ার যুদ্ধে তারা অতুলনীয় হয়ে উঠলেন।

বিদ্যুৎ গতিতে শক্তির সীমাকে তুঙ্গে তুলে শত্রুর বেষ্টনীতে আগুনঝরা গুলীর বর্ষণে আঘাতের পর আঘাত করতে করতে শত্রু ঘায়েল করতে লাগলেন। দুইটি বাহুতে শক্তির ঝড় তুলে, পরে এমন কঠিন এক ছোবল মারলেন যে বিপক্ষের ডিফেন্ডারগণ আক্রমণ প্রতিরোধ করার কোন সুযোগই পেল না।

মুক্তিযোদ্ধারা বিচক্ষণতা, পরিপাটি ও উচ্চমানের কৌশলের সঙ্গে মরিয়া হয়ে নিরলস প্রচেষ্টায় আক্রমণের পর আক্রমণ চালাতে থাকেন। এই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিলেন বেপরোয়া। তাদের মনোমুগ্ধকর ট্যাকলিং আর টেকনিক ছিল জুড়িহীন। রাইফেলের নল ঘুরিয়ে চালানোর ভঙ্গি ছিল তুলনাহীন। যে কোন জায়গা থেকে গুলি ছোঁড়ার ভেল্কিতে বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে তারা সতীর্থদের এগিয়ে দিলেন।

ক্রমাগত ঘাম-রক্তঝরা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তারা অসম্ভবকে সম্ভব, দুঃসাধ্যকে আয়ত্ত করার চেষ্টায় ছিলেন। এই বিপ্লবীরা 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র ধনুর্ভঙ্গ প্রতিজ্ঞায় আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অপরাজিতের গৌরবে বার বার আঘাত হানতে থাকেন।

তাঁদের প্রতিজ্ঞা, জয়ের মুকুট পরে জয় করবেন কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়!

প্রচণ্ড প্রহারে অতিষ্ঠ হ'য়ে শত্রুর দল রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে লাগলো। তারা যম-আছে-কিনা চকিত-নয়নে পিছনে তাকায় আর পালায়। ভীতুর দল কেউ দৌড়াচ্ছে কেউ ল্যাংড়াচ্ছে, কেউ আর্তনাদ করছে আর ছুটছে। দু চোখে যেদিকে পথ দেখছে সেখানেই ধাইছে ও লুকাবার আড়াল খুঁজছে।

এদিকে সাহেবদের চাঁদ মুখও রাহুতে গ্রাস করেছে। তাদের সর্ব গর্ব, দম্ভ, হম্বিতম্বি প্রভাতে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। পরাজয়ের চূড়ান্ত অবমাননা নিয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য তারাও হয়েছে। বিজয়ীদের বিজয়ধ্বনি ধিক্কারে রূপান্তরিত হয়ে তাদের কানে পীড়া দিচ্ছে। রণভূমির আহত ও অর্দ্ধমৃতের ক্রন্দনরোলে অপরাহ্নের আকাশ শোকাচ্ছন্ন।

যুদ্ধশেষে পাহাড়ের পাদদেশে পড়ে আছে কতগুলি মৃতদেহ, আর শোনা যাচ্ছে আর্ত-আহতের আর অর্ধমৃতের বেদনা-দীর্ণ কান্না।

পাহাড়-শীর্ষে দাঁড়ায়ে বিজয়ীগণ পলায়মান ও পরাজিত কাপুরুষের প্রতি ধিক্কারে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। সেই ধ্বনি যুদ্ধ গর্জনের চেয়ে বহুগুণ উচ্চতর ছিল।

তাঁদের কণ্ঠের বন্দেমাতরম্ ধ্বনির বায়ু তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে লতা কিশলয় আন্দোলিত, পুষ্পিত বৃক্ষ-শীর্ষ, মঞ্জুরিত বনলতা ও মুকুলিত শাখা-প্রশাখা নৃতরত।

বিপ্লবীরা মহানন্দে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। আনন্দে কেউ নৃত্য করছেন, কেউ গান গাইছেন, "বল বীর উন্নত মম শির" কেউ কবিতা আবৃত্তি করছেন, আনন্দ উচ্ছ্বাসে একজন অন্যকে জড়িয়ে ধরছেন। এই আনন্দ মহোৎসবের মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে জেনারেল বল তাঁর গলা ফাটানো ধ্বনি বন্ধ করলেন। তাঁর উদ্দীপিত উদ্বেলিত মন এই বিজয়ের তথ্য চয়ন অত্যন্ত জরুরী ভাবলেন। সুধাকণ্ঠে নির্ম্মলদাকে বললেন,—'ঐ দেখুন কুকুরগুলি ভয়েতে কত কাতর আর কাবু, তারা দৌড়াচ্ছে, আছাড় খাচ্ছে, উঠে আবার দৌড়াচ্ছে, ভয়ে পালাচ্ছে। এই ভীত ত্রস্ত সিপাইদের যা ছিল আশীর্ব্বাদ আমাদের তেজস্বী তরুণগণ তাই করে দিল অভিশাপ।'

দুরাত্মাদের পাহাড়ের মত চেহারা, রীতিমত কুস্তি করা শরীর। মোটা-সোটা বুক চওড়া। এই সবই ছিল যুদ্ধের অনুকূলে, কিন্তু আমাদের কুশলী লড়াকুদের নৈপুণ্যের কাছে হয়ে গেল মন্থর গতি, চলতে ফিরতে সময় বেশী লাগে। অনেক জায়গা জুড়ে চলে, শুটারের হাতে সহজেই ঘায়েল হয়। মারমুখী সংঘর্ষে আমাদের মত তীব্র গতিসম্পন্ন হয় না। ফলে ভাল করে ফুটে ওঠার আগেই ঝরে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। প্রথম আঘাতেই তারা নাস্তানাবুদ হয়েছে।"

আনন্দে উদ্দীপ্ত নির্ম্মল সেন জেনারেল বলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—"আমি লড়াই করেছি আর লক্ষ্য করেছি আমাদের নির্ভীক মুক্তি সেনারা কি অসাধারণ প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরপুর। দেখেছি আর বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়েছি, কত তীক্ষ্ন প্রত্যুৎপন্ন সম্পন্ন তাদের লড়াকু জ্ঞান।

তারা এমন দাপটের সঙ্গে আক্রমণ চালাল যে প্রথম আক্রমণেই শত্রুর রক্ষণভাগকে এলোমেলো করে দিল। বীর বিপ্লবীদের দাপটের কাছে শত্রু

সৈন্য ম্লান হয়ে গেল। তাঁরা যতই প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্বুদ্ধ হচ্ছিল শত্রুর উৎসাহ ততই ঝিমিয়ে পড়ছিল।

শত্রুর পুরো রেজিমেন্টই কেমন যেন ভয়ে সারা হয়ে গেল। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে নার্ভাস হয়ে গেল।"

সর্বশেষে নির্মলদা বললেন,—"তাদের সবই ছিল—আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, শারীরিক পটুতা, অনুশীলনের দক্ষতা, আর সমর কৌশলে দারুণভাবে রপ্ত ছিল। ছিল না, যা চিরকালই সাফল্যের প্রস্তুতির ভূমিকা হয়ে আসে সেই কল্পনাশক্তি, যার উচ্ছ্বাস সৃজন করে বিজয়।

ঐ যে অবাক বিস্ময়ে হকচকিয়ে ওঠার মুহূর্তটুকু, যুদ্ধে তা অনন্ত কাল—A stich in time saves nine. ঐ বিজয় আকস্মিক নয়, অপ্রাসঙ্গিকও নয়। বিজয় আমরা কেড়ে এনেছি।"

বিশ্লেষণ অন্তে আবার সোৎসাহে বিজয় উল্লাসে দু'জনেই যোগ দিলেন।

বন্দেমাতরম্ ভারতমাতার জয়, ধ্বনিতে ধ্বনিতে জালালাবাদের বাতাস প্রকম্পিত। চারিদিকে আনন্দের ধারা প্রবাহিত। এই মহা উল্লাসের মধ্যেই বিজেতাগণ শুনতে পেলেন বিউগ্লের ধ্বনি। সেই বংশী ধ্বনি বেলা শেষের আকাশকে করুণ সুরে ভরিয়ে তুলেছে। বাঁশি থেমে থেমে কম্পিত সুর ছিল বড়ই বেদনা-দীর্ণ, অত্যন্ত মর্মান্তিক।

স্বদেশ রক্ষার তরে সমরে কি কেহ ডরে

আসলে তা ছিল আহ্বান। পরাজয়ের পর আতঙ্কিত, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, আত্মগোপনকারী জওয়ানদের প্রতি একত্রে মিলিত হওয়ার ডাক।

রাজানুচরদের বাঁশির তালের তাৎপর্য্য রাজদ্রোহীরাও বুঝতে পেরেছেন। বিদ্রোহীদের মনে সন্দেহের অবকাশ রইল না যে এই তান পুনর্মিলন ও পুনঃআক্রমনের পূর্বাভাস। তবে এই আক্রমনের জন্য বিজয়ীগণ উদ্বিগ্নও নয়, ভাবনাও করেনা। সমুদ্রে যাদের শয়ন শিশিরে আবার তাদের কিসের ভয়।

তাদের সকলের মনে একই ভাবচ্ছবি—এই ভাঙ্গা হাটে পলাতকরা আবার যদি আসে, তবে তাদের এবার ঝাড়ে-মূলে উপড়ে ফেলব। ছাতু তৈরী করে তবে ছাড়ব। বাছাধনেরা বুঝবে, যে এরা ভীমরুলের চাকে খোঁচা মেরেছে।

যে কোন কঠিন আক্রমন পুরুষ-হাতে দমন করার শক্তি তাদের আছে, এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল।

বিপক্ষ হোক না সংখ্যায় অসংখ্য, এক দল গড্ডালিকা প্রবাহের জন্য একটা সিংহের আক্রমন যথেষ্ট নয় কি ? তাদের গায়ের জোর বেশী, আমাদের ইচ্ছার জোর বড়। 'আমরা জ্বালিয়ে আপন অংগখানি দেশের সেবায় ধন্য মানি'। এই ভাবনায় দেশ সেবকদের মন সমৃদ্ধ। তারা দেশকে সর্বাঙ্গ সুন্দর দেখার স্বপ্ন দেখেছেন। বিশেষতঃ, তাঁরা জানেন বিপ্লবের অবসান ঘটে, হয় জয়ে না হয় মৃত্যুতে।

অপরদিকে দূরে কিন্তু দৃষ্টি সীমানার মধ্যে এক মজা-জলের স্রোতের মধ্যে সামরিক পরিচ্ছদ পরিহিত একজন ব্রিটিশভক্ত বিকট সুরে বিউগল বাজাচ্ছে। বিউগলের বুক ভাঙ্গা হাহাকার ব্যাথায় ভরা সুর বনভূমির চারিদিক কাঁপিয়ে তুলেছে। এই বাজিয়ের পাশে তিন টমি বসা। তিন শ্বেতাঙ্গদের মুখেই কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। যন্ত্রনা, আবেগ, উদ্বেগ, বিষন্নতার ছায়া সারা মুখমণ্ডলে। বিষাদের প্রতিমূর্তি।

বাঁশির আকুল কান্নায় গোপন স্থান হতে সৈন্যগণ, আর্ত-আহতদের দল, একে একে এসে একত্রিত হল শ্বেত সেনাপতির পাশে। চক্রাকারে সবাই দাঁড়াল। ঝড়ে বিধ্বস্ত কাকের মতো সকলেই জবুথবু। কেউ কেউ ক্ষত বিক্ষত। পিটুনির টাটানি এখনও তাদের চোখে মুখে পরিস্ফুট। তাদের সর্ব-শরীরে অবসাদের চিহ্ন। শ্বেতাঙ্গ সৈন্যাধ্যক্ষরা ভয়ার্ত সৈনিকদের কি যেন বলছিলেন।

তিন টমির অঙ্গভঙ্গি দেখে স্বাধীনতা সাধকদের অনুমান করা শক্ত হলনা, যে শ্বেতাঙ্গরা সাকরেদদের ভাঙ্গা মনোবল চাঙ্গা করছেন। চেতবানী দিয়ে চেলাদের মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছেন।

অল্পক্ষনের মধ্যেই নতুন সেনা যোগ দিল। ক্ষয়িষ্ণু বাহিনী বর্দ্ধিষ্ণু হল। নতুন পুরাতন মিলেমিশে এক বিরাট বাহিনী এবার জালালাবাদের অভিমুখে এগিয়ে আসছে। তবে এবার ঘোমটার নিচে খেমটা নাচ নয়। এবার সটান হয়ে, বুক উঁচিয়ে মেরুদণ্ড সোজা রেখে সঙ্গীন উঁচিয়ে ডবল মার্চ করে দ্রুত বেগে ছুটে আসছে।

এই শত্রু বাহিনী পরিচালনা করছে তিনজন শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি। সেনাপতিদের পোষাক তিনটি বা চারটি অতি উজ্বল ধাতুর তারকা দ্বারা শোভিত। চার তারা বিশিষ্ট এক আর্মি-টমি আর্মিকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে

নিয়ে চলেছে। যে আর্মিকে দ্রুত এগুতে নিজেও ছুটোছুটি করছে। সৈন্যদের তাড়া দিচ্ছে। অন্ন একজন টমি সৈন্যদলের মধ্য-ভাগের তত্ত্বাবধানে আছে। সিপাইদের উত্তেজিত করতে সে কালাপাহাড়ী-প্রয়াসে হুমকি দিচ্ছে, জওয়ানদের বার বার ধমকাচ্ছে। অহঙ্কারী সাহেবের বিনা কারণে বা নগন্য ত্রুটিতে মেজাজ বিগড়াচ্ছে। 'সোয়াইন', 'রাসকেল' বলে কালা আর্মিদের গালি দিচ্ছে। তৃতীয়জন সর্ব পিছন হতে বাহিনীকে তাড়া করছে, দ্রুত চলতে বাধ্য করছে। উৎপীড়ন করে উৎসাহিত করছে।

তিন শ্বেতাঙ্গ সেনা অধ্যক্ষেরই রোষ, ঈর্ষা আর শঙ্কা সৈন্য চালনার মধ্য দিয়ে চোখে মুখে ফুটে বেরুচ্ছে।

আর ভারতীয় বাহিনী সব অবমাননা নীরবে সহ্য করছে। এই তিন দাম্ভিক মুক্তি পাগলদের গণ্ডুষে গিলে ফেলার আস্ফালন দেখাচ্ছে, তাদের বন্দী করার জন্য নানান ফন্দি আঁটছে।

পড়ন্তবেলার দিগন্তব্যাপী উজ্জ্বল সূর্য্য কিরণ শাণিত বেয়নেটের উপর পতিত হয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে, ঝিকমিক করছে, চোখ ঝলসিয়ে দিচ্ছে।

ব্রিটিশ টমিরা এই অস্ত্রের ঝনঝনানি, বিরাটবাহিনীর প্রদর্শনী আর ঝুটা মুখের ফুটানি দেখিয়ে সন্ত্রস্ত করে বীর বিপ্লবীদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে চেষ্টা করছে। তাদের আচরণে দণ্ডমুণ্ডের কর্তার অভিব্যক্তি।

"উল্টা বুঝিল রাম"

এদিকে এই সমস্ত গৃহত্যাগী তরুণ রাজনৈতিক সন্ন্যাসীগণের মন প্রচণ্ড জীবন শক্তিতে কানায় কানায় ভরা। এই মৃত্যুঞ্জয় বীরেন্দ্রগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ— শত্রুর আক্রমণ কঠোর হাতে প্রতিহত করবই। খর্ব করব তাদের গর্ব। স্বাধীনতা হরণকারীদের বিতাড়িত করব, তারপর রেহাই দেব। তাঁরা জানেন শত্রুতা দূর করার সর্ব্বোত্তম উপায়, শত্রু নির্মূল করা।

অপরদিকে দেশী গোলন্দাজগণ এগুচ্ছে দোলা চিত্ত মন নিয়ে, ভুগছে মানসিক অবসাদে, বিব্রত সংশয় আর সন্দেহে। তারা দ্রুত চলছে, তবে চলার ছন্দে পতন ঘটছে, পায়ের চাটুতে দুর্বলতা যেন জড়িয়ে ধরছে। পা টলছে, শরীর সামনে এগিয়ে চললেও মন পিছনে টানছে। অধিকন্তু একদেহে এত শক্তি কাদের পক্ষে সম্ভব তা তারা বুঝতে পেরেছে। দেশ ভক্তদের প্রথম

জংগী সংকল্পের দন্ড এখনও গারোয়ালী সিপাহীরা অনুভব করছে। সিপাইগণ আর্মিতে যোগ দিয়েছে অস্তিত্বের তীব্রতম সংকটে পড়ে, পেটের জ্বালায়। তা না হ'লে এদেশ তাদেরও।

এমন সময় জেনারেল বল গলা ফাটিয়ে বললেন,—"ঐ তো কুত্তাগুলি আসছে।" তাঁর বজ্রনাদ রণবীরদের মনে আগুন ধরিয়ে দিল। আক্রমণকারী বাহিনী ডবল মার্চ করে দ্রুত ছুটে আসছে। তা দেখতে মাষ্টারদা সামনে এগিয়ে এলেন। যুদ্ধের আনন্দে তাঁর স্ফুরিত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন উজ্জ্বল আনন। তিনি মন্তব্য করলেন,—"ঝকঝকে অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখান চলে, যুদ্ধে জয় তা দিয়ে চলে না। আবার চ্যালেঞ্জ যতই কঠিন হয় মাষ্টারদাও তত বেশী জেদী হচ্ছেন।

ইতিমধ্যে শত্রু সৈন্য নিজের সীমানার মধ্যে দেখেই মুক্তি সেনাদের বীর সত্ত্বা উদ্বুদ্ধ হল। নৈষ্ঠিক বীরদের মনের শক্তি আর মাংসপেশীর ক্ষমতার উপর নিজেদের অগাধ আস্থা। তাঁরা ছিলেন দেশপ্রেমের মধ্য দিয়ে সত্যের প্রতিভূ। স্বভাব সংযমী চরিত্রবান, আত্মত্যাগ প্রধান যথার্থ বিপ্লবী। তাঁদের বিচারে মনুষ্যত্ব আর বিবেক সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। দেশের এমন কোন ভাবনা নাই যা তাদের স্পর্শ করে নাই।

তাই তাঁরা জীবনের সব ভুল ভুলে গিয়ে একেবারে নির্ভুলভাবে দেশকে ভালবেসেছেন। শুধু তাঁদের ইচ্ছা ও উৎসাহই ছিল না, ছিল প্রচন্ড কর্ম-ক্ষমতা। তাঁরা তিরিশের দশককে মুক্তির দশক করার শপথ নিয়েছেন। শৃংখল ছাড়া তাদের হারাবার কিছুই নাই, কিন্তু জয়ের জন্য আছে সারা ভারতবর্ষ।

তাঁরা সৎ, মহৎ, সাহসী, তেজস্বী, কর্তব্য-কঠিন যুবক।

"চাইনা নেতা, চাই জেনারেল"

দুর্বৃত্তরা মুক্তি পিপাসুদের গুলীর সীমাবার মধ্যে প্রবেশ করতে না করতেই জেনারেল বলের কণ্ঠ গর্জ্জে উঠল,—"ফায়ার"। সেই ভীম গর্জ্জনের শিহরণ শতগুণ ভীষণ হয়ে দশদিকে ফিরতে লাগল। সেই গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে রণমত্ত সেবাব্রতীদের সর্ব্বাঙ্গে সংহার শক্তি জেগে উঠল।

তখন জেনারেল বল শত্রুর মধ্যে ফাটল ধরাতে রন্ধ্র খুঁজছেন। উভয়দিক

থেকে অজস্র গোলগুলি চলতে লাগল। ব্রিটিশ-বিপ্লবী যুদ্ধ পলকে প্রলয় রূপ ধারণ করল। সেই প্রলয়ে থরথর করে কেবল জালালাবাদই নয় শত্রুর বুকও কেঁপে উঠল।

গুড়ুম গুড়ুম বোমা ফাটছে, কম্পিত হ'চ্ছে চারিদিক। ফায়ারিং-এর পর ফায়ারিং হচ্ছে, কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করছে। প্রাণে নিদারুণ শঙ্কা জাগছে।

ফায়ারিং-এব পর লোডিং. লোডিং-এর পর ফায়ারিং শত্রুকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে।

একদল দেশপ্রেমিক দেশজননীর মুক্তির জন্য জীবনপণ করে মরীয়া হয়ে যুদ্ধ করছেন। আর ব্রিটিশের ভাড়াটিয়া নোকরগুলো নোকরির ভয়ে নাকাল হয়ে যুদ্ধ করছে। সিপাইদের এটা বৃত্তি, বিপ্লবীদের ব্রত।

আবার মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান ছিল সামরিক বিচারে অধিকতর সুবিধা-জনক স্থানে। তাঁরা ঝোপের আড়াল হতে লক্ষ্যে লক্ষ্য স্থির করে একেবারে নির্ভুলভাবে গুলি ছুঁড়ছিলেন। প্রতিটি গুলি শত্রুকে ঘায়েল করছিল। দেশসেবকগণ ছিলেন ঝোপের আড়ালে শত্রুর দৃষ্টির বাইরে তাই শত্রুর উদ্দেশ্য-বিহীন এলোমেলো গুলি চালনা সেবক-সেনাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি।

তাঁদের আত্মদীপ্ত ভাব, আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস বিজয়ের আশা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিল।

বীর বিপ্লবীগণ বিপক্ষের রণস্তম্ভগুলি একটি একটি করে ছারখার করে দিতে লাগলেন। ব্রিটিশবাহিনীর জওয়ানগণ লজ্জাবতী লতার ন্যায় গুলীর আঘাতে ঢলে পড়তে লাগল। যারা হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ে চড়ার চেষ্টা করছিল, গুলীবিদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করে রক্তাক্ত দেহে সেখানেই পড়ে রইল।

ঘরপোড়া গরু লাল মেঘ দেখেই ভীত ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাছাড়া তাদের সাহস ছিল, বাতিতে ফুঁ দিলে নিভে যাবার মত ক্ষণ-ভঙ্গুর।

রণ-উত্তুঙ্গ হওয়ার মুখেই রণেভঙ্গ দিয়ে ভীত ব্রিটিশ সৈন্য আক্রান্ত মৃগপালের ন্যায় প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল। তাদের কম্যান্ডার ত্রয় ভয়ার্ত জওয়ানদের ফেরাতে বার বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। পলায়নপর ব্রিটিশ ভক্তদের ব্যস্ততা দেখতে বীর নেতা মাষ্টারদা গর্বিত পদক্ষেপে সামনে এসে দাঁড়ালেন। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্বপ্ন-দ্রষ্টা দলের

সর্বাধিনায়ক। বিপ্লবীদের বিজয়ে, উৎসাহে, আনন্দে, বিস্ময়ে ও উচ্ছ্বাসে তাঁর প্রজ্ঞা-সম্পন্ন মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত।

উদ্দীপনায় তিনি জয়-ধ্বনি দিলেন, "বন্দেমাতরম"। সেই ধ্বনি মুহূর্তের মধ্যে একান্নটি কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—"বন্দেমাতরম, ভারত-মাতা কি জয়।"

সেই আনন্দ ধ্বনিতে জালালাবাদ আর তার চরাচর উল্লাসে উদ্দাম। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল জালালাবাদের অপরাহ্নের আকাশ ধোঁয়ার কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তার বক্ষে চাপ চাপ রক্তের দাগ আর নিথর মৃতদেহ। চারিদিক বিষন্ন করে বাতাসে ভেসে আসছে আহতদের আর্তনাদ, গোঙানি আর কান্না।

শত্রুর রক্ত-রাগে রঙীন হল রণভূমি জালালাবাদ। রণ ও রক্তের অনবদ্য স্মৃতি ফলক।

এই বিজয় ছিল ভারতের জয়—অত্যাচারিত ভারতবাসীর বহু প্রত্যাশিত কামনা। স্বাভাবিক কারণে ভারতীয়রা ছিলেন উল্লসিত,এমনকি বিপ্লব-বিদ্বেষীদের মনের অতলেও জয়ের নির্যাসটুকু নিংড়ে নিয়ে অশেষ আনন্দের উন্মেষ হয়েছিল।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গরা! তিন শ্বেতাঙ্গ টমির কানের ভিতর দিয়ে এই বিজয় উল্লাস মর্মে প্রবেশ করে তাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। বিপ্লবীরা অনুমান করতে পারছিলেন, তিন সাহেবেরই সর্বাঙ্গে জল-বিছুটির দংশন জনিত জ্বালা। প্রথম পরাজয়ে তাদের মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। দ্বিতীয় পরাজয়ে তাদের মন এবং মেরুদণ্ড দুই-ই ভেঙ্গে পড়েছে। শুধু সাহেবদের নয় গোটা পল্টনেরই।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর তাঁরা একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। সে পথ ন্যায়ের পথ নয়। যুক্তিরও নয় তবে বুদ্ধির পথ। যে কূট বুদ্ধির সাহায্যে ব্রিটিশ পলাশীর রণাঙ্গণে বঙ্গ বিজয়ী হয়েছিল, যে ছলাকলার দৌলতে বণিকের তুলাদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছিল, যে চাতুরী ব্রিটিশকে ভারতের ভাগ্য বিধাতা করেছে, সেই ধূর্ততাই আজও তাদের বিজয় বিধান দেবে। ষড়যন্ত্রই সর্ব শ্রেষ্ঠ তন্ত্র।

খোল তরবার, এ সব দৈত্য নহে তেমন

পাহাড়ের চূড়ায় রাজদ্রোহীগণের বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে এখনও রণভূমি মুখরিত। অপরদিকে শত্রু শিবির নীরব, এই নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা বিপ্লবীদের উদ্বেগের কারণ হল।

অনেকক্ষণ কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই। লোক চলাচলের আভাস-টকুও নাই। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দৃঢ় বিশ্বাষ—এই স্তব্ধতা ঝড়ের পূর্বাভাস। কোনও কূট চক্রান্তের লক্ষণ। এ সম্বন্ধে সকলেই একমত।

এখন প্রশ্ন হল এই যুদ্ধের ঢঙ কি হবে। শক্তিই বা তার কত, কি? এই অজানা আশঙ্কায় সকলেই চিন্তিত। এই অবস্থায় জেনারেল বল ধ্বনি না দিয়ে চুপকরে বিপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষনের নির্দেশ দিলেন।

জালালাবাদ তখন নিস্তব্ধ। সন্দিগ্ধ বিপ্লবীরা অধীর উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষারত, বিজয় আর বিস্ময় তাদের স্বপ্ন। তাঁরা যে স্বাধীনতার সৈণিক। শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝা গেল মিনিট পনের পরে। স্বদেশ প্রেমিকদের দুশ্চিন্তা আর মনের শংকা, রণডংকা হয়ে গুলি বর্ষণের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। এক অবিশ্বাস্য মূর্তিতে বিপ্লবীদের দুর্ভাবনা রূপ নিয়ে বিকশিত হল। এতক্ষণ অরিগন গোপনে, অতি সাবধানে, অতর্কিত আক্রমনের মতলব আঁটছিল। সম্মুখ সমরে, ন্যায়-নীতির যুদ্ধে তাদের অনিহা। তাই চতুর ইংরেজ সৈন্য বিপ্লবীদের দুই পাশের বেশ উঁচু দুইটি পাহাড়ে লোকের অজ্ঞাতসারে, কৌশলে সৈন্য সমাবেশ ও মেশিনগান স্থাপন করেছে। একটি মেশিন গান জালালাবাদের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে, অপরটি উত্তর-পূর্ব কোনে বসিয়েছে।

এই যাঁড়াশি অভিযান সামরিক অভিধানেও নতুন। তাই স্বাধীনতার পথ-প্রদর্শকগণ প্রথমে ঠিক ঠিক ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেননি। মেশিনগানের চারপাশে সেনানীগণ স্থান নিয়েছে আর পদাতিক সৈন্যগণ পাহাড়ের বক্ষদেশে রাইফেল হাতে অর্ধ চন্দ্রাকারে সমবেত হয়েছে।

দুই পক্ষেরই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি।

দুর্নীতি নিপুণ ব্রিটিশ সেনানায়কগণ নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে ঘৃন্য পশ্চাদাক্রমণকে রণ-নীতি বিরুদ্ধ আচরণ বলে মনে করে নাই।

দুদিক থেকে আক্রমণে জালালাবাদ আবার রণরঙ্গিনী হয়ে উঠল।

জালালাবাদের বক্ষ আবার ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠতে থাকল। সমর আকাশে আকস্মিক এই ধূমকেতুর আবির্ভাবে স্বদেশ সাধকদের উপর অপ-প্রভাবের প্রকোপ পড়ল। তাঁরা বিচলিত হলেন, একটু বিভ্রান্ত ও। তবে তা ক্ষণিকের জন্য।

এই বিভ্রান্তির সন্ধিক্ষণে মাস্টারদা, যাঁর পরোক্ষ প্ররোচনায় ও প্রত্যক্ষ প্রেরণায় পূর্বের বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছিল, বললেন,—"দেশের স্বার্থে আত্ম-ত্যাগব জন্য বাংলার সুনাম আছে, তবে তোমরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করলে তা স্বপ্ন-কথা ; আর যা করবে তা স্বপ্নেরও অতীত।" মাস্টারদা'র কথার বিদ্যুৎ স্পর্শে মুহূর্তের মধ্যে আজাদী সেনাদের মাথায় বুদ্ধির জাদু খেলে গেল। নেচে উঠল শিরায় শিরায় বিপ্লবী রক্ত কণিকা ; ভৈরব আনন্দে ভরে উঠল মন। বাংলার তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে পুনরায় চলল ব্রিটিশ রাজশক্তির গোলাগুলি বিনিময়।

এতো শুধু জয়-পরাজয়ের যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ। স্বাধীন ভারতের জন্য রয়েছে জীবনাহুতির সংকল্প। হয় জয়, নয় জীবন ক্ষয়। মুক্তি যোদ্ধারা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ—যত জীবন চাই দেব, যত রক্ত লাগে ঢালব। তবুও বিনিময়ে স্বাধীনতা চাই। সবার মনে এই বীরত্ব ব্যঞ্জক অভিনব ভাবধারা। সকলেই জাতীয় চেতনায় ডগমগ। ভারতের এই মহা দুর্দিনে তাঁরা পৌরুষ আর নির্ভীকতায় কেতন উড়িয়ে দিয়েছেন।

এটা নিবীর্য্য প্রতিরোধ নয়। সক্রিয় রাইফেল মেশিনগান যোগে স্বাধীনতার জন্য জীবন মরণ শৃংখল ছেঁড়ার লড়াই।

গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। গুলির আঘাতে জালালাবাদের ধূলি উড়ছে, মাটি উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, ধরণী কাঁপছে।

বিপ্লবীরা মনে জাতীয় ভাবোদ্দীপক ভাবনায় উত্তাল সমুদ্রের মত মাতন জাগিয়ে তুলেছে। তাঁরা বজ্রের মত অমোঘ।

মুক্তিকামী বীরদের সুদৃঢ় বিশ্বাস শত্রু বাহিনীর এই অবিশ্বাস্য ছলনার যথাযোগ্য জবাব তারা দেবেই দেবে। এই আত্মবিশ্বাসে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের গতি, হৃদয় স্পন্দন, মস্তিষ্কের ক্রিয়া বহুগুণে বেড়ে গেল, জেনারেল বুল রণনীতি বদলে দিলেন। আদেশ দিলেন,—"লাই ডাউন, শুয়ে মাটির সাথে মিশে যাও। নির্ভুল নিশানায় ফায়ারিং কর। প্রতিটি অব্যর্থ গুলিতে শয়তানদের নিহত কর।" তাঁর উপদেশ—"রণনীতি আকাশ হতে কড়ে পড়েনা,

কারুর নিকট ধার করা যাবে না, নিজের মধ্যেই সেই মহা শক্তির আবির্ভাব ঘটাতে হবে।

হুকুম তৎক্ষণাৎ হুবহু পালিত হল।

শত্রুর বৃষ্টির ধারায় গুলি বর্ষণ সব বিফলে গেল।

এই গুলির ঝড়ের মধ্যেও বিপ্লবীদের মনে উৎসাহ উচ্ছাসের এতটুকু ভাটা নাই, ভয়ের লেসমাত্র নাই। সকলেই রুদ্ধ চাঞ্চল্যে উদ্দীপ্ত। সাহস আর দৃঢ় সংকল্পে প্রত্যেকের মনকে প্রদীপ্ত করেছে। এই প্রাণ-পণ প্রয়াসের একটাই উদ্দেশ্য, তা হল ব্যক্তি ও সমাজের সার্বভৌম মুক্তি, এই মুক্তির জন্য বীরের বীরত্ব, পুরুষের পৌরুষত্ব, মানুষের মনুষ্যত্বের প্রভৃতির গুণের সমন্বয় ঘটেছে মুক্তিকামী সংগ্রামীদের প্রত্যেকের চরিত্রে।

অব্যক্ত রূপের এক অদৃশ্য শক্তি স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে ক্রিয়াশীল। সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মানবীয় দৃষ্টিতে তা ধারণার অতীত।

সেই মহা ইচ্ছা-শক্তির আকুল আকুতি বারবার বিপ্লবীদের প্রবুদ্ধ করেছে যুদ্ধার্থে উত্থিত হও। দেশ নিষ্কণ্টক কর। ভীত হইও না। যুদ্ধে নিশ্চয়ই জয়ী হবে। ভবিষ্যতে কল্যান রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিঘ্ন স্বরূপ বিদেশী দস্যুদের হত্যা কর। নির্দোষ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে প্রতিষ্ঠাবান হও।

অন্তরের এই সত্য-শরণ সমোজ্জ্বল নির্দেশ আর জেঃ বলের আদেশে বিপ্লবীরা দুরাত্মা বিনাশী যুদ্ধে মেতে উঠলেন।

তখনও অস্তায়মান রবির শেষ রক্তিম রশ্মি পাহাড়ের গায়ে জড়িয়ে রয়েছে। এখনও দিবাকর যাই যাই করেও জালালাবাদের ভাগ্য নিরক্ষণ করতে ক্ষণিক দাঁড়িয়েছে। দিনান্তের আবীর লাল আলোতে শত্রুর গতিবিধি পরিস্কার প্রতীয়মান হচ্ছে।

মুক্তিযোদ্ধাগন শত্রুদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছেন। একটি গুলিও যাতে লক্ষভ্রষ্ট না হয় সেজন্য সকলেই সতর্ক ও সাবধান রয়েছেন। প্রতিটি নিক্ষেপে শত্রু নিপাত করছেন। প্রচন্ড গতিতে স্বাধীনতা সাধকগণ যুদ্ধ যুদ্ধে যাচ্ছেন। বিদ্যুৎ গতিতে আঙ্গুল দিয়ে রাইফেলের ট্রিগার টিপছেন। মেশিনগানের বিরুদ্ধে যোগ্য প্রতি উত্তর দিচ্ছেন।

আজ সকালেও যাঁরা ছিলেন সৌম্য, ছিলেন স্বাভাবিক, তাঁরাই এই ধড়িবাজ আক্রমনের বিরুদ্ধে অতি রুদ্র, তেজোময় সংহার মূর্তি ধারণ করেছেন। তারা লক্ষ্য করলেন শত্রুর মেশিনগানের চারিপাশে চার পাঁচ

জন বৈরী গোলান্দাজ জড়াজড়ি হয়ে পরিদর্শনে রত। পরিদর্শকদের মধ্যে লাল মুখও ছিল। তাদের দেখেই যেন বিপ্লবীদের রক্ত গরম হয়ে উঠল। নিশানা স্থির করে কয়েকটি গুলি ছুঁড়লেন কোনও এক স্বদেশ পাগল। নিমেষের মধ্যে কেউ ধরণীর ধুলোয় গড়িয়ে পড়ল। কেউ গা ঢাকা দিল।

সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যের সুস্পষ্ট স্মৃতি এখনও আমার মনের পটে আঁকা রয়েছে।

"কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ মুক্তি পণ!"

সামনের পাহাড় হতে বাত্যাতাড়িত শ্রাবণের ধারার মত গুলি ছুটে আসছে। রাইফেলের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ মেসিনগানের টরটর শব্দ, বোমার বিস্ফোরণ বায়ু তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গকে রূপান্তরিত করেছে। সেই কান ফাটা ভয়ংকর নাদে কানে তালা লাগার উপক্রম।

নিরবিচ্ছিন্ন টোটার আঘাতে গ্যছের ডাল ভাঙ্গছে, পাতা ছিঁড়ছে, পল্লব ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে জালালাবাদের বুক ঢেকে দিয়েছে।

কার্তুজের আঘাতে মাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। সোঁ সোঁ শব্দে ছুটন্ত গুলি দুরন্ত বেগে উড়ে আসছে। মেশিনগানের কার্তুজ আজাদী সেনাদের কানের পাশ দিয়ে ডান পাশ বাঁ-পাশ দিয়ে বেগে ধেয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। গুলির আঘাত ঝোপঝাড় লতাগুল্ম সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। বারুদের গন্ধে রা ইফেলের ধোঁয়ায় পাহাড়ের নির্মল বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

দু-দিক থেকে বৃষ্টির ধারায় গুলি বর্ষণ হচ্ছে। এই গুলির বর্ষণের মধ্যে কোন দিক থেকে তাদের কোনও অভয় নাই, তবুও আপন শক্তির উপর মুক্তি যোদ্ধাগণ নির্ভর।

ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে। চারদিক থেকে মৃত্যুর হাতছানি, তবুও স্বীয় কর্তব্যে এতটুকু শিথিলতা নাই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মরণের ভয় নাই, দ্বিধা নাই, জয়ের চেষ্টায় ত্রুটি নাই।

এই অবস্থার মধ্যেও আপন ভোলা মৃত্যু-পাগলদের একমাত্র পন—রণে জয়। প্রাণ যদি যায় যাক না, তবুও মান থাক। দেশের মান বিপ্লব-বাদের মান।

মরণ জীবন সম্পর্কে এই তরুণদল যেভাবে চিন্তা ভাবনা করেন তা হল—কি ছার এ জীবনে? কি ভয় মরণে? হয়তো সমরে জিতব নয়তো

অ-মরণ মরব। এ জীবন ধন্য হবে। এ মরণ পুন্য হবে। এই মহা মৃত্যু স্মরণ করে এদেশ জাগবে।

এমনই এক উদ্দীপনাময় বাসনায় উন্মত্ত হয়ে বিপ্লবীগণ নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় রাইফেল চালিয়ে চলেছেন। রণ-চন্ডীর বিক্রমে জঙ্গল জঙ্গম এদিক ওদিক ওলট পালট হচ্ছে। দু-দিক থেকেই পরস্পরের প্রতি বিরতিহীন গোলগুলি চলছে।

জয় পরাজয়ের ফয়সলার মুহূর্তে স্বদেশ সাধকদের মাথায় একি অকস্মাৎ বজ্রাঘাত। তাঁদের হাতের কয়েকটি মাস্কেট্রিগান ধোঁয়া ও ময়লায় নীরব। তাঁরা যুদ্ধের প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছেন, নিজেদের শক্তি সংগ্রামের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বিজয় অনেকটা সাধ্যের এসে গেছে, সেই সময়ের মূল্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট মহা মূল্যবান, এমন সময় হায়, তীরে এসে তরী ভরাডুবি হতে বসেছে। অধিকাংশ রাইফেল অচল। রাইফেলের চেম্বার কালি জমে জ্যাম। কার্তুজ লোড হচ্ছে না, ফায়ারিং প্রায় বন্ধ, বলতে গেলে এখন এক তরফা গুলি চলছে।

নিরুপায় মুক্তি যোদ্ধারা চুল ছিঁড়ছেন, হাত কামড়াচেছন। পিঞ্জরাবদ্ধ উত্তেজিত সিংহের ন্যায় অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করছেন, বজ্রাহতের ন্যায় মাষ্টারদা স্তম্ভিত। বিষন্ন নির্মলদা পাশে বসা। নির্মলদা সমর বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ।

এই আগ্নেয়াস্ত্র কুশলী হাতের রাইফেলটি তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেন। মনযোগ দিয়ে এদিক ওদিক উল্টে পাল্টে দেখলেন। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে দু-একটি টাইট করলেন, ম্যাগাজিন মেসিন তেল দিয়ে পরিস্কার করলেন। ট্রিগার টিপে দেখলেন সব ঠিক আছে। আনন্দে সকলকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বললেন—"মুস্কিল আসান"। তাঁর এই 'আসান' শব্দ শুনেই নব যুবকগণ শুধু আশ্বস্ত হলেন না, আশায় আবার বুক বাঁধলেন। যুদ্ধাস্ত্র বিশারদ অচল আগ্নেয়াস্ত্রগুলি সচল করে যুদ্ধার্থীদের হাতে হাতে দিতে লাগলেন।

মাষ্টারদা সারানো রাইফেল হাতে নিয়ে সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে যুদ্ধে লিপ্ত যোদ্ধাদের হাতে তুলে দিতে লাগলেন। আবার বিগড়ে যাওয়া রাইফেল অনুরূপভাবে নির্মলদা'র কাছে পৌঁছাতে লাগলেন। নেতার এই প্রাণপণ উদ্যোগে অনুরাগীদেরও উদ্যম বৃদ্ধি পেল। এতক্ষণ যা ছিল

স্তিমিত সেই সংগ্রাম আবার তুঙ্গে আরোহন করল। যুদ্ধ আবার প্রলয় রূপ ধারণ করল।

"মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান!

ইতিমধ্যে শত্রু সৈনাদের ক্ষয় ক্ষতি হ্রাস করতে ব্রিটিশ সেনানী সৈন্য সমাবেশ পরিমার্জিত করলো। এই অনিবার্য কারণে যুদ্ধের হালচাল বদলে গেল। নির্ভুল নিশানা নিশ্চিত করার জন্য কোন কোন মুক্তি যোদ্ধার পক্ষে স্থান পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠল।

হরিগোপাল বল (টেগরা) শায়িত ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। আমার ডান দিকে ছিলেন বাঁ দিকে গেলেন। উদ্দেশ্য, লক্ষ্যকে লক্ষ্যভেদ করা। পায়ে তাঁর এগিয়ে যাওয়ার গতি। হাতে বগল দাবা করে রাইফেল। ডান হাতের তর্জনীতে ট্রিগার টিপে গুলি ছুঁড়বার তৎপরতা, কণ্ঠে গান. 'কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান'। তখন গুলির ঝড় বইছে। ঝড়ের মধ্যে টেগ্রা গুলি ছুঁড়ছেন আর সামনে চলছেন। টেগার কণ্ঠের গান শেষ করা হলনা। এক ঝাঁক গুলি এসে টেগ্রার বুক চালুনির ন্যায় ঝাঁঝরা করে দিল।

টেগ্রার প্রশস্ত বুক থেকে ফোয়ারার ন্যায় ফিনকি দিয়ে অনেকগুলি রক্তের ধারা ঝরতে লাগল, টেগরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, সটান ধপাস মাটিতে পড়ে গেলেন। হাতের রাইফেল ছিটকে দূরে চলে গেল। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী টেগ্রা, মরণ হুঙ্কারে ডাক দিয়ে বলে গেলেন, "সোনাভাই আমি চললাম। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও।" টেগ্রার শেষ বাণী অনেকের মনকে বিদ্ধ করল। জালালাবাদ যুদ্ধে টেগ্রা প্রথম শহীদের গৌরব অর্জন করলেন।

আমার ডান দিকে মোড় নিতেই দেখলাম প্রভাস বল ভূলুণ্ঠিত। মল্লবীর সৎ, মহৎ কারিৎকর্মা প্রভাস জীবনের শেষ সম্বল রাইফেলটি বুকে নিয়ে আকাশমুখো হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর বিরাট বুকের রক্তের স্রোতে জালালা-বাদের মাটি পুণ্যস্থান করছে। রক্তাক্ত প্রভাসের প্রশস্ত বক্ষদেশ। আঠারটি বসন্তের তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেশের মাটি। প্রভাসের মুখমণ্ডল সদ্য ফোটা ফুলের সুষমায় ভাস্বর।

ত্যাগের কি উজ্জ্বল নিদর্শন, আমার দু-পাশে একই বংশের দুই ভাই মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে।

হাসি মুখে চলে গেলেন। যাবার বেলায় তাদের মৃত্যুহীন প্রাণ দেশকে দান করলেন। বীরত্বের আর এক বিগ্রহ।

অদূরে দাঁড়িয়ে লড়ছেন বিধু ভট্টাচার্য। তিনি শারীরিক দুঃখ সুখের প্রতি উদাসীন। যুদ্ধের প্রাণ পুরুষ বিধু আন্তরিক প্রয়াস আর যত্নে একাই একশ। বিপ্লব মণিমালার মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন, জীবনের সব আশা শেষ করে দিয়ে স্বাধীনতার প্রয়োজনে কঠিন বোঝাপড়ায় ব্যস্ত।

বিধু বজ্রপাতের মত বিধ্বংসী ফায়ারিং-এ যুদ্ধবাজদের নিপাত করছেন। প্রতিটি গুলিতে নির্ভুল নিশানায় দেশের দুশমনদের পর্যুদস্ত করছেন। তিনি ঝোপ বুঝে কোপ মারছেন। তিনি যুদ্ধকে বিজয়ী যুদ্ধে রূপ দিতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মরণ পণ যুদ্ধে যে নব যুগের দক্ষ-যজ্ঞ সৃষ্টির চেষ্টায় আছেন। বিধু কখনও খাদে নেমে, কখনও চড়াইতে চড়ে প্রবল শক্তিতে রাইফেলের মুখে ঝড় তুলে শত্রু লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছেন-ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে যেদিকেই দেশের দুশমন ও তাদের পোষা কুকুরগুলিকে দেখতে পাচ্ছেন সেদিকেই আক্রোশে আক্রমণের পর আক্রমণ হানছেন।

বিধুর বিচারে—এক টুকরো রুটির লোভে যারা পরের পা চাটে তারা ভারতীয় নামের অযোগ্য। তারা কুকুর।

প্যাঁচ যুদ্ধে লিপ্ত বিজিগীষু বিধু বারবার স্থান পরিবর্তন করছেন। চাতুর্য্য-পূর্ণ যুদ্ধে সর্বার্থ সাধক বিধু যেন শত্রুর মনে হৃদকম্পের সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছেন। বিজয় সাধনায় তাঁর অন্তঃস্থল আলোড়িত। তাঁর মধ্যে যেন শক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত। আঘাতের পর আঘাত করে হরণ করতে চান তাদের মনবল, হানার পর হানা হেনে বুঝিয়ে দিতে চান বীরত্ব কাকে বলে।

প্রতাপের প্রতিপত্তিতে প্রতিপক্ষ যখন স্তম্ভিত, সেই সময় চীৎকার করে সকলের উদ্দেশ্যে বিধু বললেন,—"আমারে হাঁদাইছে রে" বলেই পাহাড়ের উপর বিধু ঢলে পড়ে গেলেন। প্রিয় বন্ধু নরেশকে ডেকে বললেন, "আমি চললাম, তুমিও আইয়।"

গুলির গর্জনের মধ্যে তাঁর গলার স্বর ডুবে গেল। আর কিছুই বুঝলাম না। সংগ্রামক্ষেত্রে তখন প্রলয়কান্ড। নির্ম্মম নির্ভীক আজাদী সৈন্যগণ।

আমি যুদ্ধ করছি, এগিয়ে যাচ্ছি। কে কোথায় আছে দেখছি। দূরে, বেশ দূরে, একটা ঝোপের আড়ালে ত্রিপুরা আহত হয়েও লড়ে যাচ্ছেন।

ব্যায়ামে গঠিত ত্রিপুরার শরীর দশাসই চেহারা। ভলান্টিয়ারদের ব্রিগেডিয়ার পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি লম্বা দেহী ত্রিপুরার ক্ষতস্থান হতে রক্ত ঝরছে। সেই রক্ত চুষে খাচ্ছেন আর লড়ছেন। জীবনটা তো দেশের জন্যই, ভ্রূক্ষেপহীন ত্রিপুরা নিজের প্রতি উদাসীন, বন্দুকের গোড়ালি বগলদাবা করে একবার পূর্ব-উত্তর কোনে, আরবার পূর্ব-দক্ষিণ কোনের দিকে ঘুরে ঘুরে অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়ছেন। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন শত্রুর একটা বুলেট এসে যুদ্ধোন্মত্ত ত্রিপুরার বুকটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। ত্রিপুরা একটা ঝোপের উপর ঢলে পড়ে গেলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বিলম্বিত স্বরে অন্তিমবাণী দিয়ে গেলেন "লড়াই-চালিয়ে-যাও-বিজয়-আর-বেশী-দূর-নাই।"

তখন রণক্ষেত্র রুদ্র ভৈরবের রূপ। ভিতর দিক থেকে গুলির ঝড় বইছে। আমার সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে প্রাণের সমান প্রিয় সহযোদ্ধাদের মৃত-দেহ। দেশের মুক্তি আন্দোলনের পুরোধারা আপ্রাণ সংগ্রাম করে, পরপদানত দেশ মাতৃকার অপমান মোচন করতে নিঃশেষে আপন প্রাণ বলিদান করে চলে যাচ্ছেন। এ দৃশ্য আমাকে বিচলিত করল। বন্ধুদের প্রতি মমতায় মন বিগলিত হল। যা অনুভব করলাম তা হল—প্রথমে আমি মায়া-মোহে মুগ্ধ মানুষ, তারপর বিপ্লবী।

পর মুহূর্তেই মিথ্যা মোহ ভঙ্গ হল। অন্তঃস্থলে বিপ্লব সিংহ গর্জে উঠল।

সাহস হারিও না-ভুলে যেওনা, আদর্শ থেকে বিচ্যুতি মানেই জাতীয় জীবনে তোমার অপমৃত্যু। সুতরাং পরাজয় কখনও বরণ করবে না, কি যুদ্ধক্ষেত্রে—কি মনোরাজ্যে—"**বীর-ভোগ্যা-বসুন্ধরা**"।

সত্যকে অস্বীকার করবে কে? বিপ্লবের উজ্জ্বল আলোকে আবার হৃদয় প্রদীপ্ত হল। মন মায়া মমতার উর্ধ্বে উঠে গেল। যে মন দুঃখেতে মুষড়ে পড়েনা, আনন্দে উৎফুল্ল হয়না, সেই মনের দেখা পেলাম। যুদ্ধে বিজয় যে জীবনের চেয়েও মূল্যবান, সেই সত্য উপলব্ধি করলাম।

সেই সময় দিনমনি বিশ্ব চরাচরে তাঁর ছড়ানো আলোক রশ্মি গুটিয়ে সঙ্গে নিয়ে অস্তাচলে চলে যাচ্ছেন। আমিও আমার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবনা রাশি রণজয়ের বাসনায় একত্রিত করলাম।

গোধূলির ক্ষীণ আলোতে দেখতে পেলাম মেশিনগানের পাশে ও পিছনে নতুন বিশেষজ্ঞ ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। সেই ছায়া লক্ষ্য করে গুলি

ছুঁড়লাম। সেই গুলি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হল কি, লক্ষ্য ভেদ করল জানিনা। দিনের আলো নিভে গেল। চারিদিক আঁধারে ডুবে গেল। আমিও আঁধারে ডুবে গেলাম।

জানিনা কখন গুলিবিদ্ধ হলাম, কখন জ্ঞান হারালাম, যুদ্ধের তাণ্ডব আরও কতক্ষণ ছিল তাও বলতে পারব না। রাক্ষসী জালালাবা.দর বুকের উপর আরও কত রক্ত ঝরে ছিল, কতক্ষণ ঝরে ছিল, তার সবই আমার অজ্ঞানা। এইটুকু শুধু জানি, মৃত ভেবে পরিত্যক্ত আমার শরীরে যখন শান্তি নাগ প্রাণের সঞ্চার করলেন, তখন জালালাবাদ বারুদের গন্ধে আচ্ছন্ন।

পরে শান্তির কাছে শুনেছিলাম যে, সর্বত্র ঘুটঘুটে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ভীতি বিহ্বল ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনী "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" নীতি অনুসরণ করে এবং "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" এই মহাবাক্য একমাত্র বাঁচার পথ ভেবে অপেক্ষারত ট্রেনটিতে গিয়ে চেপে বসল এবং হত আহতদের পাহাড়ের উপর ফেলে রেখে ট্রেনটি জোরে হুইস্‌ল দিতে দিতে শহরের দিকে যাত্রা করল।

ট্রেনের শব্দ শুনে বিজয়ী দল এক তরফা ফায়ারিং বন্ধ করলেন। নিস্তব্দ জালালাবাদে তখন বিরাট শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে।

রণক্লান্ত থমথমে যুদ্ধ ক্ষেত্রে লোকনাথ বলের ইচ্ছাক্রমে শোকাকুল বিপ্লবীগণ ভারাক্রান্ত মনে সারিবদ্ধ হয়ে নতশীরে মৃতদেহগুলোর পাশে দাঁড়ালেন। বেদনা কাতর মাষ্টার দা কম্পিত পদক্ষেপে মন্থর গতিতে শায়িত হত ও আহত দেহগুলোর কাছে গেলেন, স্পর্শ করলেন, তাঁদের প্রাণ অনুভব করলেন। বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর একটি মৃতদেহের নিকট গেলেন। একে একে সবগুলি পতিত দেহের প্রাণ পরীক্ষা করলেন।

প্রত্যেকেই যে তার বুকের এক একটি পাঁজর, শোকাহত ও অনুসন্ধানরত মাষ্টারদা আরও এগিয়ে চলেছেন। তাঁর শোকাতুর মনের আশংকা হয়ত এই অন্ধকারে আরও মৃতদেহ অনাবিস্কৃত থাকতে পারে। টলটলায়মান পদে এই ভাবে খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলেন গুলি বিদ্ধ মৃতপ্রায় একটি দেহ। দেখেই বিচ্ছেদ বেদনায় তাঁর বুকের হাড়গুলি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ে, শোকে-দুঃখে অভিভূত তিনি। অম্বিকাদা আহত। যম তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে। এই সংকট মুহূর্তে অশ্রু দিয়ে পূজা ছাড়া আর কিই বা করতে পারেন! মাষ্টারদার চোখ ফেটে জল এল। বুকভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ল।

তবুও অনেক কিছু মুখ বুজে সহ্য করতে হয়—, অনেক দুঃখ, অনেক বেদনা।

মাষ্টারদার আশঙ্কা অম্বিকাবাবুর প্রাণ বুঝি নাই। বেদনা বিধুরকণ্ঠে ডাকলেন— "অম্বিকাবাবু, যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে। হানাদাররা পালিয়েছে। আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা আপনাকে সাহায্য করব, সঙ্গে নিয়ে যাব।"

অম্বিকাদা অতি ক্ষীণকণ্ঠে অস্পষ্ট উচ্চারণে, কিছুটা ইঙ্গিতে, কিছুটা ধরা গলায় খাবি খেতে খেতে বললেন—"মাষ্টারবাবু আমি, আর বেশিক্ষণ নাই, আমার জন্য আপনারা ভাববেন না। আপনি সকলকে নিয়ে এই বিপজ্জনক এলাকা থেকে চলে যান। আপনার দায়িত্ব অনেক। গোটা ভারতবর্ষ আপনার দিকে চেয়ে থাকবে। সারা ভারতবর্ষে আপনার দর্শন ছড়িয়ে দিতে হবে।" বলেই অম্বিকাদা থেমে গেলেন। হাঁপাতে লাগলেন। মুখ হাঁ করে কয়েকবার নিশ্বাস প্রশ্বাস নিলেন। আবার ধীরে ধীরে থেমে থেমে বলতে লাগলেন, "মাষ্টারবাবু, আমি লক্ষ্য করেছি—আমাদের ভাইরা সকলেই নিজেকে একশ' ভাগ বিপ্লবী ভাবে। তাদের দায়িত্ববোধ, শৃংখলাবোধ, কঠোর শ্রম করার ক্ষমতা অসাধারণ।" এই বলে পকেট থেকে দরকারি কাগজপত্র ও কয়েকটা টাকা মাষ্টারদাকে দিয়েই তিনি চেতনা হারালেন।

"মরণ সাগর পারে তোমরা অমর"

সম্মুখ যুদ্ধে ইতিহাস রচনা করে দেশের আলোকবর্তিকা হয়ে যারা জালালবাদেই রয়ে গেলেন তাঁরা হলেন—হরিগোপাল বল (টেগ্রা), নির্মল লালা, পুলিন ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, জীতেন দাশগুপ্ত, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা সেন, শশাঙ্ক দত্ত ও প্রভাস বল। আর অত্যন্ত বীভৎসভাবে আহত হয়ে বন্দী হন অর্ধেন্দু দস্তিদার। বন্দী অবস্থায় স্বীকারোক্তির জন্য বহু অত্যাচার সহ্য করে ২৩শে এপ্রিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। আর মতি কানুন গো? ২৩শে এপ্রিল মৃতপ্রায় আহত মতিকে বর্বর ইংরেজ সৈন্য জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়। এই দ্বাদশ শহীদ স্বর্গের দেবতা নয়। জনগণের পুজার বিগ্রহ হয়ে দেশবাসীর মনের মণি কোঠায় বেঁচে রইলেন।

তাদের ডাকে দেশের ঘুম ভাঙ্গল। তাঁদেরই আলোতে একদিন শৃংখলিত দেশ পথ দেখল।

যুদ্ধক্লান্ত, শোকাচ্ছন্ন বিজয়ী বীরবৃন্দ সারিবদ্ধ হয়ে নতশিরে মৃতদেহের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের মন বিয়োগ ব্যাথায় আকুল। আত্মাকে বিসর্জন দিয়ে যে সমস্ত মহাপ্রাণ তাঁদের আত্মাকে অক্ষয় করলেন, সেই মহা-সৈনিকদের সৈনিক মর্যাদায় স্যালুট দিয়ে তারা শেষ শ্রদ্ধা জানালেন। অশ্রু দিয়ে তর্পণ করলেন, তাঁদের অসমাপ্ত ব্রত উদ্‌যাপন করতে প্রতিজ্ঞা করলেন। পরে পাহাড় হতে অবতরণ করলেন। অবতরণ করার পূর্বে আর একবার ফিরে দাঁড়ালেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সকলেই মৃতদেহগুলির প্রতি চেয়ে রইলেন। হয়তো বেদনাহত হৃদয়ে মৃতের মুখের ছবিটি মনে গেঁথে রাখতে চেস্টা করলেন। প্রার্থনা জানালেন "সমস্ত শুভকর্মে যেন তোমাদের সাহায্য পূর্ণ হয়।" শোকাকুলকণ্ঠে মাষ্টারদা বললেদ—"আজও তোমাদের মুখ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কাল ? তোমাদের সাথে ছিল শুধু প্রাণ, যাবার বেলায় দেশকে তাই তোমরা দান করে গেলে "

তারপর ভারাক্রান্ত মনে ধীরে ধীরে সবাই পাহাড় হতে অবতরণ করলেন, সঙ্গে ছিলেন আহত বিনোদ বিহারী দত্ত আর বিনোদ চৌধুরী। পাহাড়ের ওপর উন্মুক্ত আকাশের নীচে পড়ে রইল দশটি মৃতদেহ ও চারটি মুমূর্ষু আহত।

সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিহিংসার ভয়ে, সেই শবদেহগুলিকে কেউ চন্দন দ্বারা চর্চিত করলেন না। নব বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন না। কোনো পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন না। কেউ ফুল দিলেন না। শব সৎকার হল না।

পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রের বুকে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন মুমূর্ষু অম্বিকা চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু দস্তিদার, মতি কানুনগোয় আর যাকে মৃত বলে ভাবা হয়েছিল সেই সুরেশ দে।

আর ভাগ্য বিপর্যয়ের আবর্ত্তে পড়ে যুদ্ধোত্তর দলটি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পাহাড় হতে অবতরণ করলেন।

দলের সিংহভাগ সংগ্রামী মাষ্টারদাকে অনুসরণ করলেন। দুদিন পরে আশ্রয় নিলেন দলের একনিষ্ঠ সদস্য সুবোধ রায়ের নোয়াপাড়া গ্রামের বাড়িতে। রাতের আঁধার বশতঃ যাঁরা মাষ্টারদাকে অনুসরণ করতে পারেন নি, লোকনাথ বল তাদের সঙ্গে নিয়ে উঠলেন সঙ্গীতাচার্য সুরেন দাশের বাড়িতে। সেখানে রণক্লান্ত যোদ্ধারা উষ্ণ অভ্যর্থণা পেলেন।

জালালাবাদের ঝোপের আড়ালে আরও একজনের হৃদয় শোকে কেঁদে

কেঁদে উঠছে, তিনি আহত অম্বিকা চক্রবর্তী। তিনি সহযোদ্ধাদের সকলকেই ভালবাসতেন। সকলের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ করে নিয়ে সবার গুণমুগ্ধ ছিলেন। সকলেই তাঁর অনুগত ছিলেন। সারারাত শত শত আকাশে তারার মত তিনি মৃতদেহগুলোর উপর নির্নিমেষ দৃষ্টি রেখেছেন। তাঁরা যে তাঁর আপনজন, হৃদয়ের অংশ। বহুকাল ভালবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে যারা আবদ্ধ ছিলেন আজ তারা এক মহৎ আদর্শের বেদীমূলে আত্মদান করে চিরতরে চলে যাচ্ছেন, এই বিচ্ছেদ বেদনা তাঁর হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে।

অম্বিকা চক্রবর্তী গুরুতর ভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর মুহূর্ত গুনছিলেন। বিভীষিকাময়ী জালালাবাদের বুকে কখনও মূর্ছিত কখনও যন্ত্রণা কাতর হয়ে বারোজন শহীদের পাশে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন।

বিধাতা পুরুষ কি অবশেষে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন। রাত্রির শেষ প্রহরে এক পশলা বৃষ্টি হল। বৃষ্টির জলে তাঁর শরীর ভিজল। বৃষ্টির কয়েক ফোঁটা জল তাঁর জিভে পড়ল। জিভের অসাড়তা কেটে গেল। বৃষ্টির জলে তাঁর শরীরের অবসন্নতা দূর হল। তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন। কিন্তু শরীর দুর্বল। ক্ষতস্থান হতে এখনও রক্ত ধারা ঝরে চলেছে। কিন্তু মন। অন্তরে তাঁর তখনও ভারত গড়ার অনন্ত শক্তি।

অতিকষ্টে শুধু মনের জোরে উঠে দাঁড়ালেন। ঠ্যাং ঠক্ ঠক্ করে নড়ছে। শরীর থর থর করে কাঁপছে। মাথা ঘুরছে, স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। রাইফেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। ক্ষত-বিক্ষত, বিকৃত দেহগুলো দেখলেন। মনে পূর্ব স্মৃতি ভেসে উঠল—একদিন এঁরাই ছিলেন তাঁর আশা উৎসাহ আর উদ্যমের উৎস। মনে মনে বললেন—ভারতের ঘোর দুর্দিনে তোমরা এসেছিলে, ভারত তোমাদের ভুলবে না। অথচ তাঁর মন শোকে আচ্ছন্ন, সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্ন গর্বে গৌরবান্বিত। এই বীরেরা তাঁদের মৃত্যু দিয়েই ভারতবাসীর মুক্তির মূল্য জুগিয়েছেন। এই দিনটি যেমন দুঃখের তেমনি আনন্দেরও।

এমন সময় অম্বিকাদা গোঙানি শুনে বুঝতে পারলেন অর্ধেন্দু এখনও জীবিত। তাঁকে আকুল স্বরে, কাছে আয় বলে ডাকলেন।

অর্ধেন্দু শক্তিহীন। বাক-রহিত। অনেক কষ্টে কাতরাতে কাতরাতে বললেন, মাষ্টারদা'র আদেশ—হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু। আবার বাকরোধ হল। মূর্চ্ছা গেলেন।

অর্ধেন্দুর তলপেটে গুলি লেগে নাড়িদেশ তছনছ হয়ে গেছে। নাড়ি-ভুঁড়ি বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। বিভৎস দৃশ্য। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। একটু নড়তে চড়তে ভয়ানক কষ্ট। অম্বিকাদা বুঝলেন, যম অর্ধেন্দুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে।

"মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী"

অম্বিকা চক্রবর্তীর অটল প্রতিজ্ঞা, জীবন থাকতে যুদ্ধবন্দী হবেন না। তাই শক্তিহীন শরীরটাকে টলতে টলতে টেনে নিয়ে চলেছেন।

কিছুদূর গিয়ে আর টাল সামলাতে পারলেন না। ঢলে পাহাড়ের ঢালুতে পড়ে গেলেন। এটা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা তিনি জানেন না। গড়াতে গড়াতে উপর থেকে নীচে পড়তে লাগলেন। পাহাড়ের পাদদেশে পড়ে শরীরটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ার ভয়। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? দেশের জন্য তাঁর প্রয়োজন যে তখনও ফুরোয় নি। তাই শরীরটাও ছিন্নভিন্ন হল না। মরতে মরতে আর একবার বেঁচে গেলেন। ঢালের মাঝখানে একটা চারাগাছে আটকে গেলেন। প্রচন্ড আঘাত পেলেন বটে কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হতে ফিরে এলেন।

তখন পূবের আকাশ ফর্সা। দিনমনি লাল জামা গায়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে।

অম্বিকাদা'র মাথায় সংকটের পর্বত। ভোরে ভোরে বিপদ এলাকা পাড়ি দিতে হবে যে।

পথ দুর্গম, শরীর দুর্বল সময় কম তবুও আপদ এড়াতে বিঘ্ন সঙ্কুল এলাকার ওপার যেতেই হবে। তাই সামর্থহীন শরীরটাকে টানতে টানতে টেনে নিয়ে চলেছেন। তাঁর যে শিয়রে শমন। কখনও রাইফেলে ভর দিয়ে হাঁটছেন, কখনও হামাগুড়ি দিযে এগোচ্ছেন, কখনও বা বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছেন। শরীরের জোরে নয়, মনের জোরে চলছেন। শরীর অচল, মন শাসাচ্ছে, চলতে হবে। অদম্য ইচ্ছা শক্তিতে অতি কষ্টে জালালাবাদপাহাড় পিছনে ফেলে অবসন্ন দেহটা নিয়ে অম্বিকাদা সামনের পাহাড়ে প্রবেশ করলেন।

সামনে দেখলেন শ্যাওড়া, শিমুল, পলাশ গাছের ছায়ার নীচে প্রশান্ত-মগ্ন

এক গুহা, গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সেখানে সুষুপ্তির মাঝে এক সুমহান শান্তি পেলেন।

যখন তাঁর গভীর নিদ্রা ভাঙ্গল তখন সব দিকে ঝলমল আলো। সেই উজ্বল সূর্য্য কিরণে দেখতে পেলেন জালালাবাদে পাহাড়ের উপর ব্রিটিশ সৈন্য উঠেছে। আজ নিরাপদ বুঝে সিপাইগণ মুক্তি যোদ্ধাদের ব্যবহৃত জিনিষপত্র সংগ্রহ করছে।

ফটোগ্রাফার মৃত বিপ্লবীদের ফটো তুলছেন। দেশী জওয়ানগন শব দেহগুলো একত্রিত করে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল। পরে অর্ধেন্দু দস্তিদারকে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। হিংস্র বিবেকহীন পশুগুলি জীবন্ত মৃতপ্রায় মতিননগোওকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে হত্যা করল। যুদ্ধবন্দির সুযোগটিও মতি পেলেন না।

সময় বয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে বদলে যায় পরিবেশ, বদলে যায় মানুষও। গতকাল সন্ধ্যায় জালালাবাদের যোদ্ধাদের ভয়ে ব্রিটিশ সৈন্য ছিল জড়সড়, আজ সকালে সেই জালালাবাদে সেই সৈন্যদেরই পূর্ণ প্রতিপত্তি আর দাপট।

যন্ত্রণা ও পরিশ্রমে অবসন্ন অম্বিকা চক্রবর্তী গুহায় শুয়ে শুয়ে জালালাবাদের সব ব্যস্ততা লক্ষ্য করলেন। অন্ন ও জলে বঞ্চিত হয়ে আরও একদিন তাঁর কেটে গেল।

২৩শে এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যায় কালো জামা পরিহিত ভীষণ দর্শন প্রহরারত এক চৌকিদার তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল, ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এত্তে কন ? (এখানে কে ?)। যে কোনও বিরুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য তিঁনি প্রস্তুত ছিলেন। কোমর থেকে ঝট করে রিভলবার বার করে তার বক্ষ লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরলেন। চক্ষে তাঁর অগ্নি দৃষ্টি। দুর্বাসার মূর্তি দেখে ব্রিটিশের গোলাম হতভম্ব। তার হাতের লাঠি মাটিতে পড়ে গেল। হাতের হারিকেন কাঁপতে কাঁপতে সামনে রেখে দিল। ভয়ে আত্ম-সমর্পণ করল।

তারপর অম্বিকাদা'র মিষ্টি কথায় চৌকিদার তুষ্ট হল। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকট চৌকিদার সম্পূর্ণ নিজেকে সঁপে দিল। শত্রু নিমিষে মিত্র হল। ব্রিটিশের অনুচর ব্রিটিশের শত্রুকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞা করল। অতঃপর তারই সাহায্যে অম্বিকাদা, ডাঃ বগলা প্রসাদ চক্রবর্তীর অতিথি হলেন।

"কান্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ আজিকে কি পথ মাঝে!"

২২শে এপ্রিল রাত্রি। অমাবস্যার মতো অন্ধকার রজনী। থমথমে প্রকৃতি। জালালাবাদ নীরব, নিস্তব্ধ। গা ছম ছম করছে। ভয়ে বাতাসও যেন ধীরে ধীরে বইছে। এই বধ্যভূমিতে দায়িত্ব পালন করতে শান্তি নাগ একা দাঁড়িয়ে আছেন।

শান্তির মনে অশান্তির ঝড় বইছে। যাদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছেন, একসঙ্গে খেলেছেন, এক আখড়ায় শরীর চর্চা করেছেন, লাঠির অনুশীলন, যুযুৎসুর প্যাঁচ, মুষ্টিযুদ্ধ একসঙ্গে শিখেছেন, যাদের নিয়ে একত্রে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন রচনা করেছেন, সেই সোদর-প্রতিমদের শবদেহগুলি আর এক-বার পরীক্ষা না করে ছেড়ে ফেলে যেতে শান্তির মন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না।

রোগীর সেবা শুশ্রূষায় শান্তির অভিজ্ঞতা আছে। নাড়িরগতি রক্ত চলাচল প্রক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি এই সমস্ত শরীর বিজ্ঞানে সে বিশেষভাবে তালিম প্রাপ্ত। বহু যত্নে ও দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় অর্জিত অভিজ্ঞতা শান্তি বন্ধুদের অন্তিমকালে সেবায় লাগাতে চান।

শান্তি এখন সৈনিক নন, সেবক। নিরাশার মধ্যেও শান্তির মনে আশার ক্ষীণ বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। সেবা করে শুশ্রূষা করে যদি একটি প্রাণ বাঁচাতে পারেন! বাঁচাতে নাইবা পারলেন, তাঁর যত্নে ও চেষ্টায় যুদ্ধে আহতগণের যদি একটু যন্ত্রণার লাঘব হয় তাতেই শান্তির সান্ত্বনা। আর শেষ যাত্রীদের সর্বশেষ বাসনাটি যদি কোনোও প্রকারে জানতে পারেন তবেই শান্তির শান্তি।

শান্তি বিপ্লবী, তাই মানব হিতৈষী। বিপ্লবী শান্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। আবার রোগে সেবা, দুঃখে করুণা, শোকেতে সান্ত্বনা তাঁর জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে।

কোমল, কঠিন আদর্শে গড়া শান্তি আদর্শের সঙ্গে কখনও আপোষ রফা করেন না, ঢিলেমিকে প্রশ্রয় দেন না। তাই এই মানবিক বোধের অদৃশ্য টানে শান্তি মৃত অনুমানে পরিত্যক্ত প্রতিটি দেহের নিকট যাচ্ছেন। নাড়ি টিপে হৃৎপিন্ডের স্পন্দন অনুভব করছেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিতে ফুসফুসের

ক্রিয়া অনুভবের চেষ্টা করছেন। মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তবেই অন্য আর একটি দেহের নিকট যাচ্ছেন। এইভাবে নিশিতে পাওয়া লোকের মত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে মৃতদেহের পর মৃতদেহ পরীক্ষা করে চলেছেন। তাঁর মাথার ওপর যে মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলছে সেদিকে একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই।

তিনি প্রাণের টানে মায়ার বানে ভেসে বেড়াচ্ছেন। এই ভাবেই মায়ার স্রোতে ভাসতে ভাসতে এক সময় তিনি আটকে গেলেন সুরেশ দে'র পাশে এসে। সুরেশের দেহ দেখেই শান্তির মনে সন্দেহ জাগল—এই দেহটি যেন অন্য মৃত-দেহগুলি থেকে আলাদা। শান্তি অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেহটি নিরীক্ষণ করলেন। পরে হাঁটু মুড়ে বসে সতর্কতার সঙ্গে দেহটির শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অনুধাবন করলেন। প্রাণের লক্ষণ বুঝতে পারলেন না। তন্ময় হযে হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করে অনুভবী শান্তি অনুমান করলেন-মৃত মনে হলেও সুরেশ মৃত নয়। ক্ষীণ প্রাণবায়ু অতি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে নিভু নিভু প্রাণ প্রদীপটি যে কোন মুহূর্তে নিভে যেতে পারে। সুরেশ জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পড়ে আছেন।

এই সংকট মুহূর্তে শান্তি বিমূঢ়। তাঁর দরদী-মন এই সিদ্ধান্তে অটল যে, যমের কাছে সুরেশকে ফেলে রেখে সে যাবে না। এই অচৈতন্য দেহটাকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলতে শান্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু নার্সিং-এর সুযোগ এখানে নাই। জীবন সংশয়ের ক্ষণে টানা হ্যাঁচড়া করতে গেলে মৃত্যু অবধারিত। আবার এভাবে এখানে বেশীক্ষণ থাকাও উচিত নয়, ধরা পড়ে যাবার ভয়। নানা সমস্যার আবর্তে পড়ে শান্তি হাবুডুবু খাচ্ছেন। শান্তি অশান্ত।

শান্তি স্থির করলেন, অস্থিরতা সমাধানের পথ নয়। একটা কিছু করতেই হবে, বিপদে বুদ্ধিই বন্ধু। বিপদে ইচ্ছাশক্তি বাড়ে। এই মুহূর্তে মনে যে ইচ্ছা জাগবে তাই সে করবে।

সুরেশকে প্রথমে ডাকাডাকি ঠেলাঠেলি করে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর মনের নির্দেশে এক অসাধ্য সাধনে ব্রতী হলেন। সুরেশের বলিষ্ঠ দেহটা এক অসাধারণ প্রয়াসে যুদ্ধক্লিষ্ট শান্তি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। অতঃপর রাইফেল ধরে তাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মনের জোরে শান্তির গায়ে এখন হাতির বল। তিনি রাইফেল ভর দিয়ে দুই-মনি সুরেশের দেহ কাঁধে নিয়ে থপথপ করে হাঁটতে লাগলেন। বেশী দূর যেতে পারলেন না। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন, সুরেশের শরীর ছিটকে দূরে পড়ল।

শাপে বর হল। শান্তির সকল আশঙ্কা মিথ্যা করে ঝাঁকুনিতে সুরেশের জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু ঘোর তখনও কাটেনি। কোথায় আছেন, কেন আছেন কিছুই মনে নেই। বিস্মরণ ঘটেছে। স্মৃতি বিভ্রম দূর হতে সুরেশ দেখতে পেলেন তারা ভরা আকাশের নীচে সুরেশের মুখের উপর ঝুঁকে শান্তি পলকহীন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছেন। শান্তির দৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভালবাসার অমৃতধারা বিগলিত ধারায় ঝড়ে পড়ছে। শান্তির অন্তর নিঙ্‌ড়ানো প্রেম-দৃষ্টি সুবেশ মুগ্ধ নয়নে পান করছেন। তাঁরা যে যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকার মধ্যে আছেন সে মুহূর্তে সব ভুলে গেছেন।

শান্তিই শান্তি ভঙ্গ করলেন। সুরেশকে বললেন, 'ওঠো চল। নিরাপদ স্থানে চলে যাই।'

সুরেশ তার চেতনাশক্তি ফিরে পেয়েছেন বটে কিন্তু বাক্‌শক্তি তখনও পাননি। হেঁটে চলা একেবারেই সম্ভব নয়। শান্তিকে সুরেশ মাথা নেড়ে চলার অক্ষমতা জানালেন। ইঙ্গিতে তাঁর বুকে গুলি করতে বললেন। ইশারায় তাকে চলে যেতে অনুরোধ জানালেন।

এখন শান্তির মন বন্ধুর জীবনের জন্য আত্মভোলা। ভোলানাথ বললেন —আমাদের জীবন এক তারেতে বাঁধা, এক সুরেতে সাধা, এক সুতোয় গাঁথা। তাই, যদি মরতেই হয় তবে দুজনেই এক সঙ্গে মরব, আর যদি বাঁচার চেষ্টায় কৃতকার্য হতে পারি তবে উভয়েই বাঁচব। শান্তির ভাবনা—উপায়হীনের উপায়, নিয়তির উপর নির্ভর করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। শান্তির এখন নীতিবাক্য হল—বিশ্বাস আর প্রত্যয় নিয়েই মানুষ বাঁচে।

আপনা বুঝ পাগলেও বোঝে, কিন্তু শান্তি বোঝে না। যে শান্তি বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্রিটিশ-বাহিনীর বিরুদ্ধে ছিলেন বজ্রকঠোর, সেই হৃদয় সহযোদ্ধার বিপদে কত স্নেহার্দ্র, এখন সে কুসুম পেলব থেকেও কোমল। নিজের জন্য যে ফাঁসির রজ্জু ঝুলছে তাঁর সেই খেয়াল নাই। তা বলে শান্তির এই পরার্থকাতরতা নিছক ভাবপ্রবণতা নয়। শান্তি বাস্তব-নিষ্ঠ। ব্যায়াম-কুস্তিতে সুগঠিত সুরেশের বলিষ্ঠ শরীরটা কাঁধে বয়ে নিচে আনা কেবল কষ্টকর নয়, কল্পনা করাও কঠিন। অথচ সুরেশ অচল।

এ জটিল সমস্যার সমাধান করতে সুরেশের অসমর্থ দেহটা টেনে টেনে পাহাড়ের ধারে নিয়ে এলেন। পাহাড়ের ঢালুতে গড়াতে গড়াতে নিচে নামতে লাগলেন, কখনও বন্ধ গতি গতিশীল করে কখনও দ্রুত গতিবেগের নিয়ন্ত্রণ

করে অনেক ধৈর্য সহকারে ও যত্নে সুরেশের অর্ধমৃত দেহটাকে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে এলেন। দেহ নয় যেন পঞ্চভূতের একটা পিন্ড।

এই জড়পিন্ডটি লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখবার মানসে শান্তি ঘন পাতা-পল্লব বিশিষ্ট এক বিরাট বৃক্ষের নীচে কাজল কালো অন্ধকারে রেখে দিলেন।

এতক্ষণ শান্তি স্নেহ মমতায় আবিষ্ট ছিলেন। যুদ্ধাঞ্চল পেরিয়ে এসে তাঁর মোহ ভাঙ্গল। এতক্ষণে তাঁর হুঁশ হল তিনি দলছুট, তিনি একা। উপলব্ধি করলেন তিনি নিঃসম্বল ও অসহায়।

এই অপরিচিত আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে এসে শান্তি হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি স্থির করতে পারছেন না এখন তাঁর কী কর্তব্য ? কোথায় যাবেন, কোথায় দাঁড়াবেন। শান্তি তা জানেন না।

গ্রাম-চট্টগ্রাম শান্তির নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। এখন কোথায় আছেন তাও বলতে পারবেন না। কোথায় গেলে সাহায্য পাবেন তার চিন্তাও তিনি করতে পারছেন না। তাঁর হাত পা বিপদের অক্টোপাসে বাঁধা। এই বিপদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েও তিনি হতোদ্যম হননি। বিপদে তাঁর ইচ্ছাশক্তি আরও প্রবল হয়েছে। মনে সংকল্প করলেন—বাধার বাঁধন ছিঁড়তে হবেই। মনকে প্রবোধ দিলেন—জগতে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই।

অবশেষে বাস্তব বুদ্ধি তাঁকে পথ দেখাল। শান্তি দলের অনুসন্ধানে সন্ধানী দৃষ্টিতে দশ দিকেই খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। এই বিজন জঙ্গলে মানুষ তো নয়ই একটা পশুপাখীরও দেখা পেলেন না।

তিনি এতে ভগ্নোদ্যম হলেন না। টর্চের আলো ফেলে জঙ্গলের চারিদিকে দূর দূরান্ত পর্যন্ত আলোর সংকেত পাঠালেন, কোনও ইঙ্গিত ফিরে এলনা।

অবশেষে মরীয়া হয়ে শত্রুর জানাজানি হয়ে যাওয়ার আশংকাকে অবহেলা করে সুদূরারোহ বৃক্ষে চড়ে উচ্চ স্বরে 'মাস্টারদা' 'মাস্টারদা' বলে ডাকলেন, কারও সাড়া পেলেন না।

দৌড়াদৌড়ি হাঁকাহাঁকি, গাছে ওঠা সব ভস্মে ঘি ঢালা হল। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও শান্তি তার আকাঙ্খিত আপনজনদের দেখা পেলেন না।

"তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী যাত্রীরা সাবধান"

এই দুঃসময়ে কি করা কর্তব্য সে চিন্তা মাথায় নিয়ে শ্রান্ত-শান্তি বসে পড়লেন। তবে দলের বন্ধুদের দেখা না পেলেও শান্তির এই পরিশ্রম সাফল্যে

ব্যর্থ হয়নি। নানাদিকে জঙ্গলের মধ্যে ছোটাছুটির সময় একটি ডোবায় তিনি জল দেখতে পেয়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁর মাথার-ঘায়ে-কুকুর-পাগল অবস্থা। তাই তখন তার মনকে জল আকর্ষণ করতে পারেনি। এখন স্থির হয়ে বসে স্মৃতিচারণ করতেই তাঁর অবচেতন মনে জলের ছবি ভেসে উঠল।

তিনি জলের সন্ধানে ছুটলেন। একটি পাহাড়ী ঝর্ণার জলস্রোত শুষ্ক হয়ে জল জমে ছিল। শান্তি আকণ্ঠ সেই জল পান করলেন। জলপাত্রে করে সুরেশের জন্যও নিয়ে এলেন।

জলের নাম শুনেই সুরেশ সতৃষ্ণনয়নে অপেক্ষায় ছিলেন। শান্তির হাতে জলের পাত্রে জল দেখেই সুরেশের প্রাণে যেন জল এল। সুরেশ পাত্রের সমস্ত জল এক চুমুকে পান করলেন। তৃষ্ণা দূর হল। সেই অমৃত সুরেশের দেহমন ভরিয়ে দিল।

জলের ক্রিয়াগুণে সুরেশ উঠে বসলেন। তারপর দাঁড়ালেন। শান্তি যেন তাঁর চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বিস্ময়াবিষ্ট মনে ভাবছেন তবে কি জলের যাদুস্পর্শেই সুরেশ এখন এক পা দু পা করে হাঁটছেন। মুখেও আধো আধো কথা ফুটছে। অস্বাভাবিকভাবে রক্ত ক্ষয়ে যাওয়া শরীরে দৃঢ়তার প্রকাশ।

অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয় ও জলের অভাবেই সুরেশের এই দুর্বিপাকের কারণ। শান্তির মনে দৃঢ় বিশ্বাস—অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শরীর দুর্বল করে দিচ্ছে। তাই রক্তনিঃসরণ বন্ধ করতে শান্তি ক্ষতস্থানে কষে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। শান্তি দুঃখাভিভূত হৃদয়ে ভাবলেন, সুরেশ বাঁচলেও তার ডান হাতটি জীবনের মত নষ্ট হয়ে গেল। (সুরেশই বর্তমান লেখক)।

আমার চোখে এতক্ষণ শান্তির গতিবিধি ছায়ার ন্যায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। এখন তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

জলের ছোঁয়ায় এই ভুবনকে যেন নতুন করে দেখছি। আকাশের মত অসীম, বাতাসের ন্যায় উদার শান্তির বন্ধুত্ব ও ভালবাসা অনুভব করছি।

শান্তির সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা উচিত বলে মনে করছি। না বললে কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে। আমাদের বিবরণে যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে সেটা শান্তির আংশিক পরিচয়। শান্তির সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় এরকম :

ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে সবচেয়ে অগ্রণী চিন্তাধারা থেকে যে পার্টির উদ্ভব, সে দলের সভ্য হিসাবে শান্তি নাগ সেই চিন্তাধারা ঠিকভাবে বহন

করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। দলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে দলের বহু ঘাত-প্রতিঘাত পতন উত্থানের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয় সহযোগিতায় দলের অগ্রগতিকে দ্রুততর করেছেন, অতি নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে। ঐতিহাসিক এই ডামাডোলের দুর্যোগ মুহূর্তেও শান্তি বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন সর্বক্ষেত্রে।

আরেকটা বিষয় আমাকে অভিভূত করল। তা হল, এই ভয়াবহ দুঃখকষ্টের মধ্যেও শান্তি আমাদের রাইফেল রিভলভারগুলি হাতছাড়া করেন নি। শান্তি যে কত বড় চিত্তজয়ী মহাত্মা ছিলেন তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্যের কল্পনা করাও কঠিন।

আমার হাতের ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে উঠেছে। ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত ক্ষত-স্থান হতে ঝরছে। শান্তি পুরোনো ব্যান্ডেজ বদলে নতুন ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। রক্তঝরা বন্ধ হল। আমি সুস্থবোধ করলাম। জল, ক্ষয়িষ্ণু শক্তি পূরণ করছিল। ব্যান্ডেজ শরীরের রক্ত শরীরে রাখছিল। শরীরে একটু একটু করে শক্তি সঞ্চয় হচ্ছিল, তা আমি অনুভব করলাম।

মনে এখন অসীম সাহস। বেঁচে ওঠার অতীব উৎসাহ। সামনে একটু পায়চারী করলাম। হেঁটে চলার মহড়া দিলাম। মনে চিন্তার উদয় হল। চারিদিকে কোথাও সহায় নেই। সামনে পিছনে চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। এই অন্ধকার রজনীতে আমাদের মত অসহায় মানুষের মুক্তির পথ খুঁজে বার করা কি সম্ভব? অন্তর্দেবতা আশ্বাস দেন—বিপদের মধ্যেই শক্তির উদ্ভব হয়।

পথ সংকটের বেড়াজালে ঘেরা, গায়ে রক্তেরাঙ্গা পোষাক, গুলিবিদ্ধ ভাঙ্গা হাত। এ সমস্ত বাধাবিঘ্ন জয় করে এ পথ এগোতে হবে। শান্তির বিচার হল—এই বিপদ এলাকায় অপেক্ষা করা হবে অবিবেচনার কাজ। তার যুক্তি হল, বিপ্লবীদের বন্দী করার উদ্দেশ্যে দল বেঁধে মিলিটারী পেট্রোলিং দিচ্ছে। প্রকৃতির প্রভাবে, এই গভীর রাতে সমস্ত জীবেরই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি হয় স্তিমিত, তাই এখন হল আত্মরক্ষার মাহেন্দ্রক্ষণ। তবে জীবনরক্ষার জন্য জীবন হাতে নিয়ে চলতে হবে আমাদের।

শান্তি তার মনের আশঙ্কা আমার কাছে প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, এই বিপদ-আবেষ্টনী থেকে বের হবার জন্য এই স্থান অবশ্য পরিত্যাজ্য। কিন্তু যাবো কোথায়? শান্তি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন—যার নিজের উপর ভরসা আছে ভগবান তাকেই সাহায্য করেন।

চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। পাহাড়ের ছায়া, বৃক্ষের ঘন পত্র-পল্লবের আচ্ছাদন গাঢ় অন্ধকারকে ঘোরতর করেছে। অতি নিকটের বস্তুও আবছা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনের কশাঘাতে তবুও চলতে হবে। তাই সূচি-ভেদ্য অন্ধকারের বুক চিরে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে সামনে দেখলাম বিরাট পাহাড়। বুঝলাম ভুল পথে এসেছি।

আবার উল্টো দিকে পথ চলা শুরু করলাম। পথ বিহীন পথে, সন্দেহ, অনিশ্চয়তা ও মনে স্বপ্ন নিয়ে অন্ধকারে সাঁতার কেটে সামনে এগিয়ে চলেছি। যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়ার আশংকায় আমরা আতংকিত। চোখ কান আমাদের সতর্ক। মন মরীয়া, উভয়েরই সংকল্প,—এই বিপদ এলাকা ভোর হওয়ার পূর্বেই লংঘন করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছি। ভূতে পাওয়ার মত জ্ঞান শূন্য হয়ে দৌড়াচ্ছি। সাহসই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু, এই ভাবছি আর ছুটছি। ছুটতে ছুটতে ঘন বন পাতলা হল। আকাশে অজস্র তারা দেখতে পেলাম। দিক-ভ্রমের ভয় দূর হল। একটু এগিয়ে যেতেই পায়ের নীচে পায়ে হাঁটা পথ অনুভব করলাম। মনে আশা জাগল।

নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, হাঁপিয়ে পড়ছি, তবু মনের জোরে আমরা দৌড়ে চলেছি। হঠাৎ সামনে দেখতে পেলাম দূরে তারার মত কয়েকটি আলো মিটমিট করছে। সেই আলো আমাদের মনেও আশার আলো জেলে দিল।

আর দৌড়াতে পারছিনা। আলো লক্ষ্য করে তখন হাঁটতে লাগলাম। শান্তির দৃঢ় বিশ্বাস ঐ আলো লোকালয়ের আলো। ঐ আলোই আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে।

সত্য বটে, বিপদের জাল ছিন্ন করেছি। অন্ধকার থেকে আলোতে এসেছি কিন্তু আপদের হাল থেকে মুক্তি এখনও পাইনি। এখন পর্যন্ত যা জেনেছি তার চেয়ে ঢের বেশী রয়েছে অজানা। বিশেষ করে আত্মগোপনের ব্যবস্থাটাই অজানা। শান্তির পিঠে আবার দুটি রাইফেল ঝুলছে, সামনে চারটি রিভলবার বাঁধা রয়েছে। আমার সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত। এতক্ষণ অন্ধকারে সব ঢাকা ছিল। লোকালয়ের নিকটে এসে মনে নূতন উদ্বেগ সৃষ্টি হল। তবে যারা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে এসেছে তারা মহা সংকটে পড়েও নির্ভয়। ভয়ই যে দুর্বলতা।

পথহারা যাতে না হই সেজন্য আলো নিশানা করে এক মনে ধেয়ে চলেছি। এই আলো অনুসরণ করেই লোকালয়ে প্রবেশ করলাম।

বনপর্ব শেষ হল। কিন্তু জনমনে রয়েছে লোভ, রয়েছে প্রতিহিংসা রয়েছে ভয়। এই রিপুগুলির নিষ্ঠুরতা থেকে আত্মরক্ষা করতে প্রয়োজন আরও বেশী সতর্কতা। তাই আগে পিছনে সতর্ক দৃষ্টিপাত করতে করতে গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলেছি, আর কোনও গৃহস্থের সহানুভূতি পাবার সম্ভাবনা নিয়ে গভীর ভাবে ভাবছি।

গ্রামটিতে দরিদ্র লোকের বাস। অন্ধকার রাত্রির স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে অতি সাবধানে উৎকর্ণ হয়ে হাঁটছি আর ভাবছি, এই খেটে খাওয়া দুঃস্থ লোক-গুলির জন্যই স্বাধীনতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী কিন্তু এই হতভাগ্য নির্যাতিতদের কিসে মঙ্গল এই সত্যটাকেই তারা উপলব্ধি করতে পারে না। উপবাসে অপুষ্টিতে লোকগুলো অবসাদগ্রস্ত। বেঁচে থাকার যে সুখ সে চেতনাটুও তারা হারিয়ে ফেলেছে।

তাদের ঘরের চালে খড় নেই। ভাঁড়ারে মা ভবানী, ভারতী বিমুখ, পরনে নেংটি কানি। তার কারণ, রক্ষকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে বিদেশী সরকার ভক্ষক হয়ে গরীবের ভোগ সাবাড় করছে। তাই চিরকাল তাদের এত দুঃখ। এই খাঁটি কথা বলবার তাদের সাহস নেই, বুঝবার মত জ্ঞান নাই। সেজন্য তাদের ঘরেও আমাদের স্থান নেই। তাছাড়া যুদ্ধের ধরাচূড়া সহ রক্তে সিক্ত যুদ্ধ আহতদের আশ্রয় দে'বে এমন সাহসী দেশ-বৎসল কোথায় পাব? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে?

এই জীর্ণ-শীর্ণ কুঁড়ে ঘর গুলির যারা বাসিন্দা, দারিদ্র্যের সব থেকে নীচু তলায় তাদের অবস্থান। জাগরণের অতি ক্ষীণ আলো তাদের মধ্যে এসেছে বটে কিন্তু স্বদেশীয়ানা তাদের মধ্যে উত্তাপ এনে দিতে পারেনি। তাদের জীবনযাত্রা, অশিক্ষা, অজ্ঞতা বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানুষদের সঙ্গে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। হঠাৎ আমাদের সান্নিধ্য এই দূরত্ব দূর করতে পারবে কি?

জানি কাম্য সাহায্য অযাচিত ভাবে আসবে না। আর তাদের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করা যায় কোন ভরসায়? কিছু লোক আজও রাজসেবাকে দেব সেবা ভাবে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের ভিতরে এরকম প্রবল মানসিক ঝড় চলেছে। আর আমরা আত্মগোপনের জন্য ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আশ্রয় স্থান আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছি ও এগিয়ে চলেছি।

ভাবছি এই অজ্ঞাতকুলশীল স্থানে এমন মিত্র কে আছে ? কাকে কোথায় পাব এমন বিপ্লবী হিতৈষী ? শান্তি সান্তনা দিল—কর্মেই আমাদের অধিকার ! ফলে নয় ।

আমরা এইসব ভাবছি আর আশায় বুক বেঁধে ভেসে চলেছি । যেন উত্তাল সমুদ্রে হাল বিহীন ডিঙি । চলতে চলতে গ্রামের সীমান্তে একটি বাড়ি নজরে পড়ল । বাড়িটি একক । গ্রাম থেকে খানিকটা দূরে । এই নীরব নিশীথে বিচ্ছিন্ন বাড়িটির থেকে কোনও গন্ডগোল নিদ্রামগ্ন গ্রামে পৌঁছবে না । তাই বাড়িটির অবস্থান আমাদের আকৃষ্ট করল ।

এরকমই এক-ঘরে একটি বাড়ির মনে মনে অনুসন্ধানে আমরা ছিলাম । অপ্রত্যাশিত চালা ঘরটি দেখেই আমাদের মন ময়ূরের মত আনন্দে নেচে উঠল । অকুতোভয়ে বাড়িটির দিকে এগিযে গেলাম ।

শান্তিকে আমি বললাম,—আমরা আমাদের অসহায়তার কারণ জানিয়ে গৃহস্থকে স্বমতে আনতে চেষ্টা করব । আর তা যদি না পারি তবে বল প্রয়োগ করে তাকে অসহায় করে আমরা আমাদের প্রয়োজন আদায় করে নেব । নান্য পন্থা ।

শান্তি আশ্বাস দিল, যারা দৃঢ় ও শক্তিশালী, জগৎ তাদের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল । এরপর বহু ভেবে, বহু আশা নিয়ে আমাদের আকাঙ্খিত বাড়ির দোর গোড়ায় গেলাম । দরজায় আঘাত করলাম ।

গৃহস্বামী কপাট খুলেই সামনে রক্তেরাঙা আমার শরীর, যুদ্ধবেশী শান্তিকে দেখে যেন ভূত দেখলেন । ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন ।

শান্তি ধমক দিয়ে তার চীৎকার থামিয়ে দিলেন । বিজয়ী শান্তির বদ্ধমূল বিশ্বাস যে প্রত্যেক বিরোধীকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেওয়ার তার অধিকার আছে ।

ভয়ার্ত গৃহকর্তাকে আমি অভয় দিলাম । প্রবোধ বাক্যে তার ভীতি দূর করলাম । শান্তির প্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গী, দৃঢ়তার সঙ্গে বক্তব্য ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা গৃহস্বামীর মনকে প্রভাবিত করল । আমাদের রক্তে সিক্ত বস্ত্র দেখে গৃহস্বামীর হৃদয় কানায় কানায় সহানুভূতিতে পূর্ণ হল । এতক্ষণ আমরা ঘরের বাইরে, তিনি দরজার অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে বাদ-প্রতিবাদ করছিলেন, আমাদের বীরত্বের বীর গাথা শুনে এখন তিনি অভিভূত । এমন বীর ভারতবাসীর সান্নিধ্য পেয়ে তিনিও গর্বিত । তাই অভ্যর্থনা করে গৃহের

ভিতর আমাদের বসার স্থান করে দিলেন। বাংলার দেশমাতৃ-সাধকগণ ক্ষুধার্ত জেনে পরদিন সকালের জন্য রক্ষিত পান্তাভাত আমাদের সামনে এনে রাখলেন।

সেই অমৃত ভোগ দেখেই ক্ষুধার আগুন দ্বিগুন হয়ে জ্বলে উঠল। সুঁটকি ছালুন সহযোগে সোৎসাহে পবমান্ন গোগ্রাসে নিমেষের মধ্যে শেষ করে ফেললাম।

সেই পান্তা ভাত খেয়ে মনে হল,—এখানেই ভারত-আত্মার জীবন সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এদেশের দরিদ্রতম মানুষ অতিথির জন্য নিজের আহার্য দান করে হাসিমুখে সপরিবারে উপোস দিতে পারেন।

ত্যাগের আদর্শ, সেবার ভাব যেখানে নেই, সেখানে দেশপ্রেম, সমাজ-প্রেম, জাতি-প্রেম স্বার্থ সিদ্ধির কপট অভিনয় মাত্র।

তারপর সেই মহাভোজের পর বিশ্রাম ও আরামের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা শুরু হল। আমাদের এই আশ্রয়দাতাকে আমি বললাম, —আজ থেকে আপনিও আমাদের এই স্বপ্নের ভারতের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ভারতের স্বাধীনতা যেমন আমাদের প্রয়োজন, তেমনি আপনারও। চেয়ে দেখুন এখন আমাদের সুখের রজনী ভোর হতে চলেছে। প্রভাত হলেই লোক জানাজানির ভয়, আপনার বা আমাদের, উভয়েরই যা বাঞ্ছনীয় নয়। আজ আমরা চলে যাচ্ছি, যাওয়ার আগে আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি এই দুটি রাইফেল, যা আমাদের প্রাণ-ভোমরা। এই অন্ধকার রাতে এ দুটি আমাদের দেহরক্ষী ছিল। দিনের আলোতে এগুলিই হবে আমাদের বিপদ চিহ্ন। অসুর-দানব সংহারী শক্তি আপনার কাছে গচ্ছিত রইল। আপনি এই তথ্য ঘূর্ণাক্ষরেও কাউকে জানাবেন না। আমরা আপনার বাড়িতে ছিলাম এ ঘটনাও কাউকে বলবেন না। গোপন, গোপনেই থাকবে।

এই ক্ষণেকের আলোচনার মধ্যেই আমরা বুঝতে পেরেছি যে আশ্রয়দাতার হৃদয় জয় করতে আমরা সমর্থ হয়েছি। শোষণক্লিষ্ট জীবনের অবসান করাই আমাদের ব্রত। অপমানিত মনুষ্যত্বের এই বিদ্রোহ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

সমাজের নীচুতলার মানুষটির মধ্যে এখন পৌরুষ ও বলিষ্ঠতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে দেখে আমরা আমাদের দ্বিতীয় আবেদন পেশ করলাম। গরজ বড় বালাই! —আমাদের এই রণসাজ রণক্ষেত্রে ছিল অপরিহার্য। স্থান বিশেষে

এই পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করতে না পারলে বহু লাঞ্ছনার কারণ হবে। তাই বললাম, এইগুলি এখন শুধু নিষ্প্রয়োজনই নয় এগুলির অপব্যবহারে বিপ্লবকেও করবে বিপন্ন।

তাই ভাই, এখন আমাদের পরিচয় পাল্টাতে পরিধানও পাল্টানো দরকার। দরকার ছদ্মবেশ, আর অস্নান জনিত রুক্ষ আলুথালু চুল, অনাহার জনিত ক্লিষ্ট মলিন শরীরের পক্ষে লুঙ্গি হবে আদর্শ ছদ্মবেশ। সেই জন্য আপনি আমাদের দুটি পুরোনো লুঙ্গি আর দুটি ছেঁড়া গেঞ্জি দিন। যখন যেমন তখন তেমন।

কিন্তু আশ্রয়দাতার কাছে উদবৃত্ত কোন জামা-কাপড় নেই। অথচ তিনিও আমাদের সম্ভাব্য বিপদের সম্ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একটি লুঙ্গি তিনি পড়ে আছেন, আর একটি তিনি ঈদ ও উৎসবের দিনে পরেন। সেই তুলে রাখা একটি লুঙ্গি ও গেঞ্জি শান্তির হাতে দিয়ে বললেন, আমার কাছে আর কোনও ব্যবহার যোগ্য ধুতি বা লুঙ্গি কিছুই নেই। পরিধানের অযোগ্য বলে অনেকদিন আগে কাঁথা শেলাইয়ের করার জন্য রাখা আছে একটা শত ছিদ্র লুঙ্গি। তা তো আর ব্যবহার করা যাবে না।

আমি তার মুখের কথা টেনে নিয়ে বললাম—তবে সেইটাই দিন, আত্ম-গোপনের জন্য তাই হবে সর্বোত্তম পোষাক। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করলেই জুড়ে যাবে।

এ কথা শুনে গৃহকর্তা একটি মাটির হাঁড়ি থেকে একটা শতছিন্ন লুঙ্গি ও কয়েকটা গেঞ্জী বের করে দিলেন। তাই কোন মতে সেলাই করে পরে নিলাম। দারিদ্রের চিহ্নে আমাদের যাত্রার পোষাক হল বহু মূল্যেবান।

বাড়ির মোরগটি ক' ক' করে ডেকে উঠল। আমরা বুঝতে প রলাম এ হল নিশাবসানের প্রথম সঙ্কেত। সময়ের অপব্যবহার করা আর ঠিক হবে না।

দ্রুত রিভলবার আর গুলি কোমরে বাঁধতে গিয়ে আমাদের আক্কেল গুড়ুম। এই জরাজীর্ণ গেঞ্জি আর লুঙ্গির মধ্যে কোন মতেই এই আগ্নেয়াস্ত্র-গুলিকে গোপন করা যাচ্ছে না। ঢাকা অবস্থাতেও এইগুলি অত্যন্ত অন্যমনস্ক পথিকেরও নজরে পড়ে যাবে। তখন আর লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না।

অকুল-পাথারে পড়েছি। আগ্নেয়াস্ত্রগুলি সঙ্গে নিলে ধরা পড়ার ভয় অথচ এগুলো শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব-জয়-হর আয়ুধ। এই

যক্ষের ধন কালনাগের বিষাক্ত ছোবলের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছি। এগুলি এখন হীরে মানিক্যের চেয়েও মূল্যবান। বিপ্লবী জীবনের মহা সম্পদ।

এইগুলি সঙ্গে নিলে নিশান্তে পথপ্রান্তে ফেলে দিতে হবে, সঙ্গে থাকলে দীপ্তিহীন, তৃপ্তিহীন অসাফল্যের মৃত্যু বরণ করতে হবে।

উভয় সংকটে পড়ে বিচার দ্বন্দ্বে আমরা বেসামাল। এইসব নিয়ে যখন সাতপাঁচ ভাবছি তখন গৃহকর্তা বললেন, এগুলিও আমার কাছে রেখে যান, আমি এগুলিরও রক্ষণাবেক্ষণ করব, আপনারা এর জন্য ভাববেন না।

এ যাবৎ এই মানুষটি আমাদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের সন্তুষ্টির জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। তাঁর নিরলস এই আতিথেয়তা আমাদের বিশ্বাস অর্জন করেছে। তাই আমাদের 'সাতরাজার ধন' তাঁর হাতেই তুলে দিলাম নিশ্চিন্তে।

আমরা পরস্পরের প্রতি পরস্পর চেয়ে দেখে নিলাম। নতুন সাজে আমাদের বেশ মানিয়েছে। ঠিক যেন দুটি মুসলমান কিশোর।

নতুন বন্ধু মুসলমানত্বের প্রমান স্বরূপ আমাদের দুটি নমাজের কল্মা শিখিয়ে দিলেন।—বিপত্তারিনী ছলনা।

রাত্রি নিস্তব্ধ। শান্ত চরাচর। নীল আকাশ নির্মেঘ। তিনজনের হৃদয়ই বেদনায় আকুল। তারপর গুপ্ত মন্ত্রনা শেষ করে, গুপ্তধন রেখে, ছদ্মবেশে কর্পদক হীন অবস্থায় কন্টকময় পথে পা বাড়ালাম।

সমাপ্ত

পরিচয়

যাদের রক্তে সিক্ত হল ভারতের ধরণীতল,
যারা, যাওয়ার আগে জাগিয়ে গেল দেশের তরুণ দল।

সেই দ্বাদশ শহীদদের সংক্ষিপ্ত জীবন-পঞ্জি নিম্নে দেওয়া হ'ল।

হরিগোপাল বল (বয়স ১৪)

সবাই ডাকত টেগরা। নেতা লোকনাথ বলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জন্ম ধোরলা গ্রামে। বাস করতেন পাথর ঘাটায়। পড়তেন মিউনিসিপাল স্কুলে। দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীর ছোট ছেলে টেগরাকে পিতার কঠোর শাসনের মধ্যে পালিত হ'য়ে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত। তিনি দেখতে যেমন ছিলেন ফুটফুটে সুন্দর, বুদ্ধিতেও ছিলেন তেমনি চটপটে। একই দেহে রূপগুণের সঙ্গম হয়েছে। প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরা তার বলিষ্ঠ দেহের মধ্যে ছিল সদা জাগ্রত উদ্যমশীল একটা মন ; যে মন দ্বারা তিনি বিপ্লবী দলে কর্মঠ কর্মীরূপে নিজের একটা স্থান করে নেন। স্বীয় বুদ্ধিবলে ১৮ই এপ্রিলের যুব বিদ্রোহে তিনি মনোনীত হন। ২২শে এপ্রিলের জালালাবাদ যুদ্ধে তিনিই সর্ব প্রথম শহীদ হন। বীরত্বের সহিত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তার কন্ঠে ছিল বীরত্বের গান—"কার আগে প্রাণ কে করিবে দান।" মরার সময় মৃত্যুকে পরিহাস করে সবাইকে ডাক দিয়ে বললেন "আয় কে দিবি প্রাণ।" টেগরা এনেছিলেন সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ। মরণে তাহাই তিনি করে গেলেন দান।

টেগরার জীবনের শেষ আহ্বান :—

"সোনাভাই, আমি চল্লাম। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও"।

প্রভাস বল (বয়স ১৭)

প্রভাস বল ছিলেন, হরিগোপাল বলের খুড়তাত ভাই। চট্টগ্রামের ধোরলা গ্রামে জন্ম। জে, এম, সেন স্কুলের ৯ম ক্লাসের ছাত্র। বৃন্দাবন আশ্রমের ব্যায়ামের আখড়ার তিনিই ছিলেন সম্পাদক। এক কথায় সর্বে-সর্বা। কথিত আছে যে প্রভাসের এক পূর্বপুরুষ স্নানের পূর্বে সরিষার তেলের জন্য হাত পাতিলে গৃহস্বামী তেলের পরিবর্তে তাঁহার হাতে এক

মুষ্ঠি গোটা সরিষা দিলেন। তিনি দুহাতে রগড়ে সেই সরিষা হতে তৈল নিষ্কাষণ করেন। সেই তৈল মাথায় দেন, গায়ে মাখেন। কর্তা বিস্ময়াবিষ্ঠ হয়ে তাঁকে 'বল' উপাধিতে ভূষিত করলেন। ছিলেন বসু, হলেন বল। প্রভাসও ছিলেন সেই বলী পূর্বপুরুষের সার্থক উত্তর পুরুষ। বল উপাধির যথার্থ প্রতিনিধি। ব্যায়াম শিক্ষক অনন্ত সিং প্রতি রবিবারে বৃন্দাবন আখড়ায় আসতেন মুষ্টি যুদ্ধ তালিম দিতে। ভীম ভবানীর মত প্রভাসের দেহ সৌষ্ঠব দেখে তিনি ভাবলেন যদি—এই মহাবীরেব বল দেশ জননীর পূজায় না লাগে তবে বন্য মাতঙ্গের এই শক্তি কোন্ কাজে লাগবে। তিনি ধীরে ধীরে প্রভাসের মধ্যে বিপ্লবের অনুরাগ সৃষ্টি করলেন। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর (Acid test) অনন্ত সিং মাষ্টারদার সঙ্গে প্রভাসের পরিচয় করে দিলেন। ১৯২৯ সনের চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস নির্বাচনে অনন্ত সিংহের সঙ্গে প্রভাস বিপ্লবী দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে নামলেন। স্নান নাই, আহার নেই, সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল কাজ আর কাজ। তিনি মিউনিসি-প্যালিটীর কুলীদের মধ্যে প্রচার চালালেন। যারা পূর্বে কংগ্রেস সদস্য ছিলনা তাদের নতুন সদস্য করলেন। বার্মা অয়েল কোং মজদুরদের মাষ্টারদার দলের পক্ষে ভোটদানে সম্মত করালেন। প্রভাসের প্রচারের ফলে মাষ্টারদার দলের জয়ের দরজা খুলে গেল। বিরাট ভোটের ব্যবধানে নির্বাচনে মাষ্টারদা সদলে জয়ী হলেন। প্রাচীন কংগ্রেস নেতা, মহিম দাশ ও ত্রিপুরা চৌধুরীর কবজা হতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা যুদ্ধে আগ্রহী তরুণ নেতাদের অধিকারে আনেন। সেদিন তিনি যে বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা এবং বিপ্লবের প্রতি নিষ্ঠার দৌলতে তিনি মাষ্টারদার হৃদয় জয় করেছিলেন। ১৮ এপ্রিল অক্সিলিয়ারী ফোর্স অস্ত্রগার দখলের অংশগ্রহণ করলেন। ২২শে এপ্রিলের জালালাবাদের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন; তৃতীয় যুদ্ধে প্রাণপণ লড়ে গুলিবিদ্ধ হলেন। তাঁর বুকের রক্তে জালালাবাদের বক্ষ সিক্ত হল। জালালাবাদে রক্তের স্রোত বইল। কিন্তু তিনি মরিয়াও মরিলেন না, মানুষের মনে বাঁচিয়া রইলেন।

মতি কানুনগোয় (বয়স ১৮)

চট্টগ্রাম জেলার জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামে মতির জন্ম। পিতা দুর্গামোহন কানুনগোয় ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। মতি থাকতেন চট্টগ্রাম সহরের নন্দনকানন এলাকার বাউতলা পাড়ায়। পড়তেন কলেজিয়েট স্কুলে।

তিনি ১৯৩০ সনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। তার সঙ্গে ঐ স্কুল থেকে পরীক্ষা দেন আনন্দ গুপ্ত, সহায়রাম দাশ ও মিহির বসু। 'সহপাঠী সুখেন্দু দত্ত কয়েক মাস আগে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়ে ছিলেন। তিনি দেহ, মন, প্রাণ সর্বাঙ্গ বিপ্লবের জন্য সমর্পন করেছেন। তাঁর দিন রাত্রের ভাবনা কি করে একজন সার্থক বিপ্লবী হবেন। কি করে নব ভারতের প্রতিষ্ঠা করবেন। রাজনৈতিক দাসত্ব থাকিতে দেশে স্থায়ী কল্যানের সম্ভাবনা নাই। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশ।" হয়েও ছিল তাই। বিপ্লব সম্ভাবনের জন্য এমন কোন কঠিন কাজই ছিলনা যা মতি পারতেন না। মাষ্টারদার আদেশ আসিল মতিকে বন্দুক দ্বারা হাতের নিশানা ঠিক করতে হবে। মতির সমস্যা—বন্দুক তাদের নাই। পরাধীন দেশের নাগরিকদের বন্দুক রাখা অপরাধ। ভারতের দাসত্ব বজায় রাখতে বিদেশী সরকার অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করেছেন। বন্দুক মতি কোথায় পাবে ?

তাঁরই প্রতিবাসী ও সহপাঠী মিহির বসুর পিতা আশুবোধ বসু সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাছাড়া সাবডিভিসানেল অফিসার (সদর মহকুমার হর্তা, কর্তা, বিধাতা) মনা রায় মিহিরের পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা ছিলেন সরকারের (faithful servants) বিশ্বস্ত ভৃত্য। মিহিরের পিতার একটি বন্দুক ছিল। বন্দুকের আশায় মতি মিহিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। মিহিরকে বিপ্লব মন্ত্রে আহ্বান করলেন। এখন মিহিরও বুঝলেন—কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করবার জন্যই দাসত্ব মোচন করা আবশ্যক। তাই মিহিরও এখন বিপ্লবের জন্য যে কোনও সরকার বিরোধী কাজ করতে ভয় পায় না। তাই মতি যাহা ভাবিয়া ছিলেন তাহা হইল।

মিহিরের বাড়ীতেই অনেক সুপারী গাছ ছিল। সুপারী তাক করে লক্ষ্য অনুশীলন করতে লাগলেন সুখেন্দু দত্ত, সহায়রাম দাশ, মতি কানুনগোয় ও মিহির বসু। এহেন অধ্যবসায়ী মতি নিজের চরিত্র বৈশিষ্ট্যে ১৯৩০ সনের ১৮ এপ্রিলের যুব বিদ্রোহে মনোনিত হলেন। মিহির তার বাবার বন্দুকটা ১৭ই এপ্রিল বিকেল বেলা মতিকে দিয়ে দেয়। মতি অক্সিলিয়ারী ফোর্স অস্ত্রাগার (The Auxilliary Force of India Head Quarters Armoury) আক্রমণকারী দলের শক্তি বৃদ্ধি করলেন। ২২শে এপ্রিল ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনটি যুদ্ধেই শৌর্য ও বীর্যের নিদর্শন রেখে শেষ যুদ্ধে গুরুতর-ভাবে আহত হয়ে সংজ্ঞা হারান। ২৩ এপ্রিল সকালে 'জল জল' বলে অস্পষ্ট

আওয়াজ করছিলেন। বর্বর ইংরেজ সৈন্য মতিকে যুদ্ধ বন্দীর সুযোগটিও দিলেন না। জলন্ত আগুনে জীবন্ত মতিকে পুড়িয়ে মারলেন। যে মৃত্যুর প্রাণ আছে মতি সেই মৃত্যুবরণ করলেন।

নরেশ রায় (বয়স ২৪)

নরেশ রায় ছিলেন ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোনা মহকুমার রায়পাড়া গ্রামের গিরিশ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। মেধাবী বলে গ্রামের স্কুলে নরেশের সুনাম ছিল। পরে ময়মনসিংহ শহরের এডওয়ার্ড স্কুলে অধ্যায়নকালে জেলার সর্বোতোকৃষ্ট মুষ্টি যোদ্ধার সম্মান অর্জন করেছিলেন। সেই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে নরেশ চট্টগ্রামে এলেন ডাক্তারী পড়তে। এখানে এসেই তিনি জীবনের পথ খুঁজে পেলেন। সূর্যসেনের বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন। মানব চরিত্রের জহুরী, সূর্যসেন করিত-কর্মা নরেশকে গুপ্তচরের উপর চরবৃত্তিতে নিয়োগ করলেন। নরেশের তৎপরতার জন্য পুলিশ বার বার বোকা বনতে লাগল। ১৮ই এপ্রিলের যুব উত্থানে নরেশ ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বের দায়িত্ব পেলেন। কিন্তু ইউরোপীয়ান শূন্য ক্লাব তিনি আক্রমণ করলেন না। ২২ এপ্রিলের জালালাবাদ যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে অতুলনীয় পৌরষত্বের পরিচয় দিয়ে দলকে জয়ী করতে সাহায্য করলেন। তৃতীয় যুদ্ধেও প্রাণপণ লড়াই করেন; যুদ্ধের চুড়ান্ত জয়ের সন্ধিক্ষণে মেশিন গানের এক গুচ্ছ গুলি নরেশের প্রশস্থ বক্ষকে অজস্র ছিদ্রে চালুনী করে দিল। ২২শে এপ্রিলের গোধূলী লগ্নে নরেশ আত্ম বিসর্জন দিয়ে আত্মাকে অক্ষয় করলেন।

পুলিন ঘোষ (বয়স ১৮)

পিতা জগৎচন্দ্র ঘোষ। গোসাইডাঙ্গা গ্রামে জন্ম। স্কুলে পড়াশুনায় ভাল বলে পুলিনের নাম ছিল। বৎসরান্তে ক্লাসের সর্বোচ্চ নম্বর পুলিনের প্রায় বাঁধা ছিল। পুলিন যেমন ধীমান তেমনি বুদ্ধিমান ছিলেন। ছোট পুলিনকে চোখে চোখে রাখতে বড় বড় গোয়েন্দারাও হিমসিম খেত। পুলিশ এই দেখল পুলিন সাইকেল চড়ে দ্রুত চলেছেন, সরকারের স্পাইও চলল তার পিছনে পিছনে। স্পাই রাস্তার চৌমাথায় গিয়ে দেখল পুলিন নাই। টিকটিকির গন্ধ পেয়ে পুলিন হাওয়া, হতবাক সরকারের

নজরদার। এহেন চতুর ছেলে মাষ্টারদার মন কেড়ে নেবে তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়! বিনা পরামর্শেই ১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিলের যুব বিদ্রোহে আই, আর, এ, তে সক্রিয় সদস্য হিসাবে তিনি উপযুক্ত বিবেচিত হলেন। ১৮ই এপ্রিলে পুলিশ লাইনের অস্ত্রগার অধিকার-এ অংশ নিলেন। ২২শে এপ্রিলের প্রথম দুইটি যুদ্ধে পুলিন এক দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুললেন এবং বিপ্লবী দলের বিজয় সুনিশ্চিত করলেন। তৃতীয় বারের যুদ্ধে যখন গুলির তান্ডব চলছে গুলির আঘাতে গাছের পাতা ছিঁড়ছে, ডাল ভাঙ্গছে জালালাবাদে মাটি উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, ধুয়ায় আর ধুলায় রণভূমি অন্ধকার। যুদ্ধ তুঙ্গে। এমন সংকটপূর্ণ সময়ে পুলিন শুইয়ে নয়, এগিয়ে যাওয়ার যুদ্ধে তৎপর। পুলিন সামনে এগুচ্ছেন, লক্ষ্য স্থির করছেন—গুলী ছুঁড়ছেন। এই গুলির ঝড়ের মধ্যে একটা নয় দুটো নয় কয়েকটি গুলি পুলিনের বক্ষ পঞ্জর গুড়িয়ে দিল। পুলিন অমর মরণ বরণ করলেন।

অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার (বয়স ২০)

পিতার নাম চন্দ্রকান্ত দস্তিদার। জন্ম ধলঘাট, চট্টগ্রাম। অর্দ্ধেন্দু পিতামাতার সঙ্গে চন্দনপুরায় বাস করতেন। স্থানীয় কলেজে পড়তেন। বিজ্ঞানের ছাত্র অর্দ্ধেন্দু ছিলেন অধ্যাপকদের স্নেহধন্য, ছাত্রদের সর্বকর্ম চিন্তা ও আনন্দের নেতা, মাষ্টারদার প্রিয়পাত্র। তিনি যে কত বড় আত্ম চিত্তজয়ী মহাত্মা ছিলেন তার পরিচয় নিচের ঘটনা হতে পাওয়া যায়।

একদিন বোমা তৈরীর সময় বিস্ফোরণে অবিশ্বাস্যভাবে অর্দ্ধেন্দুর সর্ব শরীর জ্বলে যায়। শরীরের মাংস ঝুলে ঝুলে পড়ে। স্থানে স্থানে শরীরের হাড় দেখা যায়। বিকৃত বিভৎস দৃশ্য। জানাজানির আশংকায় এত বড় হৃদয় বিদারক যন্ত্রনাকে শুধু মাত্র কয়েকটা আঁহা, উহুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সমস্ত কষ্ট তিনি হজম করেন। পুলিশ এই বোমা কান্ডের বিন্দু বিসর্গও জানতে পারে নাই। সেই দুর্ঘটনার ঘা ভাল করে নিরাময় হতে না হতেই আবার তিনি যুব বিদ্রোহে যোগ দিলেন। ১৮ই এপ্রিল ও ২২শে এপ্রিলের সকল বিপত্তিকে বীরত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করেন। বীরের তো মৃত্যুর ভয় নাই, তাই নিজেকে অরক্ষিত রেখেই তিনি শত্রু নিধন যজ্ঞে মেতে উঠলেন। সেই সময় বিপক্ষের কতকগুলী গুলি এসে অর্দ্ধেন্দুর তলপেটটা তছনছ করে দিল। পেটের নাড়ীভুঁড়ি বের হয়ে পড়ল। ভয়ানক ভয়াবহ দর্শন,

মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। শেষরাত্রে আহত অম্বিকা চক্রবর্ত্তী তাঁকে অনুসরণ করতে প্রস্তাব দিলেন। অর্দ্ধেন্দু চেষ্টা করলেন, পারলেন না। ধরাগলায় অস্পষ্ট উচ্চারণে অতিকষ্টে বল্লেন—"দাদা, আমার শিয়রে শমন। আপনার জীবন বহু মূল্যবান। আপনার অনেক কাজ বাকী, আপনি চলে যান।" বলেই অর্দ্ধেন্দু মুর্চ্ছা গেলেন। ২৩শে এপ্রিল সকালবেলা সেনাদল অর্দ্ধেন্দুকে সাথে করে নিয়ে যায় ও চিকিৎসার্থে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দেয়। স্বীকারোক্তির জন্য পুলিশ তাঁকে বহু নির্য্যাতন করে, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সকল জিজ্ঞাসার একটাই জবাব দেন। "বলব না, বীরের মত মরতে চাই।" কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরের সদ্‌গতি হল। যে মৃত্যুতে গর্ব আছে, সেই মরণই অর্দ্ধেন্দু বরণ করলেন।

ত্রিপুরা সেন (বয়স ১৯)

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার সোনারঙ্গ গ্রাম ত্রিপুরা সেনের জন্মস্থান। ত্রিপুরা চট্টগ্রামে মাতুলালয়ে আসেন লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়ার অভিলাষে। দশাসই চেহারার ত্রিপুরা সেনের গায়ের রং ছিল প্রভাত সূর্য-কিরণের মত উজ্জ্বল। সৌম্য দর্শন ৫' ফুট ৮" ইঞ্চি লম্বা এই বালকটি ছিলেন শান্ত কিন্তু বুদ্ধি দীপ্ত। বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে মাতৃভক্ত ত্রিপুরা ভাবলেন, মানুষ হওয়ার জন্য তাঁর মায়ের আশীর্ব্বাদই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। মিউনিসিপাল স্কুলের এই দীর্ঘদেহী ছাত্রটি যখন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ারের ইউনিফরম পরতেন, লোক তাকে দেখে ইংরেজ সামরিক অফিসার ভেবে ভুল করতেন।

ত্রিপুরা ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম শাসন যন্ত্র বিকল করবার উদ্যোগে যোগদানের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন এবং ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য মনোনীত হন। কিন্তু সেদিন ছিল গুড ফ্রাইডে (Good Friday), শোকের দিন। ক্লাব জনশূন্য। তাই আক্রমণ করা হল না। এই বিফলতার গ্লানি তিনি ভুলেন নাই। ২২শে এপ্রিলের সংগ্রামে তিনি দ্বিগুন তেজে জ্বলে উঠলেন। মত্ত হাতির ন্যায় তিনি বেপরোয়া। সবাই যখন শুয়ে লড়াই করছেন, তিনি লক্ষ্যস্থির করে এগিয়ে চলেছেন। জয়ের আশায় মাতোয়ারা তিনি। গুলির আঘাতে আহত হলেন, এখন বাম হাত অচল। তাঁর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। এখন রণ চন্ডীর রূপ তার। এক হাতেই রাইফেল চালাচ্ছেন।

শত্রু নিধন করছেন। সংগ্রামের রূপ যখন সর্ব্বগ্রাসী তখন এই বিরাট দেহ-ধারীর দেহটি শত্রুর গুলীতে ক্ষত বিক্ষত হল। মরণের মুখে সহযোদ্ধাদের উদ্দেশে বললেন, "যুদ্ধ চালিয়ে যাও, বিজয় আর বেশী দূরে নাই"। ক্ষীণ কন্ঠ নিরব হল। ত্রিপুরা, দুপায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে ; সবারে ডেকে গেল বিজয় হুঙ্কারে।

বিধু ভট্টাচার্য (বয়স ২৪)

ত্রিপুরা জেলার লেসিয়ারা গ্রামের এক নিষ্ঠাবান ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে ছিলেন বিধু ভট্টাচার্য। ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি কুমিল্লা হ'তে ডাক্তারী পড়তে চট্টগ্রামে এলেন। মেডিকেল স্কুলে বিপ্লবী নরেশ রায় ও কার্তিক ঘোষকে সহপাঠী পেলেন। বন্ধু নরেশ রায়ের সহায়তায় বিধু অতি সহজেই বিপ্লবী দলে স্থান পেলেন। রোগ, দারিদ্র্য অধ্যুষিত পল্লীবাংলার সেবার সোনার স্বপ্ন বিধুর ভেঙ্গে গেছে। মাস্টারদার ডাকে তাঁর রক্তে লেগেছে সর্ব-নাশের নেশা। স্বর্ণপদক নিয়ে বিধু ডাক্তারী পাশ করলেন বটে, কিন্তু নিঃস্ব মানুষের সেবা করা তাঁর হল না। তিনি মাষ্টারদার মুখে শুনেছেন— "বৈদেশিক শাসনকর্তৃত্ব আমাদের দেশের কল্যাণের পথ রুদ্ধ করেছে।" তিনি ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সনের চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। ১৮ই এপ্রিল সুযোগের অভাবে বিশেষ কিছুই তিনি করতে পারেন নি। তবে ২২ এপ্রিলের সম্মুখ সমরে তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর রণকৌশলই ছিল বজ্র-পাতের মত অমোঘ। বার বার স্থান ত্যাগ করে কখনও উৎরাইতে উঠে পর-ক্ষণেই খাদে নেমে বিধ্বংসী যুদ্ধে বিধু ছিলেন উম্মাদ। দুই পক্ষেরই প্রচন্ড গোলাগুলীর মধ্যে তিনি একাই এক 'শ'। যুদ্ধ যখন তান্ডবের রূপ নিয়েছে হঠাৎ তিনটি বুলেট বিধুর বুকটা এফোড় ওফোড় করে দিল। হাস্যরসিক বিধু ভট্টাচার্য মৃত্যুকে বিদ্রূপ করে বল্লেন "আমারে হানদাইছে রে"। প্রিয় বন্ধু নরেশ রায়কে উদ্দেশ্য করে বললেন "আমি চললাম. তুমিও আইয়ো।"

হে বীর তুমি চলে গেলে। দেশ তোমারে অন্তরের অন্তস্থলে রাখিল আপন করে।

নির্মল লালা (বয়স ১৪)

পিতৃমাতৃহীন নির্মল দিদির আদরে, যত্নে সোহাগে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। ১৪ বৎসরের প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা এই উৎসাহী কিশোর কক্সবাজারের সমুদ্রের

ধারে বসে স্বপ্ন দেখেছিলেন—পরাধীন দেশকে ব্রিটিশ অনাচার হ'তে মুক্ত ক'রে দেশে স্থায়ী কল্যাণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। মাষ্টারদা'র নব জাগৃতির শংখধ্বনি, নির্মলের মানব মুখী মনকে উদ্বেল করেছিল। তাই মহাজীবন বোধের তাগিদে ১৯৩০ সনের ১৮ এপ্রিলের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রুধির প্লাবিত সংগ্রামে মুষ্টিমেয় দুর্জয় তরুণের সাথে এই কিশোরটিও যোগ দিয়েছিলেন। নির্মলের দেশপ্রেম যে সমুদ্রের মতই গভীর ছিল ছোট্ট একটি ঘটনা হ'তে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিপ্লবীরা যখন পাহাড় হ'তে পাহাড়ে ছুটাছুটি করছেন, তখন মাষ্টারদা নির্মলকে কাছে ডেকে নিয়ে সস্নেহে বললেন, "নির্মল, এই অনাহার, অস্নান, অনিদ্রা আর দিনরাত্রির ছুটাছুটির ধকল তোমার এই কাচা বয়সের শরীর সহ্য করতে পারবে না। তুমি গ্রামের ছেলে, পুলিশ তোমাকে চেনে না। তুমি বাড়ী চলে যাও"। নির্মল বললেন, "মাষ্টারদা, বাড়ী ফিরে যাব বলে আমি আসি নাই। বাড়ী ফিরে গিয়ে এই জীবন দিয়ে আমি কি করব? শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটিও দেশের মুক্তির জন্য ব্যয় করব, ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য। আমি কি গীতায় পড়ি নাই। শরীরাণী বিহায় জীর্ণা নান্যানি নবানি সংযাতি দেহী॥

নির্মল আর বাড়ী ফিরে যান নাই। মেশিনগান, লুইসগান আর রাইফেলের শ্রাবণের ধারার ন্যায় গুলীবৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রাইফেল হাতে নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছেন, হত, আহত রক্তমাখা শত্রুর লাশ লক্ষ্য করছেন। নির্ভীক নির্মল, কুছ পরোয়া নেহি মনোভাব নিয়ে যুঝে যুদ্ধে জয়ী হ'তে চেষ্টা করছেন। শেষ রক্ষা নির্মল করতে পারেন নি। শত্রুর গুলীর আঘাতে মারাত্মক ভাবে আহত হ'য়ে পাহাড়ের গায়ে ঢলে পড়লেন কিন্তু একটিও কাতরোক্তি করলেনি না।

হে প্রিয়, অমৃতের পুত্র তুমি। তোমায় ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই।

শশাঙ্ক দত্ত (বয়স ১৮)

শশাঙ্ক দত্ত। পিতা মণীন্দ্রলাল দত্ত। ডেঙ্গাপাড়া গ্রামে জন্ম। চট্টগ্রাম কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বয়স ১৮ বৎসর। ১৮ই এপ্রিল পুলিশ অস্ত্রাগার অধিকারে অংশগ্রহণ করেন। জালালাবাদ যুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছেন, শ্রান্তি নাই, উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব নাই, বুকে অদম্য সাহস,

মুখে বন্দেমাতরম, হাতে মাস্কেট্রি রাইফেল। পৃথিবীর কোন শক্তি নাই তাকে পরাজিত করে। অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করে চলেছেন। উত্তর-পূর্বের পাহাড়ের উচ্চ টিলা হতে হঠাৎ শত্রুর মেশিনগানের একঝাঁক গুলী শশাংককে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে এলিয়ে পড়লেন জালালাবাদ পাহাড়ের কোলে চিরতরে। যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, জানি হে জানি তা হয়নি হারা।

জিতেন দাশগুপ্ত (বয়স ১৯)

চট্টগ্রামের গৈরলা গ্রামে জন্ম। রেঙ্গুনে বেঙ্গল একাডেমিতে পড়তেন। অস্ত্রাগার আক্রমণের কয়েক মাস পূর্বে চট্টগ্রামে ফিরে এসে ১৮ এপ্রিলের ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সৈনিক হিসাবে যুববিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। তারপর চারদিন অন্যান্য বিপ্লবী সাথীদের সঙ্গে অনাহারে অনিদ্রায় পাহাড়ে, জঙ্গলে তিনি-ও সহযোদ্ধা বন্ধুদের পাশাপাশি ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করেছেন। একের পর এক নির্ভীক সৈনিকরা প্রাণ দিচ্ছেন। জিতেনের কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। হঠাৎ মেশিনগানের একঝাঁক গুলী জিতেন দাশগুপ্তের শিরদাড়া সমেত ঘাড়ের অর্দ্ধেক মাংস উড়িয়ে নিল। তার রক্তাক্ত দেহ জালালাবাদ পাহাড় রাঙিয়ে সেইখানেই পড়ে রইল।

মধুসূদন দত্ত (বয়স ২৪)

পিতার নাম মণীন্দ্রকুমার দত্ত। জন্ম চট্টগ্রামের বিদগ্রামে। মাষ্টারদার বিপ্লবী দলের একজন বড় সংগঠক। ১৯২৪ সালে যখন নেতারা সকলেই কারাগারে আবদ্ধ তিনিই তখন বিপ্লবী সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। স্বাস্থ্য সম্পদ কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। বাড়ীর টাকা পয়সা, দামী অলংকার এনে দেন পার্টির জন্য। একদিন বাড়ীর বন্দুকটিও এনে দিলেন। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে পুলিশ আর্মারী দখলে ও ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধে তিনি ছিলেন। অন্যান্যদের মত অস্নাত, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, কিন্তু রণবীর তেজীয়ান, সম্মুখ যুদ্ধের আহ্বানে বলীয়ান ব্রিটিশের মেশিনগানের অজস্র গুলীবর্ষণে বিদ্ধ হ'য়ে জালালাবাদের বুকে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রইলেন।

ওরে নবীন ওরে আমার কাচা, আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা

সূর্য্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের স্বাধীন বিপ্লবী সরকারের ঘোষণাপত্র

[১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিল বিপ্লবী মহানায়ক শ্রীসূর্য্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের যুবশক্তি "ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী ; চট্টগ্রাম শাখা" এই নামে সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহে আত্ম প্রকাশ করে। বিপ্লবীদের অপ্রত্যাশিত প্রচন্ড আক্রমনে চট্টগ্রামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন যন্ত্র চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকারের দুইটি অস্ত্রাগার, যোগাযোগ কেন্দ্র টেলীগ্রাফ ও টেলিফোন-ভবন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো বিপ্লবীরা অধিকার করে নেন, দুই স্থানে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। স্বাধীন চট্টগ্রামে সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়।

[ঘোষণাটি ইংরেজীতে লেখা ছিল, তার বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল]

"প্রিয় বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ।

ভারতের বিপ্লবের গুরুদায়িত্ব আজ ভারতের গণতন্ত্রীবাহিনীর ওপর ন্যস্ত। ভারতবাসীর অন্তরের বাসনা ও উচ্চকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করবার জন্য আমরা স্বদেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ হ'য়ে চট্টগ্রামে বৈপ্লবিক কর্ম্ম সমাধা করার গৌরব অর্জন করেছি। আজ বিশেষ গৌরবের কথা আমাদের বাহিনী চট্টগ্রামের ব্রিটিশ সরকারের সুদৃঢ় ঘাঁটিগুলো অধিকার করেছে। শত্রুর অস্ত্রাগার অধিকৃত, চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় টেলিফোন ভবন বিধ্বস্ত। বহির্জগতের সঙ্গে তারবার্তা বিচ্ছিন্ন, রেললাইন উৎপাটিত ও মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত, বাইরের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শত্রু পরাস্ত। অত্যাচারী বিদেশী সরকারের অস্তিত্ব লুপ্ত। জাতীয় পতাকা আজ উচ্চে উদীয়মান। জীবন ও রক্তের বিনিময়ে একে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। বিশ্বের গোচার্থে ও স্বীকৃতির জন্য ভারতীয় গণতন্ত্রীবাহিনী চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর শাসন ও শোষনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছে।

চট্টগ্রাম ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র অংশ, তবুও আশা ও ভরসা করা যায়, আজকের জয় ব্রিটিশ দস্যুর কবল হ'তে অচিরে ভারত মাতাকে মুক্ত করবার জন্য ভারতবাসীকে সারাদেশে অনুরূপ বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করবার উৎসাহ ও প্রেরণা দেবে।

ভারতীয় গণতন্ত্রীবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি, আমি সূর্য্যসেন, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, চট্টগ্রাম শাখার গণতন্ত্রীবাহিনীর বর্তমান পরিষদই সামরিক বিপ্লবী সরকারে পরিণত হয়ে নিম্ন লিখিত জরুরী কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে ঃ—

১। আজকের জয়কে সুনিশ্চিত করবার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হ'বে।

২। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করে তুলতে হ'বে।

৩। আভ্যন্তরীণ শত্রুদের দমন করতে হবে।

৪। সমাজদ্রোহী ও লুন্ঠনকারীদের শাসনে রাখতে হবে।

৫। এই সামরিক বিপ্লবী সরকারের পরবর্তী নির্দেশগুলি সম্পন্ন করতে হবে। আমাদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার চট্টগ্রামে প্রত্যেক সাচ্চা তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বাধ্যতা, আনুগত্য এবং সক্রিয় সহযোগিতার আশা ও দাবী রাখে এবং দেশসেবকদের ও যাদের অন্তরে মুক্তিযুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত আছে, তাদের কাছ হ'তে সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহায্য প্রত্যাশা করে।

সাময়িক বিপ্লবী সরকার দীর্ঘজীবী হউক। "বন্দে মাতরম"

১৮-৪-৩০ তারিখের চট্টগ্রাম সশস্ত্র যুব উত্থানের পর, "চাচা আপন প্রাণ বাচা" নীতি অনুসরণ করে চট্টগ্রাম সহরের বৃটেন জাত অফিসাররা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সহ ভয়ে একটি বড় জাহাজের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে অজ্ঞাতবাসে দিন যাপন করছিলেন। সেই সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশের ডি, আই, জি, ও জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, কলিকাতায় চিফ সেক্রেটারি ও ইনস্পেকার জেনারেল অব পুলিশের নিকট সত্বর মিলিটারি সাহায্যের জন্য বহু আবেদন করেন। এখনও প্রায় ১০০ এক শত আবেদন রাইটারস্ বিল্ডিংয়ের সরকারী দপ্তরখানায় রেকর্ড রুম এ আছে। এদের মধ্যে সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে পাঁচখানার উল্লেখ করলাম।

WIRELESS MESSAGE

No. 1

Dt. 19.4.30

To

Chief Secretary Bengal Calcutta.

Serious armed rising at Chittagong, Telegraphs cut, Armouries raided. Send atonce atleast two Companies troops and machine guns, position critical.

District Magistrate, Chittagong

১৮-৪-৩০ তারিখের বিপ্লবীদের বীরত্বে ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেট উলকিনসন কলিকাতায় চিফ সেক্রেটারীকে যে রিপোর্ট দেন তারই নকল নিম্নে দেওয়া হল।

No, 00767 **TELEGRAM** Dt. 19.4.30

XKF Chittagong 19 St E 161 Bengal, Calcutta

Disturbance began without warning about ten night. Telephone Exchange burnt, Auxiliary Force Armoury and Police Armouries gutted. Armament at disposal only ninty rifles and two or three Lewis guns. Police arms battered and burnt, not more than sixty seriviceable with little ammunition. Raiders fully equiped with modern arms and many revolvers looted from armoury as well as fifty four police muskets and unknown quantity ammunition. Number of raiders difficult to estimate. But believed to be about one hundred to be in surrounding hills. Total casualties known, 2 Europeans two constables, three taxi drivers. Besides few wounded. Some European women and children placed on steamer, Railway Line reported cut about 30 miles from Chittagong. Farmer has wired for men and Eastern Frontier Rifles from some other districts.

Wilkinson District Magistrate

চট্টগ্রাম সশস্ত্র যুব উত্থানের পর ১৯৩০ সনের ১লা মে চট্টগ্রাম ইউরোপীয় সমিতির সভাপতি বাংলা সরকারের রাজনৈতিক সেক্রেটারীকে লেখেন—

Revolutionary outbreak in Cnittagong during which events occurred which have no parallel in Bengal since the mutiny of 1857.

চট্টগ্রামের পুলিশ বিপ্লবীদের সায়েস্তা করতে কলিকাতার পুলিশকে একটি এরোপ্লেন পাঠাতে অনুরোধ করে ছিলেন। সেই টেলীগ্রাফের নকল নিম্নে দেওয়া হল।

No. 5 TELEGRAM

Chittagong dated 20. 4. 30

To Bengal Calcutta

Have just returned from eight hour search of hills north Chittagong. Operation Extremely difficult on account hilly country and dense jungle. Failed to get into touch but obtained unmistacable evidence of their recent presence. Now beleive all the gang to be in the hills. An aeroplane would be invaluable tomorrow. Police

শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর History of Freedom Movement in India. পুস্তকের Vol III P499 এ লিখেছেন—

It is said that (in early 1930) Sir Charles Tegart while assaulting the raiders taken prisoners cursed them and said 'You people have killed 66 of our men'

প্রথম ঘোষণাপত্র

[ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'র ঘোষণা পত্র]

Exhibit No. DCL XVIII.

The Court of the Commissioners of Special Tribunal for Armoury Raid Case No. 1 of 1930 at Chittagong :

President : J. YOUNIE

Indian Republican Army Chittagong
Proclamation

"The Indian Republican Army, Chittagong Branch, hereby solemnly declares its intention to stand to-day against the agelong repression by the British people and their Government which they have followed as a cruel policy to keep the three hundred millions of Indian people subjugated for unlimited time and to eradicate the slightest trace of nationalisim and their national originality amongst them,

The right of ownership of India and the control of her destinies belong to the People of India only and the long usurption of that right by a foreign people and Government has not extinguished that right nor it ever CAN.

The Indian Republican Army proclaims to-day its intention of asserting this right in arms in the face of the world and thus put into actual practice the idea of Indian Independence declared by the Indian National Congress : and hereby pledges the life of every one of its members to the cause of freedom, to the welfare and exaltation of the Mother Land amongst all other nations.

It remembers to-day with sorrowful indignation the inhuman massacre of the Indian people perpetrated by the British Government on the Indian soil, the blowing up of her woman folk in the mouth of the guns, the indiscrimate hangings and cold-blooded murders of her manhood, the crushing of her infants under the cruel British boot and the complete destruction

of her trade and industries and takes up the sacred vow of retaliating and avenging the blood of her late wronged children.

The Indian Republican Army is entitled to and hereby claims the allegiance of every Indian people for the upkeep of the national cause and honour and also prays that no person reveres this cause will dishonour it by callousness, cowardice and inhumanity.

In this supreme hour the Chittagong People must, by their valour and patriotism and by the readiness of her children sacrifice themselves for the common good, prove themselves worthy of the August Destiny to which they are called.

By order
President in Council,
Indian Republican Army, Chittagong Branch.

Exhibit No. CL XXXI

In the Court of Commissioners of Special Tribunal for Armoury Raid Case No. 1 of 1930 at Chittagong ;

President : J. Younie

The Indian Republican Army
Proclamation

To the Students and Youths of Chittagong :—
Dear Brothers,

The Indian Republican Army has made an attempt to assert its rightful claim to liberate the country from the cruel yoke and oppression of the British people and their government and has kept up flying the Ensign of Free India.

The British Government during last 200 years of their tyrannical reign in India, have crushed with very cruel hands the Indians every time they have tried to achieve freedom and this

time also they will not spare any energy to restore their illegal establishment for predatory exploitation.

So, brothers, rise up to the situation, try to feel the anguish of subjugation, see to the sad plight your country has been put to, do what the Youths and Students of Germany, Russia and China are doing. Kindle up the fire of wrath and retaliations in your hearts. Enroll yourselves as soldiers under the Indian Republican Army and make an ardent attempt to save the Motherland from the abyss of misfortune and misery.

By order
President in Council
Indian Republican Army, Chittagong Branch

To The Citizens of Chittagong

The Indian Republican Army hereby directs and commands every man, woman and son of Chittagong to capture and produce dead or alive forthwith at the Head Quarters of the Army all Englishmen and white skinned Anglo Indians who are hostile to our Nation's aspirations.

The Indian Republican Army announces that everybody who will produce the demanded persons will be amply rewarded.

By order
President-in-Council
Indian Republican Army, Chittagong Branch

১৯৩০ সনের ২৩ এপ্রিল বুধবারের সকালবেলা ব্রিটিশ আর্মির একদল গুর্খাসৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত জালালাবাদ সরেজমিনে তদন্ত করতে যায়। তখন জালালাবাদ পরিত্যক্ত। পরিত্যক্ত জালালাবাদের বুকে পড়ে আছে ১০টি শবদেহ। আর দুইজন আহত মুমূর্ষু বিপ্লবী, ও বিপ্লবীদের দ্বারা ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত আগ্নেয় অস্ত্র ও ১০২২টি কার্টিজের খালি খোল। ইহা দ্বারা সরকার প্রমাণ করতে চায় যে বিপ্লবীরা ১০২২টি গুলী ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে ছুঁড়েছিলেন। আমার মতে এই সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা হতে কম। কারণ, জঙ্গল ও গুল্মের মধ্যে সব খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। সরকারী তথ্য মেনে নিলেও এই সত্যই প্রমাণ হয় যে এই যুদ্ধ প্রলয়ংকর রূপ নিয়েছিল।

১নং অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় সরকার পক্ষ যে প্রমাণ দাখিল করেছিল তারই বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

Judgment in Armoury Raid Case No. 1 of 1930
Chittagong.

In the Court of the Commissioners of Special Tribunal, S. I. Hem Gupta (P.W 59) was directed by the D.I.G. to collect and make a list of all the articles left by the raiders on the hill. This he proceeded to do. The following items were found. The list is Ex. 83.

1. Police Property :—
   (a) 22 Police muskets (EX. CCXX series),
   (b) 936 live police musket Cartridges.
   (c) One blank Government revolver (°450) bore Cartridge
   (d) 998 fired police musket Cartridge Cases.
   (e) 11 fired Government revolver Cartridges.
   (f) One Police ammuntion pouch.

2. A. F. I. Armoury property :—
   (a) Six empty fired (°303) Army Rifle Cartridges.
   (b) Three chargers for (°303) Army Rifles.
   (c) A Government (°476) musket of the same type.
   (d) Seven fired (°12) bore shot gun Cartridges.
   (e) Cases and seven ditto live shot gun Cartridges.
   (f) 164 automatic pistol and revolver cartridges.

মুক্তির সোপান জালালাবাদ

Indian Republican Army, Chittagong Branch
versus
Eastern Frontier Rifles from Dhaka.
Surma valley Light Horse from Assam.

	যোদ্ধাগণ	দেশ
১।	মাস্টারদা সূর্য সেন	চট্টগ্রাম
২।	নির্মল সেন	”
৩।	অম্বিকা চক্রবর্তী	”
৪।	লোকনাথ বল	”
৫।	সুবোধ চৌধুরী	”
৬।	ফণীন্দ্র নন্দী	”
৭।	সহায়রাম দাশ	রাণাঘাট
৮।	নরেশ রায়	ময়মনসিংহ
৯।	ত্রিপুরা সেন	ঢাকা
১০।	বিধু ভট্টাচার্য	কুমিল্লা
১১।	হরিগোপাল বল	চট্টগ্রাম
১২।	প্রভাস বল	”
১৩।	মতি কানুনগোয়	”
১৪।	মধুসূদন দত্ত	”
১৫।	জীতেন দাশগুপ্ত	”
১৬।	নির্মল লালা	”
১৭।	শসাঙ্ক দত্ত	”
১৮।	পুলিম ঘোষ	”
১৯।	নারায়ণ সেন	বগুড়া
২০।	দেবপ্রসাদ গুপ্ত	ঢাকা
২১।	মনোরঞ্জন সেন	চট্টগ্রাম
২২।	স্বদেশ রায়	ঢাকা
২৩।	দ্বিজেন দস্তিদার	চট্টগ্রাম।

যোদ্ধাগণ	দেশ
২৪। রজত সেন	চট্টগ্রাম
২৫। নিতাইপদ ঘোষ	যশোহর
২৬। সুধাংশু বসু	ঢাকা
২৭। বিধু সেন	চট্টগ্রাম
২৮। বিনোদ চৌধুরী	,,
২৯। মহেন্দ্র চৌধুরী	,,
৩০। কৃষ্ণ চৌধুরী	,,
৩১। বিনোদ দত্ত	,,
৩২। ভবতোষ ভট্টাচার্য	,,
৩৩। সীতারাম বিশ্বাস	,,
৩৪। হেমেন্দু দস্তিদার	,,
৩৫। ক্ষিরোদ ব্যানার্জী	ঢাকা
৩৬। বনবিহারী দত্ত	চট্টগ্রাম
৩৭। বীরেন দে	,,
৩৮। সরোজ গুহ	,,
৩৯। হরিপদ মহাজন	,,
৪০। শান্তি নাগ	কুমিল্লা
৪১। অশ্বিনী চৌধুরী	চট্টগ্রাম
৪২। রণধীর দাশগুপ্ত	,,
৪৩। ননীগোপাল দেব	কুমিল্লা
৪৪। কালীকিঙ্কর দে	চট্টগ্রাম
৪৫। সুবোধ রায়	,,
৪৬। বিজয়কৃষ্ণ সেন	,,
৪৭। অর্ধেন্দু দস্তিদার	,,
৪৮। কালীপদ চক্রবর্তী	,,
৪৯। শৈলেশ্বর চক্রবর্তী	,,
৫০। সুবোধ বল	,,
৫১। সুরেশ দে	ঢাকা

ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১	উড্ডিন	উড্ডীন
৩	২৫	গিযাছিল	গিয়াছিলেন
১৯	২৭	তম	স্তব
২০	৮	জাতীর	জাতির
২৩	১৪	অন্তর্গঢ	অন্তর্গূঢ়
২৫	৪	১৮৫৭	১৭৫৭
২৬	৬	বাহাল	বহাল
২৬	১২	১০৬০	১৭৬০
২৭	৯	হতিযে	হাতিয়ে
২৮	১৯	প্রক্রিরার	প্রক্রিয়ার
৩৭	৭	করেম	করেন
৩৮	১০	তাযায	তারায়
৪৪	৮	মৎ	মহৎ
৪৫	৮	জর	জয়
৫২	১	বন্দনকালে	বন্দনকাল
৬৯	১	মদ্যদকের	মদ্যপদের
৭৬	২৩	আগুল	আগুন
৮২	১৮	ছকুমের	হুকুমের
৮৪	১২	ছকুমের	হুকুমের
৮৪	২৪	মহায়যাম	সহায়রাম
৮৪	৩০	সীতাম	সীতারাম বিশ্বাস
৯৪	২	অন্ন	অন্য
৯৫	২৪	সীমাবার	সীমানার
৯৩	২২	দিচ্ছেন	দিচ্ছে
৯৩	২১	করছেন	করছে
৯৭	৯	কয়ে	করে
৯৭	১৫	বিদ্ধশীদের	বিদেশীদের
৯৯	৭	আত্মত্যাগর	আত্মত্যাগের
১০৫	১০	ভিতর	উভয়